উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

১৯শ বর্ষ।

(১৩২৩ মাঘ হইতে ১৩২৪ পৌষ পর্য্যন্ত)

উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

Printed by Manmatha Nath Dass,
AT THE
LAKSHMI PRINTING WORKS
67/9. Balaram Dey Street, Calcutta.

সূচীপত্র।

১৯শ বর্ষ।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

[যেমনটী দেখিয়াছি]

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধকে কি চক্ষে দেখিতেন।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা মানবমনে যে বিবিধ অনুরাগ উৎপন্ন হয়, স্বামিজীর জীবনে বুদ্ধের প্রতি ভক্তিই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান। সম্ভবতঃ ভারতের এই মহাপুরুষের জীবনের ঐতিহাসিক সত্যতা হেতুই তিনি উহাতে এত আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি বলিতেন, "ধর্ম্মাচার্য্যগণের মধ্যে কেবল বুদ্ধ ও মহম্মদ সম্বন্ধেই আমরা প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত আছি, কারণ সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের শত্রু মিত্র উভয়ই ছিল!" তাঁহার নায়কের চরিত্রে যে পূর্ণ জ্ঞানবিচারের পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি বার বার তাহারই বর্ণনা করিতেন। তাঁহার নিকট বুদ্ধ শুধু আর্য্যগণের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নহেন, কিন্তু পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে তন্মধ্যে একমাত্র তিনিই সম্পূর্ণ স্থির-মস্তিষ্ক ছিলেন। তিনি কেমন পূজা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন! কিন্তু কেহ কেহ যে বাস্তবিকই তাঁহাকে পূজা করিয়াছিল সে বিষয়ে স্বামিজী কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "বুদ্ধ ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উহা একটী উচ্চ অবস্থা। এস, সকলে উহা লাভ কর। এই লও উহার চাবি!"

সাধারণ লোকেরা আজগুবী ব্যাপার দেখিবার জন্য যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে, বুদ্ধ উহাতে এত বীতস্পৃহ ছিলেন যে, তিনি একটী যুবককে জনতার সমক্ষে একটা খোঁটার উপর হইতে বাক্যমাত্র দ্বারা

একটী মণিখচিত বাটী নামাইয়া আনার জন্য নির্ম্মমভাবে সঙ্ঘ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মের সহিত বুজরুকীর কোন সম্পর্ক নাই!

এই আনন্দময় পুরুষের কি অসাধারণ স্বাধীনতা ও দীন ভাব ছিল! তিনি বারনারী অম্বপালীর নিমন্ত্রণে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি এক অন্ত্যজের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন—উহাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে তাহা জানিয়াও ঐরূপ করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, হীনপদস্থ লোকদিগের সহিত মেলামেশার ব্যাপারই তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্য হউক। তৎপরে তিনি আবার, যাহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে মহাপরিনির্ব্বাণের সহায়তা করার জন্য সৌজন্যপূর্ণবচনে ধন্যবাদ দিয়া পাঠান। কি প্রশান্ত! কি মহাপুরুষের ন্যায় আচরণ! সত সত্যই তিনি অশেষগুণাকর পুরুষর্ষভ ছিলেন!

আবার যেমন তাঁহাতে বিচারশক্তির পরাকাষ্ঠা ছিল, তেমনি তিনি অদ্ভুত দয়ারও আধার ছিলেন। রাজগৃহে ছাগগুলিকে বাঁচাইবার জন্য তিনি নিজের জীবন দিতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। একবার এক ব্যাঘ্রীর ক্ষুধাপরিতৃপ্তির জন্য নিজ শরীরই দান করিয়াছিলেন। পাঁচশত বার পরার্থে জীবনবিসর্জ্জনের ফলে অল্পে অল্পে সেই পবিত্র দয়ারাশির উদ্ভব হইয়াছিল, যাহাতে তাঁহাকে বুদ্ধত্বপদবীতে আরোহণ করাইয়াছিল।

জনৈক যুবক, যাহাকে সে কখনও দেখে নাই এবং যাহার নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই, এরূপ এক নায়িকার প্রতি গদ্গদকণ্ঠে নিজ প্রেম ব্যক্ত করিতেছে—ভগবান্ বুদ্ধ এই গল্পটী বলিয়া তৎপরে তাহার ঐ কষ্টকর অবস্থাকে মানবের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় নানা উক্তির সহিত তুলনা করেন। এই ঘটনাটী হইতে, এত যুগের ব্যবধানেও, আমরা তাঁহার রসজ্ঞানের কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হই। একমাত্র তিনিই ধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে স্বর্গনরকাদি কল্পনা হইতে পৃথক্ করিতে পারিয়াছিলেন, অথচ উহাতে তাঁহার শক্তি এবং মানবহৃদয়ের উপর অধিকারের

কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাঁহার অদ্ভুত চরিত্র এবং সমসাময়িক লোকদিগের উপর উহার প্রভাবই ঐ সফলতার কারণ।

একদিন সন্ধ্যাকালে স্বামিজী আমাদিগের কয়েক জনের জন্য বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী তাঁহার সহধর্ম্মিণী যশোধরার নিকট যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহার একটী কাল্পনিক চিত্রের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিহাসের শুষ্ক কঙ্কালকে আমি আর কখনও অমন জীবন্ত, চাক্ষুষ ঘটনার ন্যায় বর্ণিত হইতে শুনি নাই। নিজে হিন্দু সন্ন্যাসী হইলেও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট ইহা খুব স্বাভাবিকই বোধ হইয়াছিল যে, বুদ্ধের ন্যায় দৃঢ়চেতা ব্যক্তির "বিবাহ-সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের মত ধারণা" থাকিবে, এবং তিনি নির্ব্বন্ধসহকারে নিজেই নিজের পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন। সপ্তাহব্যাপী উৎসব ও বাগ্‌দানের প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপারটী স্বামিজী সাদরে বর্ণনা করিলেন। তৎপরে তিনি বিবাহের দীর্ঘকাল পরে উভয়ের দাম্পত্য-জীবনের এবং সেই বিখ্যাত বিদায়রজনীর বর্ণনা করিলেন। দেবতাগণ গাহিলেন, "জাগো, হে প্রবুদ্ধ! উঠ, এবং জগৎকে সাহায্য কর!" অমনি রাজপুত্রের মনের মধ্যে সংগ্রাম চলিতে লাগিল, তিনি বার বার নিদ্রিত পত্নীর শয্যাপার্শ্বে প্রত্যাগত হইলেন। "কোন্ সমস্যায় তাঁহার মন আন্দোলিত হইতেছিল? তিনি যে তাঁহার পত্নীকেই জগতের কল্যাণের জন্য বলি দিতে উদ্যত হইয়াছেন!—উহারই জন্য মনের মধ্যে সংগ্রাম! তিনি নিজের জন্য আদৌ ভাবিতেছিলেন না!"

তারপর তাঁহার জয়লাভ, এবং তাহারই অনিবার্য্য ফলস্বরূপ বিদায়গ্রহণ, এবং অতি সন্তর্পণে রাজপুত্রীর চরণচুম্বন—এত সন্তর্পণে যে, তিনি তাহাতে জাগরিতা হইলেন না—এ সকল বর্ণিত হইল। স্বামিজী বলিলেন, "তোমরা কি কখনও বীরগণের হৃদয়ের বিষয় চিন্তা কর নাই? উহা মহৎ, অতি মহৎ, সে মহত্ত্বের তুলনা নাই—তথাপি উহা আবার নবনীতের ন্যায় কোমল!"

দীর্ঘ সাত বৎসর পরে রাজপুত্র—এখন তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন—কপিলাবস্তুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার গমন-

দিবসাবধি যশোধরা তাঁহার স্ত্রীসুলভ উপায়ে স্বামীর ধর্ম্মজীবনের অনুবর্ত্তন করিয়া তথায়ই বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে কাষায় বসন, ভোজন শুধু ফল মূল এবং শয়ন অনাবৃত স্থানে ধরাশয্যায়। বুদ্ধ প্রবেশ করিলে যশোধরা প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর ন্যায় তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত স্পর্শ করিলেন। তখন ভগবানও তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে সত্য উপদেশ করিতে লাগিলেন।

উপদেশান্তে তিনি উদ্যানে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে যশোধরা চমকিত হইয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শীঘ্র তোমার পিতার নিকট যাইয়া তাঁহার নিকট হইতে তোমার পিতৃধন যাচ্ঞা কর! বিলম্ব করিও না!"

তারপর শিশু যখন প্রশ্ন করিল, "মা, ইঁহাদের মধ্যে কে আমার পিতা?" তখন তিনি গর্ব্বভরে—"রাজপথ দিয়া যিনি সিংহের ন্যায় গমন করিতেছেন, উনিই তোমার পিতা!"—এতদ্ব্যতীত আর কিছুই উত্তর দিলেন না।

শাক্যবংশের ভাবী উত্তরাধিকারী কুমার তখন পিতার নিকট যাইয়া বলিল, "পিতঃ, আমাকে আমার পিতৃধন প্রদান করুন।"

তিনবার সে এইরূপ যাচ্ঞা করিলে বুদ্ধ আনন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দাও উহাকে!" তখন একজন বালকের উপর গৈরিক-বস্ত্র ফেলিয়া দিল।

তারপর সেই প্রধান শিষ্য যশোধরাকে দেখিয়া এবং তিনিও স্বামীর নিকটে থাকিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া ভগবানকে বলিলেন, "ভগবন্, স্ত্রীগণও এই সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে পারে কি? ইঁহাকেও কি আমরা গৈরিকবস্ত্র প্রদান করিব?"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "জ্ঞানে কি কখনও লিঙ্গভেদ থাকিতে পারে? আমি কি কখনও বলিয়াছি যে স্ত্রীগণের এই সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার নাই? কিন্তু আনন্দ, ইহা তোমারই উপযুক্ত প্রশ্ন হইয়াছে!"

এইরূপে যশোধরাও শিষ্যত্বে পরিগৃহীত হইলেন। তারপর সেই সাত বৎসরের রুদ্ধ প্রেম ও করুণা সমস্ত জাতকগল্পাকারে প্রবাহিত

হইল! কারণ ঐগুলি সমস্ত যশোধরারই জন্য কথিত! পাঁচশতবার উভয়ের প্রত্যেকেই অহংভাবনা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা উভয়ে একত্র চরম পূর্ণত্ব লাভ করিবেন।

"—এইরূপই হইয়াছিল, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না! যশোধরা এবং সীতার পক্ষে, একশত বৎসর তাঁহাদের পতিব্রতা পরীক্ষার পর্য্যাপ্ত সময় নহে!"

একটু চুপ করিয়া আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তিকালে স্বামিজী আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "না, না—এস আমরা সকলেই স্বীকার করি যে, এখনও আমাদের কাম ক্রোধাদি রহিয়াছে! এস, আমরা প্রত্যেকেই বলি—'আমি আদর্শ অবস্থায় উপনীত হই নাই!' কেহ যেন কখনও অন্য দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ভগবান্ বুদ্ধের সহিত তুলনা করিবার সাহস না করে!"

আমাদের আচার্য্যদেব যৌবনের প্রারম্ভে যখন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন, সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি জগতের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে ইংরাজরাজের আদেশে বুদ্ধগয়ার বৃহৎ মন্দিরের পুনরুদ্ধারকার্য্য সাধিত হইতেছিল,* এবং বাঙ্গালী পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই কার্য্যে যোগদান করায় সমগ্র ভারতবর্ষের লোক ঐ বিষয়ে বিলক্ষণ মাতিয়া উঠেন। আবার ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সার্ এডুইন আর্ণল্ডের 'লাইট অব এসিয়া' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় ইংরাজীভাষী দেশসমূহের সামান্য লেখাপড়া জানা সাধারণ লোকদিগের কল্পনাও বিশেষভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে। উক্ত পুস্তক অনেক স্থলে অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতের' প্রায় অবিকল অনুবাদ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বামিজী কখনও অপরের মুখে শুনিয়া তৃপ্ত হইতেন না, এবং এই বিষয়েও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন

* উক্ত বৃহৎ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে খননকার্য্য ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশীয় সরকার কর্ত্তৃক প্রথম আরব্ধ হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার উহার ভার লয়েন, এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে উহা শেষ হয়।

নাই; অবশেষে তিনি ১৮৮৭খৃষ্টাব্দে তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সহিত একত্র শুধু 'ললিতবিস্তর' নহে, বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান শাখার বিখ্যাত গ্রন্থ মূল 'প্রজ্ঞাপারমিতা' * সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন †। তাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তিই তাঁহাদিগকে পালিভাষা বুঝিতে সহায়তা করিল, কারণ, পালি সংস্কৃত হইতেই উদ্ভূত। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচনাবলী এবং 'লাইট অব এসিয়া' পাঠ স্বামিজীর জীবনের ক্ষণস্থায়ী ঘটনা মাত্র হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্যের সদা অবহিত মনে তাঁহার শিষ্যত্বকালে এইরূপে যে বীজ উপ্ত হইল তাহা তাঁহার সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই পুষ্পভারে সুশোভিত হইয়া উঠিল। কারণ, ঐ সময়ে তাঁহার প্রথম কার্য্যই এই হইল যে, তিনি অবিলম্বে বুদ্ধগয়ায় গমন করিলেন এবং সেই মহাবৃক্ষের তলে বসিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ইহা কি সম্ভব যে তিনি যে বায়ুতে শ্বাস প্রশ্বাস লইয়াছিলেন আমিও সেই বায়ুতেই শ্বাস প্রশ্বাস লইতেছি? তিনি যে মৃত্তিকার উপর বিচরণ করিয়াছিলেন, আমিও তাঁহারই উপর বিচরণ করিতেছি?"

তাঁহার জীবনের শেষভাগে—উনচত্বারিংশত্তম জন্মদিবসে প্রাতঃকালে তিনি আর একবার ঐরূপে বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৺কাশী দর্শন করিয়া এই যাত্রার শেষ হয়। ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ ভ্রমণ।

যে সময়ে স্বামিজী কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারত পরিভ্রমণ করিতেছিলেন তাহারই কোন সময়ে তিনি বুদ্ধের ভস্মাবশেষ অস্থিসমূহ—সম্ভবতঃ যে স্থানে উহারা প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল সেই স্থানেই—স্পর্শ করিতে পাইয়াছিলেন। তখন যে তিনি প্রবল ভক্তি ও

---

* যাহা বুদ্ধিবৃত্তির অগম্য অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যায়।

† এই দুইখানি পুস্তক তখন ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দক্ষ সম্পাদকতায় এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত হইতেছিল। সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য গ্রন্থের মূল পালির পরিবর্ত্তে সংস্কৃত অক্ষরে ছিল।

নিঃসংশয়তার ভাবে এককালে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইহা পরে বহুবার ঐ প্রসঙ্গের উত্থাপন মাত্র তাঁহাতে উক্ত ভাবের কিছু কিছু প্রকাশ দেখিয়া আমরা একরূপ নিশ্চয় করিয়া লইতে পারি। কোন রমণী অবতারগণকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করা সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা খুবই স্বাভাবিক ; তিনি বলিয়াছিলেন, "বলিতে কি, যদি আমি ন্যাজারেথনিবাসী ঈশার সময়ে যুডিয়ায় বাস করিতাম, তাহা হইলে আমি অশ্রুধারায় নহে হৃদয়ের শোণিতে তাঁহার চরণযুগল ধৌত করিয়া দিতাম !"

একজন তিনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ঠিক না জানিয়া ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে বৌদ্ধ বলায় তিনি বলিয়াছিলেন, "বৌদ্ধ! আমি বুদ্ধের দাসগণ, তাঁহাদের দাসগণ, তাঁহাদের দাস!"—তাঁহার বুদ্ধের প্রতি ভক্তি এরূপ প্রগাঢ় ছিল যে, তাঁহার নিকট তন্মতে বিশ্বাসী হওয়াও যেন এক অতি উচ্চপদ—যেন তিনি উহারও উপযুক্ত নহেন।

বুদ্ধের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক সত্যতাই শুধু তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে নাই। ঠিক ঐরূপ প্রধান আর একটী কারণ এই যে, তাঁহার গুরুদেবের জীবন—যাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহার সহিত সার্দ্ধদ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বের এই সর্ব্বজনস্বীকৃত ইতিহাসের বহুশঃ ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। ভগবান্ বুদ্ধের জীবনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে তিনি ভগবান্ বুদ্ধকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

একদিন বুদ্ধের দেহত্যাগের দৃশ্য বর্ণনকালে চকিতের ন্যায় তাঁহার মনের এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—এক বৃক্ষতলে তাঁহার জন্য কম্বল বিছান হইয়াছিল, এবং সেই আনন্দময় পুরুষ "সিংহের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া" মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় সহসা তাঁহার নিকট এক ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত দৌড়িয়া আসিল। শিষ্যগণ লোকটীর ঐরূপ সময়ে প্রবেশ করা উচিত নহে জ্ঞান করিয়া, এবং তাঁহাদের প্রভুর মৃত্যুশয্যার নিকট কোনক্রমে গোলমাল হইতে দিবেন না সঙ্কল্প করিয়া, তাহাকে

তাড়াইয়া দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ভগবান্ তাঁহাদের কথোপকথন দূর হইতে শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "না, না! ফিরাইয়া দিওনা! তথাগত সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন!" তখনই তিনি কনুইয়ের উপরে ভর দিয়া একটু উঠিয়া তাহাকে উপদেশ করিলেন। ঐরূপ চারিবার ঘটিল; তখন বুদ্ধ ভাবিলেন, "এখন আমি নিশ্চিন্তমনে মরিতে পারি।"—তাহার পূর্ব্বে নহে। স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু তিনি প্রথমে আনন্দকে ক্রন্দন করার জন্য তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, বুদ্ধ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উহা একটী উচ্চ অবস্থার নাম, এবং তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ উহা লাভ করিতে পারেন। আর শেষ নিঃশ্বাসের সহিত তিনি তাঁহাদিগকে কাহারও পূজা করিতে নিষেধ করিলেন।"

অমরকাহিনী ক্রমে সমাপ্ত হইল। কিন্তু যখন স্বামিজী বর্ণনা করিতে করিতে "কনুইয়ের উপর ভর দিয়া একটু উঠিয়া তাহাকে উপদেশ করিলেন," এই স্থলটীতে আসিয়া একটু থামিলেন, এবং আনুষঙ্গিকরূপে বলিলেন, "দেখ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে আমি উহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি!" তখন শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এক জনের নিকট এই অংশটী সর্ব্বাপেক্ষা বহ্বর্থ বলিয়া মনে হইয়াছিল। অমনি আমার মনের মধ্যে সেই ব্যক্তির কথা উদয় হইল—সেই আচার্য্যশ্রেষ্ঠের নিকট শিক্ষা লাভ যাঁহার ভাগ্যে ছিল। তিনি এক শত মাইল দূর হইতে আসিতেছিলেন, এবং যখন তিনি কাশীপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন ঠাকুরের অন্তিমকাল উপস্থিত।* এ ক্ষেত্রেও শিষ্যগণ তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিতেন না, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আপনা হইতেই বলিলেন যে, আগন্তুককে আসিতে দেওয়া হউক, তিনি উহাকে উপদেশ দিবেন।

বৌদ্ধমতবাদের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক অর্থবত্তা সম্বন্ধে স্বামিজী সর্ব্বদাই গভীরভাবে মনে মনে আলোচনা করিতেন। মধ্যে মধ্যে

---

* শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল ঘোষের কাশীপুরস্থ উদ্যানে মহাসমাধি লাভ করেন।

হঠাৎ তৎসম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপন করায়, তিনি যে ঐ বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন তাহা বুঝা যাইত। একদিন তিনি বুদ্ধের উপদেশ-সমূহ* হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, "রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—ইহারাই পঞ্চস্কন্ধ বা পঞ্চতত্ত্ব। এগুলি ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত ও একে অন্যের সহিত মিলিত হইতেছে। ইহারই নাম মায়া। কোন একটী বিশেষ তরঙ্গসম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, কারণ উহা এখন আর নাই। উহা ছিলমাত্র, এখন গত হইয়াছে। হে মানব, জানিও যে, তুমিই সাগরস্বরূপ!" তৎপরে আরও বলিলেন, "মহর্ষি কপিলও এই দর্শনই প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মহানুভব শিষ্যের (বুদ্ধের) অদ্ভুত হৃদয় উহাকে সজীব করিয়া তুলিয়াছিল।"

তার পর সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের কথাগুলি অন্তরের ভিতর ধ্বনিত হওয়ায় তিনি মুহূর্ত্তের জন্য নীরব রহিলেন। তৎপরে তাঁহার মানবাত্মার প্রতি অমর আদেশবাক্যের আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট পন্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হও! কোন কিছু হইতে ভয় না পাইয়া, কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া, তুমি গণ্ডারবৎ একাকী বিচরণ কর!

"সিংহ যেমন কোন শব্দে ভীত হয় না, বায়ু যেমন জালবদ্ধ হয় না, পদ্মপত্র যেমন জললিপ্ত হয় না, তুমিও সেইরূপ একাকী, গণ্ডারবৎ বিচরণ কর!"

(ক্রমশঃ)

---

* বিনয় পিটক, প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য।

গল্পস্বল্প।

মাননীয় উদ্বোধন-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

দর্শনশাস্ত্রের কূটকচালে বিচারের প্রসঙ্গ হলেই প্রাণটা যেন আঁতকে ওঠে। মাসিকপত্রের পাতা উল্টে যদি গল্প পাই সেইটাই পড়ি—অন্য সব চাপা দিয়ে রাখি। 'উদ্বোধন' পত্রকে কি কারণে জানি না প্রাণের সহিত ভালবাসি, কিন্তু উহার পাতা ওল্টাতে গেলেই কেবল 'তত্ত্ব' আর 'তত্ত্ব'—পড়্‌তে পড়্‌তে মাথা টন্‌টনিয়ে উঠে—রেখে দিতে হয়। বোধ হয় অধিকাংশ পাঠকেরই আমার মত দশা। তাই মনে কর্‌লুম—আর কেউ ত উহাতে বড় গল্প লিখ্‌তে এগুচ্ছে না—আচ্ছা, আমি না হয় একবার বেয়ে চেয়ে দেখি, লিখ্‌তে পারি কি না। লেখ্‌বার চেষ্টা করে ত কিছু বেরুলো না। শেষে এই ঝোঁকে গোটাকতক সত্য ঘটনা জান্‌তে পার্‌লুম এবং আপাততঃ উদ্বোধন-পাঠকের খাদ্যস্বরূপে সেইগুলিই লিপিবদ্ধ করে দিলুম। ঘটনাগুলি বৈদেশিক এবং অনেকটা অলৌকিক গোছের। বোধ হয়, এই ছোট গল্পগুলি আপনার পাঠকদের নেহাত অরুচিকর হবে না। যদি ভাল লাগে বোঝেন, জানাবেন। আবার যোগাবার চেষ্টা করা যাবে; নইলে এইবারেই এই চেষ্টার ইতি। ইতি—

আপনার চিরপরিচিত

শ্রীগল্পপ্রিয় দেবশর্ম্মা।

"১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। আমাদের কলেজ বোর্ডিংএ আমার নির্দ্দিষ্ট ঘরে এসে বাতি নিবিয়ে দিয়ে শুয়েছি। পূর্ব্বরাত্রে ঐরূপ সময়েই একটা ঘটনা হয়েছিল। শুয়ে রয়েছি—কে যেন এসে আমার হাতটা ধর্‌লে। ঘরে হঠাৎ কে ঢুক্‌লো মনে করে তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের চারদিক্ খুঁজতে আরম্ভ করলুম—কিন্তু

কোথাও কাউকে দেখ্‌তে পেলুম না। পূর্ব্বরাত্রের সেই ঘটনার কথা বিছানায় শুয়ে ভাব্‌ছি। তখনও দিব্য জেগে রয়েছি। হঠাৎ বোধ কর্‌লুম, কি যেন আবার ঘরের ভিতর ঢুক্‌লো আর আমার বিছানার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। উহা বড় জোর এক মিনিট কি দুমিনিট ছিল। আমি যে চক্ষু কর্ণ বা অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা উহাকে উপলব্ধি করেছিলুম তা নয়, কিন্তু যতক্ষণ উহা ছিল, ততক্ষণ যেন একটা ঘোর অস্বস্তি অনুভব কর্‌ছিলুম। দেখা শুনা প্রভৃতি সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে আমাদের যতটা সুখ দুঃখ এনে দেয়, আমার এই অদ্ভুত অনুভূতির সময় তার চেয়ে আরও অধিকতর প্রবল অনুভূতি আমার হচ্ছিল—যেন আমার ভেতরটাকে একেবারে নাড়াচাড়া দিয়ে দিচ্ছিল। বিশেষতঃ যেন বুকের ভিতর একটা প্রবল বেদনা জেগে উঠে বুকটাকে ছিঁড়ে ফেল্‌ছিল। কিন্তু যন্ত্রণা বল্‌লেও ঐ অনুভূতিটার যেন ঠিক্ ঠিক্ বর্ণনা করা হল না—বরং উহাকে একটা বিজাতীয় ঘৃণা বা বিরক্তি বলে বর্ণনা কর্‌লে যেন অধিকতর সঙ্গত হয়। যাই হক না কেন, একটা কিছু যে আমার কাছে ঐ সময়ে উপস্থিত ছিল, সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে চোখে প্রত্যক্ষ দেখে বরং সে দেখাটাকে ভুল বল্‌তে পারি, কিন্তু এই যে অনুভূতি, এ তার চেয়ে প্রত্যক্ষ—তার চেয়ে আরও স্পষ্ট আরও উজ্জ্বল। যেমন ঘরের ভিতর ঢুকেছিল অনুভব করেছিলুম—তেমনি যখন দরজার ভিতর দিয়ে চকিতের মত বেরিয়ে গেল, তখনও ঠিক সেই রকম স্পষ্ট অনুভব কর্‌লুম। আর উহা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই ভয়ানক অস্বস্তি বোধটাও চলে গেল।

তার পরদিন রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে আছি। আমার কয়েকটী বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, সেই সম্বন্ধে চিন্তা কর্‌ছি। আবার পূর্ব্বরাত্রের মত ঘরে আমি ছাড়া আর একজনের অস্তিত্ব অনুভূত হল, কিন্তু ঐদিন আর কেউ ঘরে ঢুক্‌লো—এ রকম বোধ হল না। সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘোর অস্বস্তিকর ভাবটাও এলো। তখন আমি মনের

সমস্ত শক্তিটাকে একাগ্র করে মনে মনে সেইটের উদ্দেশে বল্‌তে লাগ্‌লুম—'যদি তুই মন্দ হস ত এখনই চলে যা; আর যদি ভাল হস, তবে তুই কে বা কি, তা বল্; আর যদি তোর নিজের পরিচয় দিবার শক্তি না থাকে, তা হলেও তুই চলে যা। আমি তোকে জোর করে বল্‌ছি, তুই চলে যা।' উহা পূর্ব্বরাত্রের মত চলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে আমারও দেহমনের স্বাভাবিক ভাব ফিরে এলো।

আমার জীবনে আরও দুবার ঠিক ঐরূপ ঘটনা ঘটেছিল। একবার পুরো এক কোয়াটার ধরে ঐরূপ অনুভব হয়েছিল। এজগতের কোন লোক যদি আমার কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌ত তাকে যতটা প্রত্যক্ষ, পরিস্কার ও উজ্জ্বল বোধ হতো, পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলিতে একজন যেন আমার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে—এই বোধ তার চেয়েও প্রবল ছিল। উহা আমার খুব কাছে রয়েছে বলে বোধ কর্‌ছিলুম এবং যে সকল সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতি আমাদের হয়ে থাকে, তার চেয়েও বেশীরকম সত্য বলে অনুভব হয়েছিল। যদিও উহাকে আমারই মত সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ও দুঃখিত বলে বোধ করেছিলুম, কিন্তু উহাকে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বলে চিন্‌তে পারি নি।"

যাঁর এই উল্লিখিত অনুভূতিগুলি হয়েছিল, তিনি একজন বিশেষ বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ লোক। সাধারণজনসুলভ কুসংস্কার তাঁর আদৌ নাই। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার কি ব্যাখ্যা দিবেন? পাঠকবর্গ কি ইহাকে ভূত আখ্যা দিতে চান, না মনের কল্পনার তীব্রতা মাত্র? যদি এটীকে কল্পনা বলা যায়, তবে এই প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃষ্ট ও অনুভূত জগৎটাই বা কল্পনা নয় কেন? পূর্ব্বোক্ত ঘটনার বর্ণনকর্ত্তাই তাঁর জীবনের আর কতকগুলি অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন—ঐগুলি পূর্ব্বোক্ত অনুভূতিগুলিরই মত। পার্থক্য এই—প্রথমোক্ত অনুভূতি-গুলিতে দুঃখ ও ঘৃণার ভাব প্রবল, আর শেষোক্তগুলিতে ঠিক তাহার বিপরীত—উহাতে পরম আনন্দের ভাব জড়িত। পাঠক তাঁহার নিজের ভাষায় তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা শুনুন—

"অনুভব হলো কেউ যেন রয়েছে, শুধু তা নয় পরম মঙ্গলস্বরূপ, পরমানন্দময় কেউ যেন সামনে রয়েছেন। আর এ যে একটা অস্পষ্ট ভাসা ভাসা অনুভূতি তা নয়—কোন কবিতা পড়ে বা সুন্দর দৃশ্য দেখে বা সুগায়কের চিত্তহারী গান শুনে বা প্রাণমাতান ফুলের গন্ধ শুঁকে হৃদয়ের ভিতর যেমন একটা আনন্দের ধারা বয়, এ ঠিক তা নয়। আমি নিশ্চিত জান্‌তে পার্‌ছি, কোন শক্তিমান্ পুরুষ আমার খুব নিকটে রয়েছেন। যখন চলে গেলেন, তখন তাঁর স্মৃতি রয়ে গেল—একটা সত্য বস্তুর যেরূপ স্মৃতি থাকে, এরও ঠিক সেই রকম স্মৃতিই রয়ে গেল। বোধ হল. জগতের অপর সকল বস্তু স্বপ্ন হতে পারে, কিন্তু উহা কখনই নহে।"

ইহাকে কি দেবদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন বলিবেন?

* * * *

"আমি একখানি বই পড়্‌ছিলাম—প্রায় বিশ মিনিট পড়া হয়েছে—পাঠে একেবারে বেশ তন্ময় হয়ে গেছি—মনটা বেশ শান্ত, মনে অন্য কোন চিন্তা নাই—কোন বন্ধু বান্ধবের কথা তখন আদৌ মনে নাই—সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। এমন সময় হঠাৎ বোধ হল, আর একজন কেউ আমার ঘরে শুধু রয়েছে যে তা নয়, আমার খুব কাছে রয়েছে। যাঁরা কখন এরকম অনুভব করেন নাই, তাঁরা আমার এই অনুভূতি কতদূর প্রবল ও প্রগাঢ় রকমের হয়েছিল, সহজে কল্পনা কর্‌তে পার্‌বেন না। সমুদয় দেহমনটা যেন প্রবল অনুভূতিময় হয়ে উঠেছিল। বইখানা রেখে দিলুম। খুব একটা উত্তেজনার ভাব এসেছিল তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাতে মনের স্থৈর্য্য কিছুমাত্র হারাই নি—আর কোন রকম ভয়ের ভাবও আসে নি। আমি একখানি ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়্‌ছিলাম—সাম্‌নে আগুন জল্‌ছিল—তার দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে ছিলুম। কিন্তু কি রকমে বল্‌তে পারি না—কিন্তু ঠিক জান্‌তে পার্‌লুম যে, আমার বন্ধু এ, এইচ। আমার বাম পার্শ্বে ঠিক পিছনে ও এত নিকটে যে, চেয়ারখানিই যেন মাঝখানে ব্যবধান। আমি শরীরটাকে না নেড়ে কেবল চোকটা সেই দিকে

ফেরালুম। একটা পায়ের নীচের অংশটা দেখ্‌তে পেলুম। তখন সে সদা সর্ব্বদা যে ধূসর নীলবর্ণের ইজের পোর্‌তো, তা চিন্‌তে পার্‌লুম। চুরুটের ধোঁয়া ক্রমাগত অবিচ্ছেদে উঠ্‌তে থাক্‌লে যে রকম দেখায়, ঠিক সেই রকম রং।"

* * * *

"ঘুমিয়েছিলুম, হঠাৎ জেগে উঠ্‌লুম। তখনও রাত বেশী হয় নি। বোধ হল, কেউ যেন আমাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক জাগিয়ে দিলে। প্রথমটা ভাব্‌লুম, বুঝি বাড়ীতে চোর ঢুক্‌ছে। * * খানিকক্ষণ পরে পাশ ফিরে আবার ঘুমুবার চেষ্টা কর্‌লুম। কিন্তু তখনই মনে হল, কে যেন আমার ঘরে রয়েছে। আর আশ্চর্য্য ব্যাপার—কোন জীবিত ব্যক্তি রয়েছে বলে বোধ হচ্ছে না—যেন সূক্ষ্মশরীরী কেউ এসেছে। এ কথা শুনে আপনারা হেঁসে উঠ্‌তে পারেন, কিন্তু যা যা ঘটেছিল, আমি ঠিক ঠাক তাই আপনাদের কাছে বর্ণনা কর্‌ছি। আর কোন রকমে উহার বর্ণনা কর্‌তে পার্‌ছি না, কাযে কাযেই বল্‌ছি—বোধ হল যেন সূক্ষ্মশরীরী কেউ সেখানে উপস্থিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গা-ছম্‌ছমানি এবং ভয়ও এলো। মনে হল, বুঝি কিছু ভয়ানক ও আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘট্‌বে।"

* * * *

"বিশ থেকে ত্রিশ বৎসরের ভিতর আমি ক্রমশঃ বেশী বেশী অজ্ঞেয়বাদী ও ধর্ম্মে অবিশ্বাসী হতে লাগ্‌লুম। কিন্তু হার্বার্ট স্পেন্সার সমুদয় দৃশ্যজগতের অন্তরালে অবস্থিত পূর্ণ সত্যবস্তুর যে 'অস্পষ্ট অনুভূতির' কথা অতি উত্তমরূপে বর্ণনা করেছেন, সেই অস্পষ্ট অনুভূতি যে আমি কোন কালে হারিয়েছি তা বল্‌তে পারি না। আমার কাছে ঐ সত্যটী যে হার্বার্ট স্পেন্সারের দর্শনসঙ্গত খাঁটি একটা অজ্ঞেয় বস্তু—ঠিক তা ছিল না। কারণ, যদিও আমি ঈশ্বরের নিকট অজ্ঞ শিশুজনোচিত প্রার্থনা ছেড়ে দিয়েছিলুম, আর ঐ 'তৎ' বস্তুর কাছে নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে প্রার্থনা কখনই কর্‌তুম না, কিন্তু আমার বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা থেকে বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে, ঐ 'তৎ'

বস্তুর সঙ্গে আমার একটা কোন রকম সম্বন্ধ ছিল —আর যাকে লোকে 'প্রার্থনা' বলে, নামে না হলেও কার্য্যতঃ উহা সেই জিনিষই ছিল যখনই কোন গোলমালে পড়্তুম, বিশেষতঃ পারিবারিক বা বৈষয়িক ব্যাপারে, যদি অপর লোকের সঙ্গে আমার একটা বিরোধ হত অথবা যখন আমার মনের ভিতর নৈরাশ্যভাব আস্তো অথবা কোন বিষয়ের জন্য উৎকণ্ঠিত হতুম, এখন বুঝ্তে পারছি, তখনই সান্ত্বনার জন্য—আশ্রয়লাভের জন্য—এই বিশ্বব্যাপী মূল 'তৎ' বস্তুর আশ্রয় নিতুম। অনুভব কর্তুম যেন ঐ 'তৎ' বস্তুটী সেই বিশেষ গোল-যোগের সময় আমার পক্ষে রয়েছে অথবা আমি তার দিকে রয়েছি। আর উহাতেই আমাকে সর্ব্বদা বল এনে দিত—উহাতে আমার ভিতর যেন একটা অনন্ত জীবনীশক্তি এনে দিত—উহার সত্তার উপলব্ধিতে আমি একটা দাঁড়াবার জায়গা—একটা আশ্রয়স্থল পেতুম। প্রকৃতপক্ষে যখনই কোন দুর্ব্বলতা আস্তো, তখনই আমি যেন সংস্কারবশে তার আশ্রয় নিতে ছুট্‌তুম। আর সেই জীবন্ত, ন্যায়, সত্য ও বলের উৎসস্বরূপ 'তৎ' বস্তুটীর আশ্রয় লাভ থেকে কখনই বঞ্চিত হতুম না। এই 'তৎ' বস্তুর সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিল—এখন জান্‌ছি। কারণ, কিছুকাল হতে ইহার সহিত ভাব আদানপ্রদানের শক্তি আমার নষ্ট হয়ে গেছে এবং সেই জন্য আমার জীবনে একটা স্পষ্ট ক্ষতি হয়েছে বুঝ্তে পার্ছি। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখনই সেই 'তৎ'এর দিকে ফিরতুম—তখনই তাকে পেতুম। তার পর কয়েক বর্ষ এমন ভাবে কাট্‌লো যে, কখন কখন তাকে পেতুম আবার কখন বা একেবারেই তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপন কর্‌তে পারতুম না। স্মরণ হয়, বহু রাত্রি এমন কেটেছে যে বিছানায় শুয়ে নানান কষ্টে ও দুশ্চিন্তায় ঘুম আস্‌ছে না—অন্ধকারে এপাশ ওপাশ কর্‌ছি—মনে মনে হাতড়াচ্ছি—কোথায় আমার মনের ভিতর সেই উচ্চতর মন—যা আমি পূর্ব্বে সদা সর্ব্বদা অনুভব কর্‌তুম,, যা সদা সর্ব্বদা আমার কাছে কাছে থেকে আমাকে আশ্রয় দিত—কিন্তু তার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ ছিল, তার বৈদ্যুতিক প্রবাহ যেন কে এখন

কেটে দিয়েছে। তখন সেই 'তৎ'এর বদলে শূন্য—কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। এখন পঞ্চাশ বছর বয়সে উহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের শক্তি আমার একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে আর আমাকে স্বীকার কর্‌তে হচ্ছে যে, আমার জীবনের একটা মহা সহায় আমি হারিয়েছি। একটা ঔদাসীন্যময় জীবন্মৃতভাব আমার এসেছে। আর এখন আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, গোঁড়ারা যাকে 'প্রার্থনা' নাম দেয়, আমার পূর্ব্বোক্ত অভিজ্ঞতাও সম্ভবতঃ ঠিক সেই একই জিনিষ ছিল! কেবল আমি তার 'প্রার্থনা' নামটী দিতুম না। আমি যাকে 'তৎ' আখ্যায় অভিহিত কর্‌লুম, তা ঠিক স্পেন্সারের অজ্ঞেয় বস্তু নয়, উহা আমার সংস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তিগত ঈশ্বর—যাঁর উপর আমি মানবসুলভ সহানুভূতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ সহানুভূতি লাভের ভরসা রাখ্‌তুম—আর যাঁকে আমি কি জানি কেন এখন হারিয়েছি।"

* * * *

"আমার সেই রাত্রিটীর কথা বেশ স্পষ্ট মনে আছে। আর শৈলশিখরের সেই স্থানটীর কথাও বেশ স্মরণ আছে। আমার আত্মা যেন বিকাশ পেয়ে সেই অনন্তস্বরূপে গিয়ে পড়্‌লো—অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ দুই জগৎই যখন পরস্পর পরস্পরের দিকে প্রবলবেগে ছুটে এসে মিলে গেল। আমার আত্মার গভীরতম প্রদেশ—সেই ভিতরের জিনিষ যা আমার ক্রমাগত চেষ্টা ও সাধনার ফলে খুলে গেছ্‌লো, তার আহ্বানে যেন বাহিরের সেই নক্ষত্রপুঞ্জেরও পারবর্ত্তী অসীম গভীর সাড়া দিলে। অনুভব কর্‌লুম—যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি জগতের সকল সৌন্দর্য্য, ভালবাসা, দুঃখ, এমন কি প্রলোভনেরও সৃষ্টি করেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে একলা দাঁড়িয়ে। অনুসন্ধানের চেষ্টা নাই—তাঁর সঙ্গে আমার আত্মার সম্পূর্ণ একত্ব অনুভব কর্‌লুম। সাম্‌নে যে সকল সাধারণ দৃশ্য ছিল, তা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে গেল। সেই মুহূর্ত্তের জন্য এক অপূর্ব্ব আনন্দ ও উল্লাস ছাড়া আমার আর কোন ভাব রইল না। এই উপলব্ধিটী সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা অসম্ভব। কতকটা এই বল্‌লে বোঝা যেতে পারে যে, যেন

ঐক্যতান বাদনের বিভিন্ন সুরগুলি সব এক সঙ্গে মিশে গেছে—শ্রোতা আর কিছু অনুভব করছে না। কেবল অনুভব করছে, তার আত্মা যেন ক্রমাগত ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধতর দিকে ছুটেছে—সে যেন নিজের ভাবে নিজে ফেটে পড়্‌বার উপক্রম হয়েছে। সেই নিস্তব্ধতম নিশা যেন গম্ভীরতর নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন ও চমকিত হতে লাগ্‌লো। সেই তমসার ভিতর একটা সত্তার অনুভব হতে লাগ্‌লো—তাকে চোকে দেখা যাচ্ছে না বলেই যেন অধিকতর উজ্জ্বলভাবে অনুভব হতে লাগ্‌লো। আমি যেমন নিজের অস্তিত্বে সন্দেহ কর্‌তে পারি না, তদ্রূপ তিনি যে সেখানে রয়েছেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ কর্‌বার যো রইল না। বরং আমি আমাকে এই দুইএর মধ্যে যেন কম সত্য বলে বোধ কর্‌তে লাগ্‌লুম।

"তখন হতে ঈশ্বরসম্বন্ধে যথার্থতম ধারণা ও তাঁর প্রতি উচ্চতম বিশ্বাস আমার ভিতর জন্মালো। যে পর্ব্বতে আমার এই দর্শন-লাভ হয়, তথায় তারপর অনেক বার গিয়ে দাঁড়িয়েছি—সেই অনন্ত-স্বরূপকেও আমার চতুর্দ্দিকে অনুভব করেছি, কিন্তু প্রথম দিনে যেরূপ হৃদয়ের প্রবল আবেগ অনুভব করেছিলুম, সেরূপ আর কখনও হয়নি। আমার বিশ্বাস, সেই দিন আমি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছিলুম—এবং সেই পরমাত্মার অনুপ্রাণনে নব জন্ম লাভ করে-ছিলুম। আমার স্মরণ হচ্ছে যে, আমার চিন্তা বা বিশ্বাসে কোন আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটে নি—কেবল আমার প্রথমাবস্থায় ঈশ্বর-বিষয়ক অপরিপক্ক ধারণারূপ কুসুমকলি যেন ফুটে উঠে প্রস্ফুটিত কুসুমের আকার ধারণ করেছিল। পুরাতন যা ছিল তা নষ্ট হয় নি, কিন্তু সেইটাই যেন দ্রুত ও অদ্ভুতভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছিল। সেই সময় থেকে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কোন প্রকার তর্কবিতর্কই আমার বিশ্বাসকে বিচলিত কর্‌তে পারে নি। একবার পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করে দীর্ঘকালের জন্য আমি কখন তাঁকে হারাই নি। আমার সেই সাক্ষাৎ দর্শন—সেই উচ্চতম অনুভবের স্মৃতি এবং যাঁরাই ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁদের ও জীবনে এইরূপ কোন না কোন ঘটনা ঘটেছে—

অধ্যয়ন ও গভীর প্রণিধানলব্ধ এই দৃঢ় বিশ্বাসই আমার ঈশ্বরবিশ্বাসের গভীরতম ভিত্তি। আমি জানি, ইহাকে যথার্থই 'রহস্যময়' (mystical) বলা যেতে পারে। আমার দার্শনিক জ্ঞান ততদূর নাই, যাতে উক্ত বা অন্য কোনরূপ অভিযোগের ক্ষালন করে আমার এই অনুভূতির পক্ষে কিছু বল্‌তে পারি। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমি আমার অনুভূতির ব্যাপারটীকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা কর্‌তে পারি নি, কেবল কতকগুলি কথার ঝুড়ি রচনা করেছি মাত্র। তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যে, এখন আমার পক্ষে যতটা সম্ভব, ততটা সতর্কতার সহিত উহার সঠিক বর্ণনা করেছি।'*

নীচে রচিত গ্রন্থাদির পরিচয়।

(শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিগত অগ্রহায়ণ মাসে আমরা নীচের কতকগুলি পুস্তকের পরিচয় প্রদান করিয়াছি—এইবার তাঁহার অন্যান্য পুস্তকের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

The Genealogy of Morals গ্রন্থ—কতক পরিমাণে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ Beyond Good and Evil গ্রন্থের টীকাস্বরূপ লিখিত হয়। Beyond Good and Evil গ্রন্থ পাঠ করিয়া সুইজারল্যাণ্ড দেশের একজন সমালোচক এক বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশ করেন। উক্ত সমালোচক বলেন যে—এই গ্রন্থ অরাজকতার (Anarchism) পৃষ্ঠপোষক। সম্ভবতঃ ঐ গ্রন্থে ইউরোপের জাতিসকলের সংকীর্ণ জাতীয়তার বিরুদ্ধে নীচে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছিলেন সেই সমস্ত

---

* লেখক মহাশয় এই গল্পগুলি প্রফেসর জেমসের 'Varieties of Religious Experience' গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন—উঃ সঃ।

কথাই নির্দ্দেশ করিয়া নীচেকে অরাজকতার পৃষ্ঠপোষক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। নীচে এই সমালোচনাপাঠে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াই The Geneology of Morals গ্রন্থ লেখেন।

এই গ্রন্থে তিনটি প্রবন্ধ দৃষ্ট হয়। প্রথম প্রবন্ধে খৃষ্টান ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনা মনস্তত্ত্বের দিক হইতে এক অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সন্দেহ নাই। নীচে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, মানুষের যা কিছু মহৎ আদর্শ হওয়া উচিত, খৃষ্টান ধর্ম্ম ঠিক তাহার বিপরীত আদর্শ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে বিবেকের উৎপত্তিসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। "বিবেক মনুষ্যহৃদয়ে ঈশ্বরের বাণী"—এই প্রবন্ধে নীচে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। মানুষ সাধারণতঃ কি উদ্দেশ্যে, এবং কিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া নৈতিক আদর্শসমূহ সৃষ্টি করে, এবং বাস্তবিক পক্ষে সেই সমস্ত আদর্শের স্বরূপতঃ কোন মূল্য বা সার্থকতা আছে কিনা, ইত্যাদি প্রশ্নের সূক্ষ্ম আলোচনা এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় প্রবন্ধে মধ্যযুগের সন্ন্যাসের আদর্শকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। নীচের মতে সন্ন্যাসের আদর্শ মনুষ্য জাতিকে ক্রমশঃ অবনতির দিকে লইয়া যায়, এবং পরে এক মহাশূন্যের মধ্যে তাহার বিলোপ সাধন করে। তবে এই ক্রম-অবনতিশীল আদর্শ এক সময়ে যে এত প্রবল হইয়াছিল তাহার কারণ ইহা নয় যে— ঈশ্বরের শক্তি এই আদর্শের পশ্চাতে কার্য্য করিয়াছে, তাহার প্রকৃত কারণ, সন্ন্যাসের আদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোন আদর্শ তৎকালে প্রচলিত হয় নাই। এবং নীচে বিশ্বাস করেন যে, Superman— অতিমানুষবাদ—এই আদর্শ মনুষ্যসমাজে প্রচারিত হইবার পর সন্ন্যাসের আদর্শ আর মানুষকে বিপথগামী করিতে সমর্থ হইবে না।

The Twilight of the Idols—মাত্র কয়েক দিনের পরিশ্রমে লিখিত হয়। নীচে বলেন, যদি কেহ আমার সময়ে বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে নৈতিক ও ধর্ম্মের আদর্শ প্রভৃতি কিরূপে ভ্রান্ত পথে ধাবিত

হইয়াছিল দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে যেন আমার The Twilight of the Idols গ্রন্থখানি পাঠ করেন।

এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য হইতেছে যে, ধর্ম্ম ও নীতির সেকেলে আদর্শসকল নীচের আবির্ভাবের পর হইতেই পালাইবার পথ পাইতেছে না।

নীচে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার নিজের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া যেরূপ দাম্ভিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই অনেকে নীচের মানসিক অবস্থাসম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থসম্বন্ধেও তাঁহার আত্মপ্রশংসা সাধারণের চক্ষে আত্মম্ভরিতার নামান্তর বলিয়া গৃহীত হইবে।

এই গ্রন্থসম্বন্ধে বলিতে গিয়া নীচে বলিতেছেন যে, "সত্যের আদর্শ একমাত্র আমার কাছেই আছে, কেবলমাত্র একা আমিই ভালমন্দ বিচার করিতে সক্ষম। এতদিন পর্য্যন্ত মানুষের সভ্যতা ক্রমশঃ অবনতির পথেই ধাবিত হইয়াছে—আমিই সর্ব্বপ্রথম তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। সত্য কথা বলিতে কি, আমার পূর্ব্বে আর কেহই, সমগ্র মনুষ্যজাতির জন্য প্রকৃত উন্নতির পথ কি, তাহা জানিত না। কিন্তু এখন আর কোন ভাবনা নাই; কেননা মানুষের প্রকৃত উন্নতির পথ এখন আমি খুব পরিষ্কার রকমে মানচিত্র অঙ্কনের ন্যায় চিত্রিত করিয়া দিয়া গেলাম। মানুষের এই নূতন সভ্যতার আমিই হইতেছি সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক।"

The Twilight of the Idols—গ্রন্থসম্বন্ধে এইরূপ মত নীচে যে পোষণ করিতেন, তাহা উক্ত গ্রন্থ লেখার দুই বৎসর পরে তিনি প্রকাশ করেন।

অপরকে আক্রমণ ও গালাগালি দিবার স্পৃহা এই গ্রন্থে অতিমাত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইংরাজ জাতিকে এই গ্রন্থে বিশেষরূপে গালাগালি দেওয়া হইয়াছে। কার্লাইল, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, কেহই বাদ যান নাই।

এই গ্রন্থ লেখা যে দিন শেষ হইয়াছে, ঠিক সেই দিনই নীচে

An Attempted Transvaluation of all Values"—গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া যান। নীচের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে যে সমস্ত আদর্শ (values) সাধারণতঃ সভ্যজগতে প্রচারিত ও প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল —নীচের বিশ্বাস যে তাহাতে ক্রমশঃ মনুষ্যসমাজের অবনতি হইতেছে। কাজেই তিনি সেই সমস্ত আদর্শকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য এই গ্রন্থে একটা প্রয়াস করিয়াছেন। যাহা কিছু প্রচারিত, আচরিত বা প্রচলিত আছে—তাহাই যে একমাত্র সম্ভবপর সত্য আদর্শ বা বস্তু, নীচে তাহা বিশ্বাস করেন না। অনেক ভ্রান্ত আদর্শ—ধর্ম্ম ও নীতি, যাহা মনুষ্যসভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইতে উদ্যত তাহাও অবাধে, বিনা বিচারে ও পরীক্ষায়, মনুষ্যসমাজে অত্যন্ত গৌরবের সহিত প্রচলিত আছে। নীচে সেই সমস্ত আদর্শের মস্তকে হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করিবেন, যে গুলি দৃঢ় তাহারা টিকিবে, যেগুলি জীর্ণ—সেগুলি চূর্ণ হইয়া যাইবে !

The Case of Wagner গ্রন্থ—কেবলমাত্র ওয়েগনারের—ব্যক্তিগত বিশেষত্বসম্বন্ধে লেখা হয় নাই। ইহাতে সাধারণভাবে "A Musician's Problem"—সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির সমস্যার বিশদ্ আলোচনা আছে। নীতির আদর্শে এবং ধর্ম্মের আদর্শে—নীচে খৃষ্টানী নিষেধাত্মক (Nay saying) আদেশ বা Commandments কে যেরূপ ঝাঁটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে Yea-saying আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন—সাধারণভাবে আর্ট—এবং বিশেষভাবে সঙ্গীতসমাজেও নীচে সেইরূপ একটা সংস্কারের কথা বলিয়াছেন। নীচের বিশ্বাস যে ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতও নিষেধাত্মক (Nay-Saying) আদর্শ দ্বারা ভ্রান্ত পথে চালিত হইয়াছে। এবং ইহারও সংস্কার প্রয়োজন।

সঙ্গীতসম্বন্ধে বলিতে গিয়াই ওয়েগনারের প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অথবা ওয়েগনারকে উপলক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থে নীচে তাঁহার সঙ্গীতসম্বন্ধে সংস্কারের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

নীচে বলিতেছেন—"আমি একজন বহু যুদ্ধের ফেরতা সৈনিক—আমি কি ইচ্ছা করিলে আমার এই বন্দুক ওয়েগ্‌নারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতে পারি না? কিন্তু ওয়েগনার ও আমার মধ্যে যাহা কিছু হইয়াছে—তাহা আমি বাহিরে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি যে ওয়েগনারকে ভালবাসিয়াছি (I have loved Wagner !") আশ্চর্য্য! ওয়েগনার ও নীচের মধ্যে যে ঝড় বহিতেছিল—যে অমানিশার অন্ধকার, যে অশনিগর্জ্জন আমাদিগকে ব্যথিত, ভীত, ও বিস্মিত করিয়া আসিয়াছে—তাহার মধ্য হইতে নীচের কণ্ঠে এই দৃঢ় স্থির মনুষ্যোচিত বাণী—বিশেষতঃ একেবারে উন্মাদ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই—স্বতঃই নীচের জন্য আমাদের চক্ষুকে বাষ্পার্দ্র করিয়া তুলে! নীচে যে শেষ পর্য্যন্ত বলিতে পারিয়াছেন, ওয়েগনারকে আমি ভালবাসিয়াছি, ইহাই তাঁহার সমস্ত তীব্র উক্তির তলদেশে একটি মহান্ ও গভীর মনুষ্য-হৃদয়ের পরিচয়।

এই গ্রন্থসম্বন্ধে নীচে তাঁহার নিজের মত ব্যক্ত করিতে যাইয়া সমগ্র জার্ম্মাণ জাতিকে এমন ভাবে গালাগালি দিয়াছেন যে, আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। নীচের মতে গত চারিশত বৎসরের মধ্যে সভ্যতার বিরুদ্ধে যে সমস্ত বড় বড় পাপ করা হইয়াছে, তাহা সমস্তই জার্ম্মাণেরা করিয়াছে। [Every great crime against culture for the last four centuries lies on their (the Germans') conscience].

The Antichrist নামক যে গ্রন্থ আমরা পাই, তাহাকে একখানা সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলা যাইতে পারে না। নীচে আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন যাহাতে একখানি বৃহৎ সম্পূর্ণ গ্রন্থে তাঁহার সমস্ত প্রধান প্রধান মতগুলি সন্নিবেশিত করিয়া তিনি প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু তাহা তিনি কখনই পারিয়া উঠেন নাই। তাঁহার মন্দ স্বাস্থ্য বা তাঁহার স্বভাব বা কবিপ্রতিভা কি ইহার অন্তরায় ছিল, কে বলিবে? মানসকল্পিত এইরূপ একখানি সম্পূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থের প্রথম ভাগ হইতেছে, The Antichrist। বলা বাহুল্য যে ইহার দ্বিতীয়, তৃতীয় বা অন্য কোন

ভাগই আর বাহির হয় নাই। এই গ্রন্থে নীচে খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাঁহার বক্তব্যগুলি গুছাইয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সমস্ত ধর্ম্মেই ত্রুটি আছে, কিন্তু নীচের মতে খৃষ্টান ধর্ম্মের অপরাধ অমার্জ্জনীয়। কেননা ইহার অনুষ্ঠান ও আদেশ, যাহাতে জীবনের বিকাশ হয়, তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। খৃষ্টান ধর্ম্ম মনুষ্যজীবনের বিকাশবিরোধী। আর নীচের দর্শন মনুষ্যজীবনের বিকাশপ্রার্থী। কাজেই খৃষ্টান ধর্ম্মের সহিত কোনরূপ আপোষ নীচের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। হয় নীচে নয় খৃষ্ট—এক সঙ্গে দুই একেবারে অসম্ভব।

The Will to Power—গ্রন্থও একখানি বৃহদাকারের সম্পূর্ণ গ্রন্থ লিখিবার কল্পনা ও প্রয়াস হইতে লিখিত হয়। নীচের অপরাপর দুএকখানি গ্রন্থ যেরূপ অতি অল্প সময়ের মধ্যে, কোন কোনটা বা দুচার সপ্তাহের মধ্যেই লেখা আরব্ধ ও শেষ হইয়াছে, এ গ্রন্থখানি কিন্তু সেরূপ হয় নাই। দীর্ঘ ছয়টি বৎসর ধরিয়া নীচে এই গ্রন্থখানির বিষয় চিন্তা করিয়াছেন। ১৮৮৩—৮৯ এই ছয় বৎসরেও নীচে এই গ্রন্থ-খানিকে তাঁহার ইচ্ছামত সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন না।

এই গ্রন্থের প্রধান জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, মনুষ্যজীবনের মূল এবং প্রকৃতিগত লক্ষ্য কি? উত্তর হইতেছে—The Will to Power—শক্তির অর্জ্জন বা উৎকর্ষসাধনের ইচ্ছা। নীচের পূর্ব্বে দার্শনিক জগতে মনুষ্যজীবনের প্রকৃতিগত লক্ষ্যের বিষয় বলিতে গিয়া যাহারা উক্ত প্রকৃতিগত লক্ষ্যকে Struggle for Existence বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, নীচে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন, জীবনের লক্ষ্য Struggle for Existence নয়, জীবনের লক্ষ্য হইতেছে—The Will to Power। শুধু কোন রকমে কায়-ক্লেশে জীবন-সংগ্রামের মধ্যে টিকিয়া থাকা—ইহা জীবনের প্রকৃতিও নয়, লক্ষ্যও নয়। ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর শক্তির উদ্বোধন ও অর্জ্জন, নব নব শক্তির উন্মেষ ও একনিষ্ঠ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে জীবনে তাহা আয়ত্ত করা—ইহাই হইতেছে মনুষ্যজীবনের প্রকৃতি ও লক্ষ্য। এবং নীচে এই নূতন মতবাদের আবিষ্কারক।

এই গ্রন্থের উপরোল্লিখিত মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি ব্যতিরেকে আরও অনেক সমস্যার অবতারণা ও তাহার সম্পূরণের চেষ্টা ইহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থে সমাজিক সাম্যবাদকে (Socialism) মূর্খ এবং ছোট লোকের অত্যাচার (The tyranny of the meanest and the most brainless) বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম্মকে অক্ষম ও দুর্ব্বলের ধর্ম্ম বলিয়া উপেক্ষা করা হইয়াছে, মিল ও স্পেন্সারের দর্শনকে অর্ব্বাচীনের দর্শন বলিয়া ঠাট্টা করা হইয়াছে। জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) ও সুপ্রজনন বিদ্যা (Eugenics) সম্বন্ধে সাধারণ প্রচলিত মতবাদ হইতে অল্লাধিক নূতন ও মৌলিক গবেষণাপূর্ণ মতবাদের অবতারণাও এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

মোটের উপর এই গ্রন্থে নীচে মানবজীবনের প্রকৃতিগত লক্ষ্য যে The will to power—তাহা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। এবং যে সমস্ত মনুষ্য দৃঢ় ইচ্ছার প্রয়োগে জীবনে এই শক্তির বোধন করিতে অগ্রসর হইবেন,তাঁহারা অবশ্যই— খৃষ্টান ধর্ম্ম, বর্ত্তমান সামাজিক সাম্যবাদ (socialism), মিল স্পেন্সারের মেকী দর্শন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া নীচের পথে চলিবেন। এবং সেই will to power এর পথ দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে Superman বা অতি-মানুষবাদে গিয়া সম্ভবতঃ একদিন উপনীত হইবেন।

Ecce Homo—নীচের শেষ গ্রন্থ। ইহা নীচের আত্ম-জীবনী। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই বইখানি লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহার পর নীচে সম্পূর্ণ উন্মাদগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং আর কোন গ্রন্থ লিখিতে পারেন না।

এই গ্রন্থপাঠে প্রায় অধিকাংশ পণ্ডিতই স্থির করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ মানসিক বিকারের অবস্থায় লিখিত হয়।

নিশ্চয়ই এই গ্রন্থের উক্তিতে যুক্তিতে, আত্মম্ভরিতায় এমন কিছু প্রকাশ পায়, যাহা সাধারণভাবে যাহাদের সুস্থ বলা হয়, তাহাদের পক্ষে অশোভনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু নীচে কোন্ গ্রন্থে এবং কোন কালেই বা সাধারণতঃ সুস্থ মানুষের মত লিখিয়াছেন

বা জীবনধারণ করিয়াছেন? নীচের আত্মম্ভরিতা ও সাধারণ মানুষের আত্মম্ভরিতাকে আমি এক বস্তু মনে করিতে পারি না। কেননা বিনয় ও দীনতা সাধারণ মানুষের নীতির আদর্শ, অবিনয়ী হওয়া, আত্মম্ভরি হওয়া তাহাদের পক্ষে মহা অন্যায়। কিন্তু বিনয়, দীনতা প্রভৃতিকে যে মনুষ্য ভ্রান্ত নৈতিক আদর্শ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য আজীবন প্রয়াসী, তাঁহার পক্ষে বিনয়ী হওয়ার মত অপরাধ ও অন্যায় আর কি হইতে পারে? মোটের উপর Ecce Homo গ্রন্থকে যাহারা উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া উপহাস করেন,—আমরা তাহাদের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে প্রস্তুত নই।

এই গ্রন্থে নীচে তাঁহার সমস্ত জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলিকে এবং তাঁহার রচিত সমগ্র গ্রন্থাবলীকে মাত্র তিন সপ্তাহ কালের মধ্যে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থাবলীর এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করিয়াছেন যে, ঠিক এই বৎসরেই কি করিয়া তিনি চিরদিনের জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন—ভাবিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়! মানসিক বিকার ও অসুস্থতাই যদি Ecce Homo গ্রন্থরচনার প্রেরক হয়,তবে সাধারণ মানুষের মানসিক বিকার মনুষ্যজাতির জন্য ও সভ্যতার উন্নতির জন্য অধিকতর বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলির অদ্ভুত নামকরণ দেখিয়াই অনেক পল্লবগ্রাহী গুঞ্জনপ্রিয় পাঠক দূর হইতে নাক সিঁটকাইয়াই মুখ ফিরাইতে পারেন এমন আশঙ্কা হয়। কেননা ইহার অধ্যায়গুলির নাম হইতেছে—

(১) কেন আমি এত জ্ঞানী (Why I am So Wise)?

(২) কেন আমি এত চতুর (Why I am So Clever)?

(৩) কেন আমি এত উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিতে সক্ষম হইলাম (Why I write such Excellent Books)?

(৪) কেন আমি এত বিপজ্জনক (Why I am a Fatality)?

নিজের সম্বন্ধে নীচের যে একটা অতি পরিষ্কার রকমের আত্ম-উপলব্ধির জ্ঞান ছিল, মানুষ তাঁহাকে যাহা ভাবিতে পারে, তাহা যে তিনি বুঝিতে পারিতেন,— Ecce Homo গ্রন্থ পাঠে আমাদের সেই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে।

বুদ্ধবাণী।

আসন-প্রসঙ্গ।

(পালি হইতে—)

(শ্রীগোকুলদাস দে, বি, এ)

ভগবান্ বুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারার্থ দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে কোশলরাজ্যে সঙ্ঘসহ আগমন করিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তিমহিমা সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অর্হৎ, সম্যক্-সম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচার-সম্পন্ন, লোকজ্ঞ, পুরুষসিংহ, দুষ্টের দমনকর্ত্তা, পাপত্রাতা এবং দেব ও মানবের অধীশ্বর—ভগবান্ বুদ্ধ আবালবৃদ্ধ-বণিতার পূজনীয় হইয়াছেন। তিনি জ্ঞানলাভ করিয়া—সাক্ষাৎ সত্য উপলব্ধি করিয়া—দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব এবং মনুষ্যলোকে বিশেষতঃ শ্রমণ, ব্রাহ্মণদিগের ভিতর জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন, ইহা সকলেই জানিতেন। তাঁহার ধর্ম্মের আদি, মধ্য ও অন্ত সমস্তই কল্যাণময়। যেহেতু একমাত্র অনাবিল ব্রহ্মচর্য্য সাধনই তাঁহার ধর্ম্মের এবং যুক্তি ও ব্যাখ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি যে স্থানে গমন করিতেন, তত্রস্থ অধিবাসিগণ তাঁহার আগমনের সংবাদ প্রাপ্তি-মাত্রেই আগ্রহের সহিত তাঁহার দর্শনমানসে ব্যাকুল হইয়া ছুটিত। এমন কি, তাঁহার ধর্ম্মের প্রতিবাদী ব্রাহ্মণগণও কেবল তাঁহার সেই অভীঃবাণী-নিঃসারী প্রেমময় বৈরাগ্যমূর্ত্তি দর্শনাভিলাষে আগমন করিতেন এবং দর্শনমাত্রেই তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার

চরণে প্রণত হইতেন। তাঁহার মিষ্ট আলাপে পরিতৃপ্ত হইয়া অবশেষে কেহ কেহ বা তাঁহার ধর্ম্মও গ্রহণ করিতেন।

এইরূপে তিনি কোশলরাজ্যের অন্তর্গত বৈণাকপুরে উপস্থিত হইলেন। এই গ্রামের অধিবাসী অধিকাংশ ব্রাহ্মণ বলিয়া ইহা ব্রাহ্মণগ্রাম বলিয়াই অভিহিত হইত। অচিরে তথাগতের আগমন-সংবাদ গ্রামমধ্যে ঘোষিত হইল। দর্শনপিপাসু লোক দলে দলে ভগবানের নিকট আসিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে বৈণাকপুর-নিবাসী ব্রাহ্মণগণও আগমন করিতে লাগিলেন। সেই প্রবীণ ব্রাহ্মণমণ্ডলী ভগবান্‌কে অভিবাদন করতঃ স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী আসন গ্রহণপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর তন্মণ্ডলী মধ্যস্থ 'বচ্ছগোত্ত'নামক এক ব্রাহ্মণ ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া এই বাক্যগুলি বলিলেন—

"হে গোতম, আমরা আপনার এতাদৃশ শুদ্ধাবস্থা দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আপনার কান্তি অতীব সুশ্রী ও প্রভাময়। ধনী ও রাজন্যবর্গ সেবিত বলিয়া আপনি নিশ্চয়ই এই সকল মহামূল্য আসন ও শয্যাগুলি অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন। যথা (১) আসন্দি, (২) পল্লঙ্ক, (৩) গোনক, (৪) চিত্তকা, (৫) পটীকা, (৬) পটলিকা, (৭) তুলিকা, (৮) বিকতিকা, (৯) উদ্দলোমী, (১০) একন্তলোমী, (১১) কট্টিস্সং, (১২) কোসেয্যং, (১৩) কুত্তকং, (১৪) হত্থত্থরং, (১৫) অস্সত্থরং, (১৬) রথত্থরং, (১৭) আজিনপ্পবেণি, (১৮) কদলিমিগপবরপচ্চত্থরণং (১৯) স উত্তরচ্ছদং এবং (২০) উভতলোহিত কুপধানং।*

*(১) একরূপ দীর্ঘ আরামপ্রদ কাষ্ঠাসন (২) সাধারণ খাট বা পর্য্যঙ্ক (৩) মেষরোম-প্রস্তুত আস্তরণ (৪) বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট পশমী আস্তরণ (৫) শ্বেত পশমী বস্ত্র (৬) পুষ্পাঙ্কিত পশমী আস্তরণ (৭) একপ্রকার মূল্যবান শয্যা (৮) সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি চিত্রাঙ্কিত পশমী আস্তরণ (৯) উভয়পার্শ্বে লেশযুক্ত পশমী আস্তরণ (১০) একপ্রান্তে লেশযুক্ত পশমী বস্ত্র (১১) একপ্রকার নানারত্ন-মণ্ডিত রেশমী বস্ত্র (১২) রেশমী বস্ত্র (১৩) পশমী আস্তরণ (১৪) হস্তীর আস্তরণ (১৫) অশ্বের আস্তরণ (১৬) রথের আস্তরণ (১৭) মৃগচর্ম্ম-নির্ম্মিত কম্বল (১৮) কদলিমৃগের আস্তরণ (১৯) মূল্যবান আচ্ছাদনযুক্ত শয্যা (২০) উভয়প্রান্ত লোহিত এইরূপ উপাধান।

তচ্ছ্রবণে ভগবান্ ব্রাহ্মণকে এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন—

"হে ব্রাহ্মণ, তুমি যে সকল আসনের উল্লেখ করিলে তাহা প্রব্রজ্যা-অবলম্বনকারীদিগের অযোগ্য এবং লভ্য হইলেও তাহারা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

"কিন্তু আমার তিনপ্রকার আসন অনায়াসে অধিগম্য হইয়াছে, তাহাদের কথা তোমাদিগকে বলিব। যে তিনটী আসন মহাপুরুষগণ উচ্চাবস্থায় প্রাপ্ত হন, তাহা দিব্য, ব্রহ্ম এবং আর্য্যাসন।"

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে গৌতম, তাহাদের মধ্যে দিব্যাসন কিরূপ?"

ভগবান্ বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, কোন গ্রাম কিম্বা নগরের নিকট অবস্থান করিবার কালে আমি পূর্ব্বাহ্নে পাত্রচীর ধারণ করিয়া ভিক্ষুবেশে সেই গ্রাম কিম্বা নগরে ভিক্ষার্থ গমন করি। তথায় আহারাদির পর পুনরায় সেই বনপ্রদেশে ফিরিয়া আসি এবং অরণ্যের অনায়াসলব্ধ তৃণ কিম্বা পর্ণ একত্র করিয়া আসন প্রস্তুত করি। তৎপরে দেহকে ঋজুভাবে রক্ষা করিয়া এবং স্মৃতি জাগ্রৎ রাখিয়া তদুপরি মুক্ত-পদ্মাসনে আসীন হই। অনন্তর ধ্যানস্থ হইয়া কামাদি সর্ব্ববিধ গুণবিবর্জ্জিত বিবেকজনিত বিতর্ক ও বিচার-প্রসূত আনন্দসম্পন্ন প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হই। তৎপরে বিতর্ক এবং বিচার নিবৃত্ত হইলে অবিতর্ক অবিচারসমাধি-সমুৎপন্ন চিত্তের স্থিরতা দ্বারা অন্তরে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া আনন্দকর—দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হই। তৎপরে রাগ ও দ্বেষ উভয়কে উপেক্ষা করিয়া দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াই সেই আর্য্যগণ-কথিত আত্মপ্রসাদ-সম্ভূত উপেক্ষাযুক্ত জ্ঞানময় ও পরমসুখকর অবস্থা—তৃতীয় ধ্যান লাভ করি। তৎপর মানসিক সুখদুঃখের পূর্ব্ব হইতেই অবসান হওয়ায় উপেক্ষা-সহায়ে সর্ব্বপ্রকার শারীরিক সুখদুঃখের বোধনাশক শুদ্ধ জ্ঞানময় অবস্থা—চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হই। হে ব্রাহ্মণ, এইরূপ অবস্থা লাভ করিয়া যদি আমি পাদচারণ করি, তাহাকে দিব্যপাদচারণ কহিয়া থাকে। দণ্ডায়মান থাকিলে তাহাকে দিব্যস্থান বলে। উপবেশন

করিলে তাহাকে দিব্যাসন বলে এবং শয়ন করিলে তাহাকে দিব্য-শয়ন বলে। হে ব্রাহ্মণ, এইরূপ উচ্চ এবং মহান্ দিব্যশয্যা এবং আসন আমার অক্লেশে অধিগম্য হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে গৌতম, ইহা বাস্তবিকই অতীব আশ্চর্য্যকর! আপনি ব্যতীত এইরূপ দিব্যাসন আর কেহ লাভ করিতে সমর্থ নহে।" অতঃপর ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে গৌতম, ব্রহ্মাসন কিরূপ?"

ভগবান্ বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বের ন্যায়—গ্রাম কিম্বা নগরোপকণ্ঠে অবস্থান করিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্ন গ্রহণের পর বনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তৃণ কিম্বা পর্ণ দ্বারা আসন রচনা করিয়া তদুপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট হই। অতঃপর হৃদয়, মন মিত্রভাবে পূর্ণ করিয়া চতুর্দ্দিক এবং অধঃ ঊর্দ্ধে সেই ভাব সঞ্চারিত করি। এইরূপে বিপুল, মহান্, অপ্রমেয়, অবৈর, অব্যাপাদ (দ্বেষরহিত) ও মৈত্রীপূর্ণ চিত্তের দ্বারা সর্ব্বদিক স্পন্দিত করি।

"এইরূপে চিত্তকে করুণা, হর্ষ ও উপেক্ষা দ্বারা পূর্ণ করিয়া অধঃ, ঊর্দ্ধ চতুর্দ্দিকে সেই ভাবসকল সঞ্চারিত করিয়া দিই। এইরূপে বিপুল, মহান্, অপ্রমেয়, অবৈর, অব্যাপাদ, করুণা, হর্ষ ও উপেক্ষাপূর্ণ চিত্তের দ্বারা সর্ব্বদিক স্পন্দিত করি। তখন প্রেমপূর্ণ ও দ্বেষাদিবর্জ্জিত হইয়া বিচরণ করিলে তাহাকে ব্রহ্মপাদ-চারণ, দণ্ডায়মান থাকিলে ব্রহ্মস্থান এবং শয়ন করিলে ব্রহ্মশয়ন বলিয়া থাকে। হে ব্রাহ্মণ, এইরূপ ব্রহ্মাসন আমার অক্লেশে অধি-গম্য হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে গৌতম, ইহা অতীব আশ্চর্য্যকর! আপনি ব্যতীত আর কেহ এইরূপ ব্রহ্মাসন লাভ করিতে সমর্থ নহে। হে গৌতম, আর্য্যাসন কিরূপ?"

ভগবান্ কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তৃণ ও পর্ণ সংগ্রহ করিয়া একান্তে মুক্ত পদ্মাসনে উপবিষ্ট হই এবং দেহকে ঋজুভাবে রাখিয়া এইরূপ ধারণা করি যে, আমার রাগ, দ্বেষ ও মোহ চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছে। তাহারা দাবদগ্ধ তালবৃক্ষের ন্যায় সমূলে ধ্বংশ প্রাপ্ত

হইয়াছে; তাহারা আর পুনরায় জন্ম লাভ করিবে না—এইরূপ ধারণা করিয়া বিচরণ, দণ্ডায়মান, উপবেশন বা শয়ন করিলে তাহাকে যথাক্রমে আর্য্য বিচরণ, স্থান, আসন ও শয়ন কহিয়া থাকে। হে ব্রাহ্মণ, এইরূপ আর্য্যাসন আমার অক্লেশে অধিগম্য হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ অতীব আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "হে গৌতম, আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি! আপনি ব্যতীত কেহ এইরূপ আসন বিনা পরিশ্রমে লাভ করিতে পারে না। হে গৌতম, আপনার বাণী অতীব সুন্দর—ইহা মূঢ়কে সত্যপথ প্রদর্শন করে। আমরা আপনার এবং ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ লইলাম। অদ্য হইতে আমাদিগকে আপনার শরণাগত ভক্ত বলিয়া গ্রহণ করিবেন।"

এইরূপে ভগবানের শরণ লইযা সেই ব্রাহ্মণমণ্ডলী তাঁহাকে বন্দনাপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিলেন।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

গ্রীকদর্শন] [প্লেটো সম্প্রদায়

(শ্রীকানাইলাল পাল, এম, এ, বি, এল)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমরা ইতিপূর্ব্বেই প্লেটো-দর্শনের আলোচনায় অবগত হইয়াছি, মূল সৎপদার্থ এক এবং তিনি জ্ঞানস্বরূপ, কল্যাণস্বরূপ, সৌন্দর্য্যস্বরূপ—এই প্রতীয়মান বিশ্বজগৎ তাঁহারই প্রতিচ্ছায়া বা বিকাশমাত্র। তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় এই মূল সত্যকে কিন্তু একই ভাবে গ্রহণ করেন নাই। ফলে তিনটী অথবা কাহারও মতে পাঁচটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। আমরা জানি, অ্যাকাডেমি বিদ্যালয়ে প্লেটো শিষ্য-

দিগকে শিক্ষাদান করিতেন। সম্প্রদায়বিভাগের সহিত সেই বিদ্যালয়ের তিনটী ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদত্ত হয়, পুরাতন (Old), মধ্য (Middle) ও নূতন (New) অ্যাকাডেমি। প্লেটোর ভাগিনেয় স্পিউসিপ্পাস (Speusippus) প্রথমটীর নেতা ছিলেন। তাঁর মতে যাবতীয় পদার্থ সেই মূলপদার্থের বিকাশ বা প্রতিচ্ছায়া বটে কিন্তু সেই মূলপদার্থ কালতঃ শেষ পদার্থ। কথাটী উদাহরণসাহায্যে একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক—ভিন্ন ভিন্ন সুবর্ণ-খণ্ড ও সুবর্ণ বলয়ের মধ্যে সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, এক খণ্ড সুবর্ণ হইতে সুবর্ণবলয় সুন্দরতর পদার্থ; পরন্তু সুবর্ণবলয় সুবর্ণ হইতে প্রস্তুত হওয়ায় কালতঃ পরবর্ত্তী। সুবর্ণখণ্ড সুবর্ণবলয়ের সকল সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, কতকাংশে করে, সেই হিসাবে সুবর্ণখণ্ডকে সুবর্ণবলয়ের প্রতিচ্ছায়া বলা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, এইরূপ যুক্তির দ্বারাই স্পিউসিপ্পাসের সিদ্ধান্ত, "সৌন্দর্য্যস্বরূপ বা কল্যাণস্বরূপ যাবতীয় সুন্দর পদার্থের মূল হইলেও, কালতঃ সকলের পরবর্ত্তী" প্রতিপন্ন হয়। এরিষ্টটলের দর্শন আলোচনাকালে এই মতের ফলাফল আমরা বিশেষভাবে বুঝিতে সমর্থ হইব। স্পিউসিপ্পাসের মতে প্রকৃতির অনুকূল জীবন যাপনই সুখের একমাত্র উপায়। প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিলে, প্রকৃতির বিদ্রোহাচরণ করিলে শাস্তিভোগ অবশ্যম্ভাবী—কঠিন নির্ম্মমভাবে যথোচিত দণ্ড দিতে তিনি সর্ব্বত্র সততই বিরাজ করিতেছেন। এই 'প্রকৃতি' বলিতে কি মানুষের সহজজ্ঞান বা বিবেকবুদ্ধিকে বুঝাইতেছে না?

স্পিউসিপ্পাসের পর জেনোক্রেটিস (Xenocrates) পুরাতন অ্যাকাডেমির কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর মত পিথাগুরুর (Pythagoras) মতানুযায়ী; পরন্তু তিনি সংখ্যা ও ভাবপদার্থকে অভিন্ন মনে করিতেন—এটী প্লেটোর শিক্ষার ফল, সেকথা বলাই বাহুল্য। মূল 'এক' সংখ্যা হইতেই 'অসংখ্য' সংখ্যার উৎপত্তি হয়। 'একে'র পুনরুক্তিই 'দুই'য়ের সৃষ্টি করে। 'এক'কে বাদ

মিলে 'দুই'য়ের অস্তিত্বই নাই।—এবম্বিধ যুক্তির সাহায্যে তাঁহার মত কতকটা বুঝা যায়। পিথাগুরুর মতে পদার্থের সহিত 'সংখ্যার' অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ উহা ইতিপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। সে কথা এস্থলে মনে রাখিলে জেনোক্রেটিসের মত সহজেই বুঝা যাইবে। এস্থলে আমরা সে বিষয়ে অধিক কথার অবতারণা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তাঁর মতে ধর্ম্মজ্ঞানলাভ ও ধর্ম্মানুচরণশক্তি বিনা, মানব কখনও সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না।

জেনোক্রেটিসের পর হেরাক্লাইডাস (Heraclides) পুরাতন অ্যাকাডেমির শিক্ষা ভার প্রাপ্ত হন। তিনি জ্যোতিষবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার দার্শনিক চিন্তার ফলে নূতন কোন তথ্য প্রচার হওয়ার কথা আমরা অবগত নহি। সকলেই প্রত্যক্ষ করেন, সূর্য্য পূর্ব্বে উদিত হয় পশ্চিমে অস্ত যায়—কিন্তু সূর্য্য স্থির রহিয়াছে, পৃথিবীই আপনার মেরুদণ্ডের উপর বিপরীত দিকে ঘুরিতেছে—এই বৈজ্ঞানিক সত্যসিদ্ধান্তে বহুকাল পূর্ব্বে উপনীত হইয়া হেরাক্লাইডিস চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

পুরাতন অ্যাকাডেমির শিক্ষাগুরুর মধ্যে ফিলিপ (Philip), হারমোডোরাস (Hermodorus), পলিমো (Polemo), ক্রটার (Crautor), ও ক্রেটীসের (Crates) নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা নূতন কোন মত প্রচার করেন নাই—প্লেটোর দার্শনিক মতের বিস্তার করাই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল।

মধ্য সম্প্রদায়ের (Middle Academy) অন্তর্গত আবার দুটী শাখা সম্প্রদায়ের উল্লেখ শুনা যায়। একটীর নেতা আরসেসিলাস (Arcesilas) (৩১৫—২৪১ খৃঃ পূঃ), এবং কারনিডিস (Carneades) (২১৪-১২৯ খৃঃ পূঃ) অপর সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। এই সম্প্রদায়ের নূতন কোন মতামত স্থাপন করা উদ্দেশ্য ছিল না—প্লেটোর দার্শনিক মতামতের বিচার ও সন্দেহ উত্থাপন করাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। ফলে সন্দেহবাদের উদয় হইয়াছিল।

নূতন সম্প্রদায়ের (New Academy) অন্তর্গতও দুটী শাখা সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। প্রথমটীর স্থাপয়িতা ফিলো (Philo) নীতিশাস্ত্রের অনুশীলনে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। আমাদের মনে হয় ষ্টোয়িক (Stoic) সম্প্রদায়ের ভিত্তিস্থাপনের সূচনা তিনিই করিয়া যান। ফিলোর পরে তাঁহার শিষ্য এণ্টিয়োকাস (Antiochus) দ্বিতীয় শাখা স্থাপন করেন। ষ্টোয়িক সম্প্রদায়ের মত প্লেটো-দর্শনের অন্তর্ভূত—এই কথা প্রমাণ করাই তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। ষ্টোয়িক সম্প্রদায়ের মতামত আলোচনা কালে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ প্রদানে প্রয়াসী হইব। অতঃপর এরিষ্টটলের দর্শনালোচনায় অগ্রসর হওয়া যাউক।

এরিষ্টটল।

কোন দার্শনিকের মতামত আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার জীবনী ও তৎপ্রণীত গ্রন্থের সাহায্যে সেই কার্য্যে অগ্রসর হওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া, আমরা এস্থলে প্রথমে ঐ দুইটী বিষয়ে অল্পবিস্তর কথার অবতারণা করিতে প্রয়াসী হইলাম।

থ্রেস (Thrace) দেশে ষ্ট্যাগিরা (Stagira or Stageira) নগরে আন্দাজ ৩৮৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে দর্শনশাস্ত্রের স্থাপয়িতা মহামতি এরিষ্টটল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ও পূর্ব্বপুরুষগণ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ আছে। আন্দাজ ৩৬৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি দার্শনিক গুরু প্লেটোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও প্রায় বিশ বৎসর কাল যাবৎ তদধীনে শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষালাভ কালে স্বীয় গুরুর সহিত কোন কোন বিষয়ে তাঁহার মতানৈক্য ঘটিলেও উভয়ের মধ্যে প্রীতির সূত্র কোন দিন বিচ্ছিন্ন হয় নাই, এবং তদ্বিরুদ্ধে যে সকল উপকথা শুনা যায় তাহা অযৌক্তিক বলিয়া পরিত্যাজ্য। এ স্থলে সে বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

গুরুর অন্তর্দ্ধানের পর জেনোক্রেটিসের সহিত তিনি সিসিয়া দেশের অন্তর্গত আটার্নিয়াস (Atarneus) ও আসন (Ason) দেশের

রাজা হারমিয়াসের রাজদরবারে গমন করেন। সেখানে তিন বৎসর কাল অবস্থান করিয়া মিটিলিনে (Mytylene) ও পরে ম্যাসিডোনিয়ার (Macedonia) রাজা ফিলিপের (Philip) রাজদরবারে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি প্রায় সাত বৎসর বাস করেন, এবং তৎকালে অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শবর্ষের শিক্ষার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। আলেকজান্দারের রাজ্যাভিষেকের পর এরিষ্টটল এথেন্সে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও লিসিয়ামে (Lyceum) বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

এস্থলে মনে রাখা দরকার, প্লেটোর 'ভাবজগৎ' প্রথমে এরিষ্টটলের নিকট একটী কল্পিত জগৎ বলিয়া মনে হইয়াছিল। বাস্তবজগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া প্রথমে তিনি একপ্রকার দুষ্কর মনে করিয়াছিলেন; এবং আলেকজান্দারের পক্ষে ভাবপদার্থের চিন্তা বা ভাবজগতের পর্য্যালোচনা অপেক্ষা কার্য্যকরী-বিদ্যা সমধিক আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আলেকজান্দারকে তদনুরূপ শিক্ষাপ্রদান করেন। লিসিয়ামে নিজ শিষ্যদিগকে কিন্তু একইরূপে শিক্ষা দিতেন না। প্রাচীন ঋষিরা বনে তপস্যা করিতেন—শিষ্যগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। জনসমাকীর্ণ মানবসমাজের কোলাহল হইতে দূরে থাকাই তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল। কারণ, নিভৃত নির্জ্জন স্থান তপস্যা বা বিদ্যার্জ্জনের বিশেষ অনুকূল। পাশ্চাত্য দার্শনিক গুরু মহামতি এরিষ্টটলের পক্ষেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বনরাজিশোভিত লিসিয়ামে এরিষ্টটল পাদচারণ করিতে করিতে মার্জ্জিতবুদ্ধি অন্তরঙ্গ শিষ্যকে দর্শন-বিজ্ঞানের গূঢ় উপদেশ প্রদান করিতেন, আর যাহাদের বুদ্ধি সেরূপ বিশুদ্ধি লাভ করে নাই, তাহাদিগকে একত্রে একস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক শিক্ষা দিতেন। এই কথা মনে হইলে সেই হিন্দু, প্রাচীন ঋষিবর্গের কথাই স্মরণ হয়।

রাজা ফিলিপ ও তৎপরে আলেকজান্দারের সহায়তা তাঁহার

দার্শনিক চিন্তার বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল, সে কথা সহজেই বুঝা যায়। শুধু তাহাই নহে, রাজা হারমিয়াসও তাঁহার দর্শনালোচনার বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। হারমিয়াসের নিকট এবিষয়ে তিনি যে বিশেষ ঋণী ছিলেন, সেটী তদুদ্দেশ্যে প্রশংসাবাদক কবিতা হইতে বেশ বুঝা যায়। এই প্রশংসাবাদক কবিতাই প্রকারান্তরে তাঁহার অপবাদের কারণ হইয়াছিল। হারমিয়াসকে দেবতা বলিয়া প্রতিপন্ন করাই সেই কবিতার উদ্দেশ্য—এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া দেশের লোকে তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করেন—ফলে তাঁহাকে এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে হারমিয়াসকে দেবতা বলিয়া প্রতিপন্ন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি ধর্ম্মের গুণগান করিয়াছিলেন এবং পারসিকদিগের হস্তে অকারণ ধর্ম্মের জন্য নিগৃহীত ও নিহত হওয়ায় হারমিয়াসকে ধর্ম্মের জন্য জীবনোৎসর্গী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া কলসিস (Chalchis) গমন করেন এবং আন্দাজ ৩২৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি বিষপানে জীবন ত্যাগ করেন কিন্তু সে বিষয়ে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পিতামাতার দোষগুণ পুত্রে কতক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, এটী আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত বাক্য। শুধু তাহাই নহে, পুত্রের জীবনগঠনে পিতামাতা সমধিক দায়ী—তাহার চিন্তার গতিও তাঁহাদেরই দ্বারাই অনেকাংশে নিয়মিত হয়। সেই জন্য চিকিৎসাব্যবসায়ীর পুত্র হওয়ায় প্রত্যেক বিষয় পরীক্ষা দ্বারা অনুভব করিবার স্বাভাবিক বুদ্ধি এরিষ্টটলের জন্মিয়াছিল। এই স্থলে প্লেটোর সহিত এরিটলের পার্থক্যের কারণ প্রণিধানযোগ্য। বাহ্যজগৎ হইতে অন্তর্জগতে উপনীত হওয়া উভয়েরই মূল উদ্দেশ্য হইলেও, এরিষ্টটল সেই বাহ্যজগতের ব্যাপার পরীক্ষা ও অনুসন্ধান দ্বারা তৎমূলে সত্যলাভের প্রয়াসী ছিলেন। প্লেটোর নিকট বাহ্যজগৎ যেন একটী প্রকাণ্ড ছায়া বলিয়া প্রতিভাত হইত। তিনি যেন সেই মূল সত্যকে

প্রত্যক্ষ করিয়া জগতের ব্যাপারকে সামান্য জ্ঞানে—তার বিশেষ পরীক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। গগনস্পর্শী মন্দিরের চূড়ার সহিত মন্দিরের যে সম্বন্ধ প্লেটোদর্শনের সহিত এরিষ্টটলেরও সেই সম্বন্ধ বলিলে বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না। প্লেটোর দর্শনে কি জ্ঞান, কি কর্ম্ম, কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি সকলের মূল এক। সেই মূল সত্যকে যে ভাবেই উপলব্ধি কর না কেন তাহা এক ভিন্ন দুই নয়—মন্দিরের চূড়ার ন্যায় বিন্দুতে গিয়া সব অবসান। এক একটী প্রস্তরের সংযোগে কেমন করিয়া সেই সুমহান্ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি—এই সকল বিশদ বিবরণ প্লেটো প্রদান করেন নাই। সে সংবাদ জানিতে হইলে এরিষ্টটলের আশ্রয় লইতে হইবে। এই বিশ্বজগতের রচনাবৈচিত্র্যের বিশেষভাবে অনুসন্ধান পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ করিয়াছিলেন কি না জানি না। কিন্তু এরূপ সুন্দরভাবে আর কেহ যে প্রয়াস করেন নাই, সে কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। দার্শনিক আলোচনার পথপ্রদর্শক সক্রেটীস যে সত্যের আলোক জ্ঞানিজনসমক্ষে প্রদর্শন করেন, সেই আলোকের সাহায্যে প্লেটো সত্য দর্শন করেন। এরিষ্টটল আবার তাহারই সাহায্যে সেই পথের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। পাশ্চাত্য জগতের আদি দার্শনিক—সক্রেটীস, দার্শনিক গুরু—প্লেটো, দর্শন শাস্ত্রের স্থাপন কর্ত্তা—এরিষ্টটল। অতঃপর আমরা এরিষ্টটলের গ্রন্থাবলীর মোটামুটি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

এথেন্সে প্লেটোর নিকট শিক্ষালাভ কালে এরিষ্টটল কথোপকথন আকারে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ইউডিমাস (Eudemus) পুস্তকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিসিলিতে ডাইয়োনিসাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে প্লেটোশিষ্য ইউডিমাস ৩৫৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে নিহত হন। তাঁহারই নামে পুস্তকখানি উৎসর্গীকৃত হয়। ঐ পুস্তকে আত্মার অবিনাশিতাসম্বন্ধে নানাবিধ যুক্তি দেখা যায়। ঐ পুস্তকখানিকে প্লেটো-রচিত ফিডোগ্রন্থের এক পর্য্যায়ভুক্ত

বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাউক সে কথা,এরিষ্টটলের গ্রন্থাবলী মোটামুটি দুইভাগে বিভাগ করা যায়, যথা—গূঢ়বিদ্যা বা তত্ত্বকথা প্রকাশক পুস্তকগুলি এক শ্রেণীভুক্ত ও বাহ্যজগৎ বিষয়ক পুস্তকগুলি অপর শ্রেণীভুক্ত। আমাদের মনে হয়, প্রথমটী বিশেষতঃ মার্জ্জিতবুদ্ধি অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের জন্যই রচিত হইয়াছিল—অপরটী সাধারণের জন্য। ঐ সকল পুস্তকের অধিকাংশই ম্যাসিডোনিয়া হইতে এথেন্সে প্রত্যাবর্ত্তনের পর রচিত হয়। গ্রন্থে আলোচিত বিষয় অনুসারে তাঁহার গ্রন্থাবলীকে চারিভাগে বিভাগ করা হয় :—(১) ন্যায়শাস্ত্র (Logic), (২) নীতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র (Ethics), (৩) পদার্থবিদ্যা (Physics) ও (৪) পরমার্থ বা তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics)। ন্যায়শাস্ত্রকে Organon নাম দেওয়া হয়। পরমার্থবিদ্যা মূল বা আদি পদার্থের আলোচনায় ব্যাপৃত, তাই বুঝি তাহার নাম দেওয়া হয় First Philosophy বা প্রথম দর্শন। প্রকৃতি, বাহ্যজগৎ বা পদার্থবিষয়ক আলোচনা যে সকল পুস্তকে স্থান পাইয়াছে তাহাদিগকে পদার্থবিজ্ঞান (Physics) বা প্রাণিগণের ইতিহাস (Natural history of Animals) আখ্যা দেওয়া হয়। মনোবিজ্ঞানসম্বন্ধে যে সকল পুস্তক তিনি লিখিয়াছিলেন, সেগুলিকে পরমার্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়াই সঙ্গত। নীতিশাস্ত্রে তিনি প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে প্রয়াসী ছিলেন এবং তিন খণ্ডে এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন—Nicomachean Ethics, Eudemean Ethics এবং Magna moralia। পলিটিকস্ (Politics) পুস্তকে রাষ্ট্র ব্যাপার ও রাজনীতির ব্যাপার আলোচিত হইয়াছে। Rhetoric ও Poetic পুস্তকে কলা ও সৌন্দর্য্যবিদ্যার আলোচনা দেখা যায়।

আমরা চারিভাগে এরিষ্টটলের গ্রন্থাবলী বিভাগের কথা উল্লেখ করিলাম কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক তিন ভাগে তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী বিভাগ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথম ভাগে পরমার্থবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা বা জ্ঞানকথা, দ্বিতীয় ভাগে নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব বা কর্ম্মকথা ও

শেষভাগে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলিকে সন্নিবেশিত করেন। এইরূপ বিভাগের ফলে অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যাকে তাঁহারা প্রথম-শ্রেণীভুক্ত এবং ধর্ম্মনীতি (Ethics) ও রাজনীতিকে (Politics) এক শ্রেণীভুক্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

Categories, De interpretatione, Analytics ও Topics পুস্তকগুলি ন্যায়শাস্ত্রের অন্তর্গত। এইখানে মনে রাখা আবশ্যক এরিষ্টটলকে ন্যায়শাস্ত্রের আদি গুরু বলা হয়। ক হয় খ হইবে, নয় খ হইবে না—এই দুইটী বিপরীতের মধ্যে ক একটীর সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকা চাই—ন্যায়ের এই মূল সূত্র তিনিই আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

Physics, De cœlo, De generatione et corruptione, the Meteorology, De anima, Parva naturalia, History of Animals, On the Parts of Animals, On the Progression of Animals, On the Generation of Animals পুস্তকগুলিকে পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত করা হয়। মোট কথা খৃঃ পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যাবতীয় পদার্থের জ্ঞানলাভের উপযোগী সকল বিদ্যাই এরিষ্টটল অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফল পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

ধর্ম্ম ও মোক্ষ।

(ব্রহ্মচারী সাধুচৈতন্য)

জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মই কোন না কোন আদর্শবিশেষ লইয়া গঠিত। ইজিপসিয়ানদের ধর্ম্ম—মৃত্যুর পর জীবাত্মার অস্তিত্ব শব-দেহের স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে—এই স্থির বিশ্বাস লইয়া। পারসিকদের ধর্ম্ম সৎ এবং অসতের দ্বন্দ্ব লইয়া, খৃষ্টানধর্ম্ম সর্ব্বমঙ্গলময়ী ভালবাসা লইয়া এবং হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বৈরাগ্য ও মোক্ষ-লাভ লইয়া গঠিত। হিন্দুধর্ম্ম যেরূপ মহান্ আদর্শের বিষয়ে উপদেশ দেয় তাহা জগতের অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। সে অবস্থায় জাগতিক সম্বন্ধের কথা কি, দ্বৈত, অদ্বৈত আমি তুমি, সকল ভাবের লয় হইয়া যায়—যাহাকে ইহা নয়, ইহা নয় বলিয়াও বর্ণনা করা যায় না—উহা এক অনির্ব্বচনীয় স্বাধীনতা, যাহা আপেক্ষিক ভাষা বর্ণনা করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। এই অবস্থা-লাভের একমাত্র উপায় আত্যন্তিক ত্যাগ বা আমিত্বের সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন।

হিন্দুধর্ম্ম এইরূপ ত্যাগমূলক বলিয়াই শত শত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াও এখনও জীবিত এবং জগতের কল্যাণসাধনে সমর্থ। উক্ত কারণেই উহা বিবিধ ধর্ম্মবিপ্লবকারী মহা প্লাবনসমূহ প্রতিহত করিয়া এখনও পূর্ব্বগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং ঐ সকল ঘাতপ্রতিঘাতের যুগে নিজ অভ্যন্তরীণ আশ্চর্য্য শক্তির পরিচায়ক যুগপ্রবর্ত্তনকারী শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় মহাপুরুষগণের জন্ম দান করিয়াছে। শুধু ইহা নহে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ—ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অন্য অন্য আদর্শসমূহকে নিজ অঙ্গীভূত করিয়া লইবার ক্ষমতা থাকায় ঐ সকল ধর্ম্মের সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের এই বিচিত্র লীলা যেন আবহমানকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ আমাদের সম্মুখে পূর্ব্বাপেক্ষা

বৃহৎ তরঙ্গসঙ্কুল আর একটী মহাপ্লাবন, ভূভাগের প্রায় অর্দ্ধাংশ নিমজ্জিত করিবার স্পর্দ্ধা লইয়া উপস্থিত—অভিপ্রায়, হিন্দু-মহীরুহ সমূলে উৎপাটিত করিয়া নিজ সলিললীন করিয়া লয়। এরূপ মহাপ্লাবন হিন্দুধর্ম্মমূলে কখনও আঘাত করিয়াছে কিনা সন্দেহ। উহাতে হিন্দুধর্ম্ম যেন একটু বিচলিতও হইয়া পড়িয়াছে—উহা ফেনশীর্ষ আধুনিক খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্য সভ্যতা। উহা যেন বলিতে চাহে, হে হিন্দুগণ, তোমাদের ত্যাগমূলক সভ্যতাই যদি শ্রেষ্ঠ, তবে তোমাদের দেশ এত দীনহীন কাঙ্গালের বাসস্থান কেন? তোমরা জাতিসমাজে এত হেয় কেন? ব্যাপকত্বই যদি শক্তিমত্তার পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে তোমাদের সে ব্যাপকত্বই বা কোথায়? যে ধর্ম্ম বা সভ্যতা ইহজগতেই জীবকে সুখের অধিকারী করিতে পারে না, তাহার পরজগতে জীবকে সুখী করিবার সামর্থ্য কোথায়? অতএব তোমরা এতদিন যাহাকে জীবনসমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসারূপে বিশ্বাসপূর্ব্বক ধরিয়া আছ, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, উহা অন্ধবিশ্বাস। আমাদের ভোগমূলক সভ্যতার অনুসরণ কর—এ জীবনে সুখভোগ কর, পর জীবন আছে কি না সন্দেহ, সুতরাং তাহার চিন্তা ত্যাগ কর। দেখ, পৃথিবীর যে প্রদেশ আমাদের সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছে তাহারা কিরূপ উন্নতিশীল, তাহারাই ত একরূপ সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। তোমরা এখনও আমাদের অনুসরণ কর, তোমাদিগকেও আমরা সহভোগী করিয়া লইব।

এই ত গেল বাহিরের আহ্বান। আমাদের সমাজশরীর এবং উহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি সুস্থ হইত সবল, তাহা হইলে ইহাতে আশঙ্কিত হইবার কোন কারণই থাকিত না। কিন্তু আমরা সকলেই ত সবল, সুস্থ নই। যদি একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব আমাদের মধ্যে অনেকে, তাহারা সমষ্টির তুলনায় অল্পসংখ্যক হইলেও, পাশ্চাত্য মোহে ভুলিয়াছে, পাশ্চাত্য মতে জীবন সমস্যার

মীমাংসা করিতে চায়। শুধু তাহাই নহে, তাহারা আবার ভোগমূলক মীমাংসা প্রচারে প্রয়াসী। ইহাদের প্রাদুর্ভাবই হিন্দুধর্ম্মকে কথঞ্চিৎ বিচলিত করিয়াছে। তাহা না হইলে শঙ্কিত হইবার কোন কারণই থাকিত না।

শঙ্কিত হইয়া চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। শরীর নিরাময় করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সবল ও দৃঢ় করিতে হইবে। কিন্তু উহা করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে, ত্যাগীর সমাজে এই ভোগেচ্ছারূপ ব্যাধিবীজ কোথা হইতে আসিল এবং কোথায়ই বা উহা উপ্ত রহিয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, শরীর যদি সবল থাকে তাহা হইলে বাহির হইতে আগত কোন ব্যাধিবীজই কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না বরং উহা নিজেই নষ্ট হইয়া যায়। শরীর যদি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তাহা হইলেই নানারূপ ব্যাধি প্রাদুর্ভূত হয়। সেইজন্য কোন ব্যাধি দূর করিবার পূর্ব্বে শরীরের যেস্থান দুষ্ট হইলে উক্ত ব্যাধির সম্ভাবনা, তৎস্থানের চিকিৎসা করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ কর্ত্তব্য, সমাজ জীবনেও সেইরূপ করা উচিত। অতএব হিন্দুধর্ম্মশরীর ব্যাধিমুক্ত করিতে হইলে, বাহিরের কোন কারণের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া, শরীরের প্রতিই প্রথম লক্ষ্য করিতে হইবে। দেখিতে হইবে কোন্ স্থান দূষিত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি হিন্দুগণ সকলেই সেই শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য ও ত্যাগের অনুশীলন করিয়া আসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে এ ভোগেচ্ছা কিরূপে সম্ভবপর? কারণ, যে সমাজ বা জাতি যত উচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিবে, সেই সমাজ বা জাতি তত উন্নতিশীলই হইবে। বাস্তবিক ইহা খুব সত্য কথা। কিন্তু আদর্শে পৌঁছিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। যাঁহারা ভুল পথ অনুসরণ করিবেন তাঁহারা উদ্দেশ্যে পৌঁছাইতে না পারিয়া আদর্শ সম্বন্ধে সন্দিহান এবং ভোগপরায়ণ হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? কোন স্থানে যাইবার যেমন বিভিন্ন পথ থাকে, তাহার মধ্যে

কোনটী বা সোজা কিন্তু বিপদসঙ্কুল, কোনটী বা বক্র এবং সময়-সাপেক্ষ কিন্তু নিরাপদ্। যিনি বিপদের ভয় করেন না বা সমর্থ তিনি সোজা পথের, আর যিনি অপারগ তিনি বক্র পথটীর অনুসরণ করেন। তেমনি উক্ত আদর্শে পৌঁছিবারও ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে, উহাদিগকে প্রধান দুইটী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যথা, সন্ন্যাসধর্ম্ম ও গার্হস্থধর্ম্ম। যাঁহার যেরূপ সামর্থ্য বা সংস্কার তাঁহার সেইরূপ পথ অবলম্বন করা উচিত। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই ভুলপথ অনুসরণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে হয়। সেইজন্যই আমাদের শাস্ত্রসমূহ সংস্কার বা অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পথের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই অধিকারীবাদ হিন্দুধর্ম্মের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই উহা অপর ধর্ম্মমতসমূহের উপর অপরাপর ধর্ম্ম অপেক্ষা উদার ভাবাপন্ন এবং সেইজন্যই হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এত শাখা প্রশাখা সমূহের উদ্ভব হইয়াছে।

উক্ত সাধারণ ব্যবস্থা অনুসৃত হয় না বলিয়া আজকাল হিন্দু-সমাজের সকলের মধ্যেই একটা ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, মোক্ষ শুধু সন্ন্যাস ধর্ম্মেই লভ্য অপর ধর্ম্ম অবলম্বনে উহাত লাভ হয় না, বড় জোর উহা সন্ন্যাসধর্ম্ম আচরণ করিবার উপযুক্ত করিয়া দিতে পারে মাত্র। এই ধারণায় মোক্ষলাভেচ্ছু হিন্দুগণ স্ব স্ব সামর্থ্য না বুঝিয়াই সেই সর্ব্বত্যাগমূলক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনে অগ্রসর হইতেছে—যে আশ্রম ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করে না, সংসার, তোমার আমার অস্তিত্ব আছে কিনা দেখে না, যাহা জাগতিক সুখ দুঃখের মধ্যে সংসারের বিপদ্ আপদের মধ্যে সেই বিভু পরমেশ্বরের অস্তিত্ব দেখিতে চায় না। উহা চায় তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে, নিজের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার নির্গুণভাব অনুভব করিতে, সর্ব্বশেষে নিজেকেই তৎস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করিতে। আমরা সকলেই এই একই পথ ধরিয়া লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য ছুটিয়াছি বলিয়াই সফল হইতে পারিতেছি না এবং লক্ষ্যকে এক খেয়াল বলিয়া ধারণা করিয়া যাহা আপাতমনোরম তাহার অনুশীলনে রত হইতেছি এবং ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ হইয়া

এক প্রকার ধর্ম্মভ্রষ্ট, অবিশ্বাসী ও নাস্তিক সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া পড়িতেছি। এই অসফলতার জন্যই ভোগভিত্তিমূলক ধর্ম্ম, যাহার আদর্শ পাশ্চাত্য সভ্যতা, আজকাল আমাদের মধ্যে স্থান পাইতেছে।

প্রাচীন যুগ হইতে আমাদের ধর্ম্মেতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, শাস্ত্রসমূহে প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ তৎপরে সন্ন্যাসের উপদেশ আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী আশ্রমের পর সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনীয়। শাস্ত্রের স্থানে স্থানে যে প্রথমেই সন্ন্যাস অবলম্বনীয় বলিয়া উক্ত আছে, উহা উৎকৃষ্ট অধিকারীর পক্ষেই প্রযোজ্য। যদি হিন্দুদিগের চিন্তারাশির ভাণ্ডার স্বরূপ শাস্ত্রে এইরূপ ধারা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে আমরা এই একমাত্র সন্ন্যাসপ্রবৃত্তি কোথা হইতে পাইলাম? নিশ্চয়ই মোক্ষার্থী হিন্দুদিগের সম্মুখে কোন না কোন যুগে সন্ন্যাসপথের উজ্জ্বল আদর্শ ধৃত হইয়াছিল।

আমরা যদি সেই যুগের পরিচয় লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে বৌদ্ধযুগে যাইতে হইবে। ভগবান্ বুদ্ধ উদার হৃদয়ের প্রেরণায় জীবদুঃখে কাতর হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক জ্ঞান লাভান্তর স্ত্রীপুরুষ সকলকেই প্রব্রজ্যা দান করেন। তাঁহার দানে হৃদয় ছিল। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তিগণ খঞ্জমেধ শাবককে স্কন্ধে লইয়া যাওয়ারূপ হৃদয়বত্তা গ্রহণে অক্ষম হন—তাঁহারা শুধু হৃদয়হীন সন্ন্যাসেরই ঘোষণা করিয়া যান। তাঁহাদের পশ্চাতে নবার্জ্জিত সত্যের শক্তি থাকায় তাঁহারা নিজেদের মতবাদ প্রচার এবং প্রব্রজ্যাগ্রহণই সত্যলাভের একমাত্র উপায় ইহা সমাজমনে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিতে সমর্থ হন। এইরূপে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক সন্ন্যাস গ্রহণ করে। সেই সময় হইতেই অন্যান্য আশ্রমধর্ম্মসমূহ অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

সন্ন্যাস আশ্রমের এইরূপ প্রশংসা যে কুফল আনয়ন করিবে তাহা তৎকালীন বিজ্ঞব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং যাহাতে এই ভাব প্রাধান্য লাভ না করিতে পারে তদ্বিষয়ে মনোযোগীও হইয়াছিলেন।

কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই এই ধারা প্রতিহত করিতে পারেন নাই। সেইজন্য আজও আমাদিগকে তাহার ফলভোগ করিতে হইতেছে।

সর্ব্বপ্রথম রাজা অশোক এই প্রবৃত্তিতে আশঙ্কিত হইয়া "ধর্ম্ম" নাম দিয়া শ্রীবুদ্ধের মহান্ হৃদয়ের প্রচার ও সকলকে স্ব স্ব ধর্ম্মনিষ্ঠ করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু তিনি ইহাতে সফল হইলেনই না বরং তাঁহার এই সদুউদ্দেশ্য বৌদ্ধধর্ম্মজগতে অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়া দিল। ইহার ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনযান, মহাযান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সুযোগ উপস্থাপিত করিয়া দিল—এমন কি, শেষে উহা জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতেই বিতাড়িত হইল। তৎপরে আচার্য্য শ্রীশঙ্কর এই স্রোতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তিনি ইহা প্রচার করিলেন যে, সন্ন্যাস আশ্রম সকলের পক্ষে নয়, উহা যাঁহারা বর্ণাশ্রমের শীর্ষে অবস্থিত সেই সংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের জন্য। তিনি উহার বিস্তার সীমাবদ্ধ করিয়া দিলেন বটে কিন্তু আপামর সাধারণের জন্য এই জীবনেই মোক্ষ লাভের পথ নির্দ্দেশ করিয়া না দেওয়ায় তিনিও সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিছুকাল পরে ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত অপর সকলে অন্য কোন পথ দেখিতে না পাইয়ায় সেই পুরাতন প্রথারই অনুগমন করিতে লাগিল। এইরূপ পর পর আচার্য্য এবং অবতারকল্প মহাপুরুষ-গণ নানা উপায়ে ইহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু প্রায় সকলেরই চেষ্টা শ্রীশঙ্করের ন্যায় একদেশী হওয়ায় তাঁহারা সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। যেমন, উদারহৃদয় শ্রীরামানুজ জাতিবর্ণনির্ব্বি-শেষে সকলকেই নিজধর্ম্মে প্রবেশাধিকার দান করিলেন বটে, কিন্তু নিজ মতই মোক্ষলাভের প্রধান উপায়, ইহা ঘোষণা করায় তিনিও একদেশিত্ব দোষদুষ্ট হইয়া পড়েন।

বৌদ্ধযুগ হইতে এই ধারা চলিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে হিন্দুধর্ম্মকে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার সহিত সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইলেও উহা ঐ সকল সভ্যতা প্রতিহত করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ আমাদের সম্মুখে যে সঙ্কটমুহূর্ত্ত উপস্থিত, উহাতে উত্তীর্ণ হইতে

হইলে ভুলপথ অনুসরণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে চলিবে না। আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে হইবে এবং জীবনসমস্যার আমাদের মীমাংসাই যে শ্রেষ্ঠ, ইহা অনুভব করিয়া অপরকে সেই পথ প্রদর্শন ও উহার প্রচার করিতে হইবে। তবেই আমরা ভোগভিত্তি পাশ্চাত্য প্রলোভন প্রতিরোধ করিতে পারিব।

আমরা দেখিয়াছি, সকলেই এক সন্ন্যাসধৰ্ম্ম অবলম্বনে উদ্দেশ্যে পৌঁছিবার চেষ্টা করাতেই আমাদের মধ্যে অনেকেই অকৃতকাৰ্য্য এবং উদ্দেশ্যসম্বন্ধে সন্দিহান এবং কুপথগামী হইতেছে। অতএব দেখিতে হইবে, অন্য কোন উপায়ে উহা লাভ হয় কিনা। আমাদের প্রায় সকলেই গৃহস্থ—দেখিতে হইবে এই গৃহস্থধৰ্ম্ম আচরণেও তথায় পৌঁছান যায় কিনা।

আমরা হিন্দু, আমরা শাস্ত্রপ্রমাণ বিশ্বাস করি—কারণ শাস্ত্রসমূহই উপলব্ধ সত্যসকলের ভাণ্ডার। অতএব শাস্ত্র যদি ঐ মতের পোষণ করে, তবেই আমরা উহা গ্রহণ করিতে পারি। আমরা যদি শাস্ত্রসমূহ আলোচনা করি, দেখিতে পাইব, উহা বলিতেছে, যিনিই স্বধৰ্ম্মপরায়ণ তিনিই মোক্ষলাভ করিবেন। অর্থাৎ যিনি যে ধৰ্ম্মের, সন্ন্যাস বা গার্হস্থ্য, যে অবস্থায় আছেন তদবস্থার ধৰ্ম্ম নিষ্ঠাসহকারে পালন করিলেই মোক্ষ লাভ করিবেন। একজন মহাপুরুষও উক্ত সত্য উপলব্ধি করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—এমন কি, সামান্য মেথরও যদি নিজধৰ্ম্ম নিষ্ঠাসহকারে পালন করে, সেও সেই পরম সত্য উপলব্ধি করিবে। মহাভারতে বনপর্ব্বে বর্ণিত সেই স্বধৰ্ম্মনিষ্ঠ ধৰ্ম্মব্যাধের কথা মনে করুন। তিনি কি নিজধৰ্ম্ম পালন করিয়া সন্ন্যাসিযুবক অপেক্ষা উচ্চাবস্থা লাভ করেন নাই? ত্যাগই যখন মোক্ষলাভের প্রধান অবলম্বন—উহা কি গার্হস্থ্য আশ্রমে সম্ভবপর নয়? উহা শুধু সন্ন্যাসীর নিজস্ব বস্তু নয়—উহা সকল আশ্রমের, সকল অবস্থার, সকল লোকেরই। আর সন্ন্যাসজীবনের যেমন, গার্হস্থ্যজীবনেরও তেমনি ভিত্তি ত্যাগের উপরই স্থাপিত। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বর্ণিত কৰ্ম্মযোগের সেই পক্ষিপরিবারের কথা

স্মরণ করুন। অতিথিসেবার্থ নিজেদের শরীর পর্য্যন্ত দান—এইরূপ ত্যাগ সন্ন্যাসীর ত্যাগের ন্যায় কি মহিমময় নয়? এইরূপ ত্যাগ যদি সন্ন্যাস আশ্রম ব্যতীত অপর আশ্রমেও সম্ভব হয়, তাহা হইলে কে বলিবে যে তদ্ধর্ম্ম আচরণে মোক্ষ লাভ হইবে না? আর ইহাও সত্য যে, সৎ গৃহস্থের গৃহেই আদর্শ সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করেন। অতএব আমাদের সকলেরই শাস্ত্র ও মহাপুরুষের বাণীর অনুসরণ করিয়া স্ব স্ব ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়া শ্রেয়লাভে অগ্রসর হওয়াই উচিৎ। আর যাঁহারা প্রেবেশার্থী তাঁহাদেরও নিজ সামর্থ্য বিচার করিয়া মার্গবিশেষ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যদি নিজ বুদ্ধির উপর বিশ্বাস না হয়; তাহা হইলে সংস্কারদর্শী সৎগুরুর পরামর্শে নিজ জীবন নিয়মিত করাই শ্রেয়ঃ। যিনি যে আশ্রমের যে অবস্থায় আছেন, তাদৃশাবস্থার ধর্ম্ম পালন করিলে যেমন তাঁহার শ্রেয়োলাভ সুগম হইবে, অপর দিকে আদর্শে উপনীত হওয়ায় উহার শ্রেষ্ঠত্ব অনুভবে পাশ্চাত্য প্রলোভন হইতে আপনাদিগকে এবং পক্ষান্তরে হিন্দুধর্ম্মকেও রক্ষা করা সম্ভব হইবে।

তত্ত্বজ্ঞান।

(চীন দেশীয় প্রসিদ্ধ তত্ত্ববিদ্ চুয়াং-ঝ্যুর উপদেশাবলী হইতে।)

(শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত)

একদা শিশনের সাধু আই লিয়াও ম্বদেশের অধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের বিমর্ষ ভাব অবলোকন করিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্নে সম্রাট্ নিম্নলিখিতরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন,—

“মহাশয়! আমি প্রাচীন সাধু-মহাত্মাদের উপদেশাবলী বিশেষভাবে পাঠ করিয়াছি। ধর্ম্মের উপর আমার শ্রদ্ধার অভাব নাই।

সতের—শ্রেয়ের সম্মান কি করিয়া করিতে হয়, বিশেষভাবেই জানি এবং করিয়াও থাকি। কর্ত্তব্য কর্ম্মে আমার তিলমাত্র শৈথিল্য নাই। এই সকল অনুষ্ঠানসত্ত্বেও আমি আমার কর্ম্মফল—আমার ভাগ্যপ্রসূত দুঃখের হাত এড়াইতে পারিতেছি না। এই কারণে আমি সদাই বিমর্ষ।"

সম্রাটের এবম্বিধ প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া সাধু বলিলেন, 'সম্রাট্, দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার পক্ষে আপনার অনুষ্ঠিত উপায়-সমূহ অকিঞ্চিৎকর।"—বলিয়া নিম্নলিখিত উদাহরণটির সহায়ে সম্রাটের দুঃখের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

"একদা একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুদর্শন জম্বুক এক উচ্চ পর্ব্বতের পশ্চাতে আর একটি জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বতগাত্রে নিরাপদ ভাবিয়া আপন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিল। দিনের বেলা আলোকে জম্বুক সেই গুপ্ত বাসস্থানে লুকাইয়া থাকিত, কদাপি বাহির হইত না। রাত্রি হইলে অন্ধকারে চুপিচুপি অতি সন্তর্পণে বাহিরে আসিত। এরূপ সাবধানতা সত্ত্বেও জম্বুক শিকারীর ফাঁদ এড়াইতে পারিল না—এক দিন ফাঁদে পড়িয়া জীবন হারাইল। এই জম্বুকের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—এত সাবধানতা, তথাপি এই জম্বুকের এই দুর্গতি কেন হইল? জম্বুকের কি অপরাধ? ইহার এক মাত্র উত্তর—ব্যাধ তাহাকে জম্বুক বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। জম্বুক-চর্ম্মই ঐ জম্বুকের ব্যাধের নজরে পড়িবার কারণ। এক কথায় জম্বুকের বহিরাবরণই জম্বুকের দুর্ভাগ্যের কারণ। হে সম্রাট্, তোমার এই সম্রাটের পরিচ্ছদই তোমার জম্বুক-চর্ম্ম। এই রাজ্য, পদ, ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতাই তোমার আবরণ হইয়া তোমাকে দুর্ভাগ্যের কবলে পাতিত করিয়াছে। দুঃখের কারণগুলি ত্যাগ কর, হৃদয় পবিত্র কর, রিপুর বশ্যতা হইতে উহাকে মুক্ত কর, তাহা হইলে মৃত্যুহীন, দুঃখহীন রাজ্যে যাইতে পারিবে।

"হে সম্রাট্, এই ন্যান্-উছ্ দেশে এক জনপদ আছে—এক রাজ্য আছে, সে রাজ্যের নাম ধর্ম্মরাজ্য। সে দেশের অধিবাসীরা সৎ, সরল, স্বার্থলেশশূন্য ও জিতেন্দ্রিয়। তাহারা উপার্জ্জন করে কিন্তু সঞ্চয় করে না, দান করে কিন্তু প্রতিদান আকাঙ্খা করে না। তাহারা মহা উদ্যমে কার্য্য করে, কিন্তু তাহাতে দাসসুলভ বাধ্যবাধকতার আভাস পর্য্যন্ত নাই। তাহারা অব্যাহত স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, কোনরূপ দেশকালোচিত বিশিষ্ট নিয়মের বন্ধন নাই। তাহাদের কার্য্যকলাপে অনুশাসনের বাঁধাবাধি নাই, তথাপি তাহারা জ্ঞানের পথ হইতে—সত্যের পথ হইতে এক তিলও বিচ্যুত নয়। হে সম্রাট্, তুমি সেই রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা কর, এই সংসার, সংসারের ঐশ্বর্য্য ক্ষমতা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া থাক। একমাত্র ভগবানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া যাত্রা কর।"

অধিপতি সাধুর বাণী শ্রবণ করিয়া হতাশকণ্ঠে বলিলেন—

"মহাশয়, আপনি এই যে পথের কথা বলিলেন, সে পথ অতি দীর্ঘ এবং অতীব বিপদসঙ্কুল। এ পথে কত শত বাধা—নদ নদী, কত পাহাড় পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইতে হইবে! সে নদী উত্তীর্ণ হইবার আমার তরণী কোথায়? সে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিবার যান কোথায়?"

সাধু বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই। সম্রাট্, শরীরমনের বদ্ধভাবই প্রধান প্রতিবন্ধক। দেহমনের প্রতিবন্ধকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিও না, সে পথের তুমিই তোমার যান হইবে।"

সম্রাটের ভীত চিত্ত সাধুর কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারায় পুনরায় বলিল,

"এ পথ অসীম—ভয়ঙ্কর—নিরানন্দ—লোক-সমাগমশূন্য। বিপদে কেহ আমার ডাকে সাড়া দিবে না, কেহ সাহায্য করিবে না, ক্ষুধায় অন্ন দিবে না! আমি কি করিয়া এই পথে যাত্রা করি?"

"বাসনা ত্যাগ কর, শক্তির অযথা অমিত ব্যবহার কমাও। দেখিবে, কোন কিছুর দরকার হইবে না, কিছু না পাইলেও তাহাতে অভাব বোধ হইবে না। নদী অতিক্রম কর, অসীম অপার সমুদ্রের

বক্ষের উপর* দিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে। যে সব চিন্তা তোমায় দেহমনের রক্ষার ভার গ্রহণের ভান করিয়া সতত তোমার দেহবুদ্ধি জাগ্রৎ রাখিয়াছে, তাহারা তোমার এই আত্মনির্ভরতায় তোমায় পরিত্যাগ করিবে। নদীতীরে তাহারা পড়িয়া রহিবে, তুমি অসীম সাগরবক্ষের উপর দিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে থাকিবে। দেহবুদ্ধি—অর্থাৎ 'আমি মানুষ মাত্র'—এই বোধই বন্ধনের কারণ। সম্রাট্, জানিবে, মানুষই মানুষের দুঃখের কারণ। মানুষে মানুষ-জ্ঞান—ইহা হইতেই যত দুঃখের উদ্ভব। সুতরাং এই সব বাধা, এই দুঃখের কারণসমূহের সংশ্রব ত্যাগ কর, আপনাকে সর্ব্বরকমে মুক্ত কর, একমাত্র ঈশ্বর সত্য জানিয়া তাঁহাতে নির্ভর করিয়া সেই অনন্তের রাজ্যের জন্য যাত্রা কর।

"হে সম্রাট্, মনে কর, একখানি তরণী একটি নদী পার হইবার জন্য চলিয়াছে। আর একখানি মাঝি এবং আরোহিবিহীন শূন্য তরণী ভাসিয়া আসিতেছে। পারে যাবার তরণী সেই শূন্য তরণী দেখিয়া চীৎকার করিবে না, 'সামলাও' বলিয়া হাঁকিবে না। কিন্তু যদি সেই শূন্য তরণীতে একজন আরোহী থাকে, অমনি সে চীৎকার করিয়া উঠিবে, 'সামলাও—আমায় পথ দাও।' যদি তার চীৎকারে, তার কথায় প্রথম তরণী কর্ণপাত না করে, তা হইলে তখনই ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠিবে, নানারূপ বচসা করিবে। তরণীদ্বয়ের প্রথম অবস্থায় কোনরূপই ক্রোধের অভিনয় হয় নাই, কোনরূপ বচসা হয় নাই। কেন? শূন্য তরণী ক্রোধে উন্মত্ত হয় না, তাহার মুখে ভাষা নাই—নির্ব্বাক্। হে সম্রাট্, মানুষের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। মানুষ যদি দেহজ্ঞান ভুলিয়া, অহং ভাব ভুলিয়া বিচরণ করিতে পারে, তাহা হইলে কে তাহাকে বিরক্ত করিবে, কে তাহার ক্ষতি করিবে?"

* আমেরিকা "Vedanta centre" হইতে প্রকাশিত "The Message of the East" নামক মাসিক পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত :—উঃ সঃ।

সৎকথা।

ভগবানের দয়া না হলে ঠিক্ ঠিক্ কর্ম্ম হয় না। তিনি যাঁর প্রতি কৃপা করেন, তাঁকে দিয়ে কর্ম্ম করিয়ে নেন। হিংসা কর্‌লে কি হবে, যিনি কর্ম্মী তিনিই বড় হন। অমুকের মত বড় হব মনে কর্‌লেই কি বড় হয়। তাঁরা কত দুঃখ কষ্ট স্বীকার করেছেন তবে না বড় হয়েছেন। কর্ম্মহীন ব্যক্তিকে ভগবান্ ঘৃণা করেন। পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র। যে বেশী কর্ম্মী তাঁকেই ভগবান্ বেশী করে খেতে পর্‌তে দেন। কর্ম্মতেই বড় করে, আবার কর্ম্মতেই ছোট করে—মানুষ কি আর ভাল মন্দ আছে। কর্ম্মই হল প্রধান। কর্ম্মের জন্য কেউ বা পূজা পাচ্চে কেউ বা গাল খাচ্চে। যারা কর্ম্ম করে পূজা পায় তারাই ধন্য। যাঁরা নিস্বার্থভাবে কাজ করেন তাঁরা বলেন, 'কর্ম্ম না কর্‌লে কি চলে! ভগবান্‌ই কর্ম্ম লিখেছেন—তিনিই আবার কর্ম্ম কাটেন।' করমসে করম কাটে। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। কর্ম্মের দ্বারাও ভগবান্‌কে বুঝা যায়।

* * *

যদি কিছু কঠিন থাকে তবে সেটা ধর্ম্ম। ভগবানের দয়া ভিন্ন হয় না। মনটাকে সংযম করা কি সোজা কথা—মন ভারী পাজি, একটা কড় কথা বল্‌লেই ছোট হয়ে যায়, সেই মন নিয়ে কি ধর্ম্ম হয়। আজ কাল লোকে যে 'ধর্ম্ম, ধর্ম্ম' কর্‌ছে ও সব হুজুগে-ধর্ম্ম। ঠিক ঠিক্ লোক কটা? কটা লোক ধর্ম্ম চায়? সকলেই হুজুগে-ধর্ম্ম করে, তবে ভালর মন্দটাও ভাল এই পর্য্যন্ত। স্কুলে যেমন মাষ্টারের কথা না মান্‌লে লেখা পড়া হয় না, তেমনি যে ধর্ম্ম জানে তার কথা না মান্‌লে ধর্ম্ম হয় না। ফাঁকি দিলে ধর্ম্ম হয় না। রামপ্রসাদ বলেছেন,—

মন! ভেবেছ কপট ভক্তি করে,

শ্যামা মারে পাবে।
এ ছেলের হাতের লাড়ু নয়,
যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে॥
সাত গেঁয়ে আর মামদো বাজি,
কেবা কারে ফাঁকি দিবে।
সে কড়ার কড়া তস্য কড়া
আপনার গণ্ডা বুঝে লবে॥

তুমি ভগবান্‌কে ফাঁকি দেবে কি! তিনি তোমার চেয়েও চালাক।

* * * *

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র দুঃখ করে দেখিয়ে দিলেন যে মানব-দেহ ধারণ কর্‌লেও ভগবান্‌কে কষ্ট কর্‌তে হয়। মানুষের আর কি কথা? ভগবানের রাজ্য থাক্‌লেই বা কি, আর গেলেই বা কি! দশরথ পুণ্য করেছিলেন, তাই শ্রীরামচন্দ্র এসেছিলেন। আবার তাড়িয়ে দিলেন, তিনি স্বচ্ছন্দে বনে চলে গেলেন। শ্রীরামচন্দ্র দুর্গা-পূজা করেছিলেন। রাবণের মত হও ভগবান্ তোমার বিনাশ কর্‌বেন। সৎ, পবিত্র হলে ভগবান্‌ই তোমার সাহায্য কর্‌বেন—মানুষ কি কথা? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অর্জ্জুনের সঙ্গে থাক্‌তেন; অর্জ্জুন ভয় পেয়ে বলেছিলেন, সখা কি হবে? ভগবান্ বল্‌লেন, 'যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ'—সখা যে পক্ষে ধর্ম্ম সেই পক্ষে জয় নিশ্চয়। শ্রীকৃষ্ণ বল্‌তে পার্‌তেন, "সখা আমি আছি, ভয় কি?" তা তিনি বলেন নি।

* * * *

ভগবান্ কাহাকেও অর্থ দেন, কিন্তু দান কর্‌বার ইচ্ছা দেন না, আবার যাকে দান কর্‌বার ইচ্ছা দেন, তাকে অর্থ দেন না। যাকে দুইই দেন, বুঝ্‌তে হবে তার উপর ভগবানের দয়া আছে।

ভগবান্ যাকে টাকা দেন তাকে হয়ত ছেলেপুলে দেন না, আবার হয়ত যে খুব গরীব তাকে ছেলেপুলে দেন। যাকে দুইই দেন বুঝ্‌তে হবে তার উপর ভগবানের দয়া আছে।

জগতে সকলের চেয়ে ভালবাসে মা। পরিবার গেলে পরিবার পাওয়া যায়, কিন্তু মা গেলে মা পাওয়া যায় না। কাজকর্ম্ম করে ঘুরে ফিরে এসে মার সঙ্গে কথা বল্‌লে প্রাণটা স্ফূর্ত্তি হয়। ঐহিক সুখ ত্যাগ না কর্‌লে মাতৃভক্তি হয় না। মার চেয়ে ভালবাসেন ভগবান্।

* * * *

যে সাধন ভজন কর্‌বে তাকে কেউ বাধা দিতে পার্‌বে না। সে নিজের কাজ নিজেই করে যাবে। যে সাধন ভজন করে তার মেজাজই আলাদা।

* * * *

হাজার ত্যাগী হক্ না কেন, মৃত্যুর সময় যা ভাব্‌বে তাই হবে। সেইজন্য যতদূর সম্ভব সৎচিন্তা করা উচিত; তাহলে মৃত্যুর সময় সৎ-ভাবই মনে আস্‌বে।

* * * *

সুখের সময় লোকে কি ভগবান্‌কে চায়? তখন ভাবে আমিই কর্ত্তা, বিধাতা। দুঃখের সময় ত ভগবান্‌কে ভজনা কর্‌বেই। কিন্তু যে সুখের সময়ও ভগবান্‌কে ডাকে সেই ত মানুষ।

* * * *

সংসারী জীবনের চেয়ে অবিবাহিত জীবন ভাল, কারণ যদি কখনও বৈরাগ্য আসে তাহলে সংসারী লোক ছেলেপিলের মায়া ছাড়িয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না—অবিবাহিত লোক পারে।

* * * *

চাকুরীর চেয়ে বরং ভিক্ষা করা ভাল। যে ভিক্ষা করে তার যে দিন ইচ্ছা না হল সে দিন ভিক্ষায় বেরুল না। কিন্তু চাকরে লোকের তা হবার জো নাই, ইচ্ছা থাক আর নাই থাক, চাকরীতে বেরুতে হবে।

* * * *

ভগবানের যুক্তি এক, আর মানুষের যুক্তি আর এক রকম। ভগবান্ মানুষের যুক্তি অনুসারে চল্‌তে পারেন না।

* * * *

সৎবুদ্ধি হলেই ভগবান্ স্বপক্ষে থাকেন, হীনবুদ্ধি হলে ভগবান্ বিপক্ষ হন। তাঁর হুকুম পালন না করলে দুর্দ্দশা হবেই।

* * *

যত অবতার বলছেন, "সাধুসঙ্গ কর?" ঠিক ঠিক সাধু ভগবান্ লাভের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে।

* * * *

ভগবানের উপদেশে আর জীবের উপদেশে বহু তফাৎ—ভগবানের সিদ্ধান্তই ঠিক। ভগবানের আরাধনা কর, ভজনা কর তাঁর জোরেই জোর। তাঁকে না মান তাতে তাঁর কি?

* * * *

যে ধর্ম্মে যত ত্যাগী জন্মায় সেই ধর্ম্মই তত শ্রেষ্ঠ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(১)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

গ্রেকোর্ট গার্ডেন্স।
ওয়েষ্টমিনিষ্টার, দক্ষিণ-পশ্চিম।
১৩ই নভেম্বর, ১৮৯৬।

প্রিয়—

আমি খুব শীঘ্রই, সম্ভবতঃ ১৬ই ডিসেম্বর ভারতবর্ষে যাত্রা কর্‌ছি। কারণ, পুনরায় আমেরিকা যাবার পূর্ব্বে আমার একবার ভারতবর্ষ দেখ্‌বার বিশেষ ইচ্ছা এবং আমি কয়েকজন ইংরাজ বন্ধুকে আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবার বন্দোবস্তও করেছি। আমার একান্ত ইচ্ছাস্বত্বেও আমেরিকা হয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

ডাক্তার জেনস্ বাস্তবিকই অতি চমৎকার কাজ কর্‌ছেন। তিনি আমাকে এবং আমার কাজের জন্য বার বার যেরূপ সহৃদয়তা দেখিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন, তজ্জন্য আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ তাহা বাক্যে প্রকাশ কর্‌তে অক্ষম। এখানে প্রচারকার্য্য বেশ সুন্দর ভাবেই চল্‌ছে। তুমি শুনে খুসী হবে যে রাজযোগের প্রথম সংস্করণ সব বিক্রি হয়ে গেছে এবং আরও কয়েকশ 'অর্ডার' এসে পড়ে রয়েছে।

---

(২)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৩৯নং ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, দক্ষিণ-পশ্চিম।

লণ্ডন।

২৮শে নভেম্বর, ১৮৯৬।

প্রিয়—

আমার মনে হয়, যে কোন কারণেই হউক, তোমাদের চার জনকেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি এবং আমি সগর্ব্বে বিশ্বাস করি যে তোমরা চারজনও আমাকে সেই রকম ভালবাস। এইজন্য ভারতবর্ষে যাবার আগে তোমাদিগকে কয়েক ছত্র স্বতঃ প্রণোদিত হয়েই লিখ্‌ছি। লণ্ডনের প্রচারকার্য্যে চারিদিকে ঢি ঢি পড়ে গেছে। ইংরাজ জাতি আমেরিকানদের মত অত বুদ্ধিমান নয়, কিন্তু একবার যদি তুমি তাদের হৃদয় অধিকার কর্‌তে পার, তাহলে তারা চিরকালের জন্য তোমার গোলাম হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে আমি উহা অধিকার কর্‌ছি। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই ছমাসের কাজেই, সাধারণ বক্তৃতার কথা ছেড়ে দিলেও আমার ক্লাসেই বরাবর ১২০ জন উপস্থিত হচ্চে। এখানে প্রত্যেকেই কাজ বোঝে—ইংরাজ কর্ম্মতৎপর। কাপ্তেন ও মিসেস্ সেভিয়ার এবং মিঃ গুড্‌উইন কাজ কর্‌বার জন্য আমার সঙ্গে ভারতে যাচ্ছেন এবং এই কাজে তাঁরা নিজেদেরই অর্থ ব্যয় কর্‌বেন। এখানে আরও বহুলোক ঐরূপ কর্‌তে প্রস্তুত। সম্ভ্রান্ত বংশের

স্ত্রী পুরুষ, ছেলে মেয়ে তাদের মাথায় একবার যে ভাবটা ঢুকেছে সেটা কার্য্যে পরিণত কর্বার জন্য, যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্তেও বদ্ধপরিকর। এত দিন পরে, কিন্তু তা হলেও কম নয়, ভারতে কাজ আরম্ভ কর্বার জন্য অর্থ সাহায্য এসেছে এবং আরও আস্‌বে। ইংরাজ জাতির সম্বন্ধে আমার ধারণা সব ওলট্ পালট্ হয়ে গেছে। এখন আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি প্রভু কেন তাদের অন্য সব জাতের চেয়ে অধিক কৃপা করেছেন। তারা অটল, অকপটতা তাদের অস্থিমজ্জাগত, তাদের অন্তর ভাবুকতায় পূর্ণ—কেবল বাইরে একটা কঠোরতার আবরণ মাত্র রয়েছে। ঐটে ভেঙ্গে দিতে পার্‌লেই হল—বস্ তোমার মনের মানুষ খুঁজে পাবে।

সম্প্রতি আমি কলিকাতায় একটা ও হিমাচলে আর একটী কেন্দ্র স্থাপন কর্‌তে যাচ্চি। প্রায় ৭০০০ ফিট উচ্চ একটা গোটা পাহাড়ের উপর হিমাচল-কেন্দ্রটী স্থাপিত হবে। ঐ পাহাড়টী গ্রীষ্মকালে বেশ শীতল কিন্তু শীতকালে খুব ঠাণ্ডা। কাপ্তেন ও মিসেস সেভিয়ার ঐখানে থাক্‌বেন এবং ঐটে ইউরোপীয় কর্ম্মিগণের কেন্দ্র হবে। কারণ, আমি তাদের জোর করে ভারতীয় জীবন ধারণ প্রণালী অনুসারে চালিয়ে এবং ভারতের অগ্নিময় সমতল ভূমিতে বাস করিয়ে মেরে ফেল্‌তে চাই না। আমার কার্য্যপ্রণালী হচ্ছে এই যে, শত শত হিন্দু যুবক প্রত্যেক সভ্যদেশে গিয়ে বেদান্ত প্রচার করুক্ আর সেখান থেকে নরনারী যোগাড় করে ভারতবর্ষে কাজ কর্‌তে পাঠাক। এতে বেশ ভাল আদান প্রদান হবে। কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠা করে আমি Book of Job কেতাবের লোকটীর মত উপর নীচে চারিদিকে ঘুরে বেড়াব! আজ এখানেই শেষ—তা না হলে চিঠি ডাকে যাবে না। সব দিকেই আমার কাজের সুবিধা হয়ে যাচ্ছে—এতে আমি খুসী এবং জানি তোমরাও আমার মত খুসী হবে।

তোমরা অশেষ কল্যাণ ও সুখশান্তি লাভ কর। ইতি

তোমাদের চিরপ্রেমবদ্ধ

বিবেকানন্দ।

পুঃ—ধর্ম্মপালের খবর কি? তিনি কি কর্‌ছেন? তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমার ভালবাসা জানিও।

বিঃ

---

(৩)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

রামনাদ।

শনিবার, ৩০শে জানুয়ারী, ১৮৯৭।

প্রিয়—

চারিদিকের অবস্থা অতি আশ্চর্য্যরূপে আমার অনুকূল হয়ে আস্‌ছে। সিংহলে কলম্বোয় আমি জাহাজ থেকে নেমেছি এবং এখন ভারতবর্ষের প্রায় শেষ দক্ষিণতম ভূখণ্ড রামনাদে, সেখানকার রাজার অতিথিস্বরূপে রয়েছি। এই কলম্বো থেকে রামনাদ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে এক বিরাট শোভাযাত্রা চলেছিল—হাজার হাজার লোকের ভিড়—রোসনাই—অভিনন্দন ইত্যাদি। রামনাদে যেখানে আমি প্রথম পদার্পণ করি সেই স্থানে ৪০ ফিট উচ্চ একটী স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী হচ্চে। রামনাদের রাজা তাঁহার অভিনন্দন পত্র একটী সুন্দর কারুকার্য্যখচিত প্রকাণ্ড স্বর্ণ পেটিকায় (Casket) করে আমাকে প্রদান কর্‌লেন। মান্দ্রাজ ও কলিকাতা আমার জন্য হাঁ করে রয়েছে—যেন সমস্ত দেশটা আমাকে সম্মান কর্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে উঠেছে। সুতরাং তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ, আমি আমার অদৃষ্টের চরম সীমায় উঠেছি। তথাপি আমার মন চিকাগোর সেই নিস্তব্ধ, বিশ্রান্তিপূর্ণ, শান্তিময় দিনগুলোর দিকেই ছুটছে—কি বিশ্রাম, শান্তি ও প্রেমপূর্ণ দিন! এখনই তাই তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে বসিছি। আশা করি, তুমি বেশ ভাল আছ ও আনন্দে আছ। ডাক্তার ব্যারোজকে সাদর অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য আমি লণ্ডন থেকে আমার দেশের লোকদের চিঠি লিখেছি। তারা তাঁকে খুব জমকাল গোছের অভ্যর্থনা করেছিল। কিন্তু লোকে যে তাঁর

তেমন নিতে পারেনি তার জন্ত আমি দোষী নই। কলকাতার লোক-গুলোর মাথায় সহজে কিছু ঢোকে না। ডাক্তার ব্যারোজ— আমার সম্বন্ধে আকাশ পাতাল ভাবছেন, আমি শুন্‌তে পাচ্ছি। এই ত সংসার!

মা, বাবা ও তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জান্‌বে। ইতি—

তোমার স্নেহবদ্ধ

বিবেকানন্দ।

(৪)

(ইংরাজী হইতে অনুদিত।

আলমবাজার মঠ,

কলিকাতা।

৫ই মে, ১৮৯৭।

প্রিয়—

ভগ্ন স্বাস্থ্যটা যাতে পূর্ব্বের মত সবল এবং সুস্থ হয় সেই জন্য এক-মাস দার্জ্জিলিঙ্গে ছিলাম। আমি এখন বেশ ভাল হয়ে গেছি। ব্যারাম ফ্যারাম দার্জ্জিলিঙ্গেই পালিয়েছে। আমি কাল আলমোড়া যাচ্ছি, সম্পূর্ণরূপে সেরে যাবার জন্য। আলমোড়াও আর একটী শৈল নিবাস।

আমি পূর্ব্বেই তোমাকে লিখেছি যে, এখানকার অবস্থা বেশ আশাজনক বলে বোধ হচ্ছে না। যদিও সমস্ত জাতটা এককাট্টা হয়ে আমাকে সম্মান করেছে এবং আমাকে নিয়ে প্রায় পাগল হয়ে যাবার মত হয়েছিল!! শক্তির কার্য্যকরী দিক্‌টা ভারতবর্ষে আদৌ পাবে না। কলিকাতার কাছাকাছি জমির দাম আবার খুব বেড়ে গেছে। আমার বর্ত্তমান মতলব হচ্ছে, প্রধান তিনটী নগরে তিনটী কেন্দ্র স্থাপন করা। ঐগুলি আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়স্বরূপ হবে—ঐ তিন স্থান থেকেই আমি ভারতবর্ষ আক্রমণ কর্‌তে চাই।

আমি আর দুচার বৎসর বাঁচি আর নাই বাঁচি, ভারতবর্ষ ইতি-পূর্ব্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের হয়ে গেছে।

প্রফেসার জেন্সের একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছিলাম। তাতে তিনি আমার বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্যগুলির উপর বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। তুমিও লিখেছ যে,—এতে খুব রেগে গেছে। তিনি অতি সজ্জন এবং আমি তাঁকে খুব ভালবাসি। কিন্তু ভারতীয় কোন ব্যাপার নিয়ে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠ্‌লে, তার সম্পূর্ণ অন্যায় আচরণ করা হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁরা যেটাকে নানাবিধ কুৎসিৎভাব পূর্ণ আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম বলেন তা হচ্ছে ঐ বৌদ্ধধর্ম্মেরই বদহজম মাত্র। এটা স্পষ্টরূপে বুঝ্‌লে হিন্দুদের পক্ষে উহা বিনা আপত্তিতে ত্যাগ করা সহজ হবে। বৌদ্ধধর্ম্মের যা প্রাচীন ভাব—যা শ্রীবুদ্ধ নিজে প্রচার করে গেছেন, তার প্রতি এবং শ্রীবুদ্ধের প্রতি আমি প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধাপরায়ণ। আর তুমি বোধ হয় জান যে, আমরা হিন্দুরা তাঁকে অবতার বলে পূজা করে থাকি। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্মও তত সুবিধারনয়। সিংহল ভ্রমণকালে আমার সে ভুল ধারণা ভেঙ্গে গেছে। সিংহলে যদি কেহ প্রাণবন্ত থাকে তা এক হিন্দুরাই। বৌদ্ধেরা অনেকটা পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে—এমন কি —এবং তাঁহার পিতার ইউরোপীয় নাম ছিল, কিন্তু এখন তাঁরা সেটা বদলেছেন। আজকাল বৌদ্ধেরা "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ"এই শ্রেষ্ঠ উপদেশের এই পর্য্যন্ত খাতির করে যে, তারা এখন যেখানে সেখানে 'কসাইয়ের দোকান' খোলে !!! এমন কি, পুরোহিতরা পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে উৎসাহ দেন !!! আমি এক সময়ে ভাব্‌তুম, আদর্শ বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমানকালেও অনেক উপকার কর্‌বে। কিন্তু আমি আমার ঐ মত একেবারে ত্যাগ করেছি এবং স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, কি কারণে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হয়েছিল ****।

থিয়জফিষ্টদের সম্বন্ধে তোমার প্রথমেই স্মরণ করা উচিত যে, ভারতবর্ষে থিয়জফিষ্ট ও বৌদ্ধদের সংখ্যা নামমাত্র আছে—নাই বল্‌লেই হয়। তারা দুচারখানা কাগজ বের করে খুব একটা হুজুগ্‌ করে দুচার জন প্রাচ্যবাসীকে নিজেদের মত শুনাতে পারে,

কিন্তু হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে এমন দুজন বৌদ্ধ বা দুশজন থিয়জফিষ্ট আমি ত দেখি না।

আমি আমেরিকায় এক লোক ছিলুম এখানে আর এক লোক হয়ে গেছি। এখানে সমস্ত জাতটা (হিন্দু) আমাকে যন তাদের একজন প্রামাণ্য ব্যক্তি (authority) বলে মনে কর্‌ছে—আর সেখানে একজন ঘৃণ্য প্রচারক মাত্র ছিলাম। এখানে রাজারা আমার গাড়ী টানে—আর সেখানে আমাকে একটা ভাল হোটেলে পর্য্যন্ত ঢুকতে দিত না। সেইজন্য এখানে এমন কথা বল্‌তে হবে,যাতে সমস্ত জাতটার—আমার স্বদেশবাসীর মঙ্গল হয়, তা সেগুলো দুচারজনের যতই অপ্রতিকর হক না কেন। যা কিছু খাঁটি এবং সৎ সেই সকলকে গ্রহণ, এবং তাদের প্রতি ভালবাসা ও উদারভাব পোষণ কর্‌তে হবে কিন্তু ভণ্ডামির প্রতি নয়। —রা আমাকে আদরও খোসামোদ কর্‌তে চেষ্টা করেছিল, কারণ; এখন আমি ভারতের একজন প্রধান ও গণ্যমান্য লোক হয়েছি। আর সেই জন্যই তাদের কাজ করা, কি তাদের আজগুবিগুলোর সমর্থন করা দুচারটে কড়া স্পষ্ট কথায় বন্ধ কর্‌তে হয়েছে—আর ঐ কাজ হয়ে গেছে। আমি এতে খুব খুসী। যদি আমার শরীর ভাল থাক্‌ত তাহলে ঐ সব ভুঁইফোঁড়গুলোকে ভারত থেকে একেবারে দূর করে দিতুম, অন্ততঃ যথাসাধ্য চেষ্টা করতুম। আমি যতদূর যা দেখিছি তাতে, ভারতে ইংলিস চর্চ্চের যে মিশনরি আছে তাদের উপর বরংআমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু থিয়জফিষ্ট ও বৌদ্ধদের উপর আদৌ নেই। আমি পুনরায় তোমাকে বল্‌ছি, ভারতবর্ষ ইতিপূর্ব্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের এবং সুসংস্কৃত হিন্দুধর্ম্মের হয়ে গেছে। *** আমি এখানকার কাজ একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়েছি। ইতি

বিবেকানন্দ।

মনীষা।

ভগবান্ যখন কাহারও কাণে কথা বলেন, তখন কেবল একটি বিষয়ের কথাই বলেন না, সকল কথাই বলেন। নিখিলভুবন তাঁহার বাণীতে পূর্ণ সে অনুভব করে।

—এমার্সন।

*　　*　　*　　*　　*

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাটি জাল্‌লে তখনই আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মান্তরের পাপও তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ।

*　　*　　*　　*　　*

প্রত্যেক ভোজে (feast) স্মরণ রাখিবে, দুজন অতিথিকে ভোজন করাইতে হইবে—এক এই শরীর, অপর আত্মা। এবং এ কথাও স্মরণ রাখিবে, তোমার দেহ-অতিথিকে যাহা দিবে তাহা তখনই লোপ পাইবে, কিন্তু আত্মারূপ অতিথিকে যাহা দিবে তাহা চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে।

—এপিক্‌টেটাস্।

*　　*　　*　　*　　*

জ্ঞান অর্জ্জন কর ; কেন না যে জ্ঞান অর্জ্জন করে, সে ঈশ্বরেরই কার্য্য করে। যে জ্ঞানের প্রসঙ্গ করে, সে ঈশ্বরেরই গুণগান করে। যে জ্ঞানের অনুসন্ধান করে, সে ঈশ্বরেরই পূজা করে। যে উহা বিতরণ করে, সে প্রকৃতই প্রীতির কার্য্য করে। যে উহা কর্ম্মে নিয়োজিত করে, সে প্রকৃতই ভক্তির অনুষ্ঠান করে। জ্ঞান-

সহায়ে লোকে সদসৎ বুঝিতে পারে। জ্ঞান স্বর্গপথের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা। জ্ঞান নির্জ্জনে বন্ধু, বন্ধুহীনের বন্ধু।

—মহম্মদ।

* * * * *

মানুষের প্রধান লক্ষ্য কি? প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, ভগবানের গুণ-কীর্ত্তন করা—তাঁর স্তুতি করা এবং তাঁহাকে চিরসম্ভোগ করা।

—ওয়েষ্টমিনিষ্টর কেটিকিজম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বন্যা নিবারণ কার্য্য

গুস্করা (বর্দ্ধমান) এবং বালিয়া।

আমরা বিগত ১০ই ডিসেম্বর, ১৯১৬, যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিয়াছি তাহাতে সাধারণকে জানাইয়াছি যে, অজয় নদের বন্যাপীড়িত স্থানীয় অধিবাসিগণকে মাহাতা, গুস্করা, ভেদিয়া এবং মঙ্গলকোট এই চারিটী কেন্দ্র হইতে সাহায্য করিতেছি। বন্যার প্রথম অবস্থায় অনেকের ঘর বাড়ী পড়িয়া যাওয়ায় এবং বৎসরের খোরাকি সঞ্চিত ধন, ও অন্যান্য জিনিস পত্রাদি ভাসিয়া যাওয়ায় সকলেই বিব্রত এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। তখন তাহারা আহারের সংস্থানের চেষ্টা করিবে না ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া নিজেদের শীত, তাপ হইতে রক্ষা করিবে। এরূপ অবস্থায় চাউল সাহায্য পাওয়ায় তাহারা শেষোক্ত অভাব দূর করিতে মনোযোগ দিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতঃপর এখন ধান কাটা,ধান গৃহে আনা প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় মজুরেরা কাজ এবং যাহাদের জমিজায়গা আছে তাহারা ধান পাই-তেছে। এই জন্য এখন আর চাউল সাহায্যেরও প্রয়োজন নাই। আর

আশঙ্কা হইযাছিল যে বন্যায় অনেক ক্ষেতের ধান নষ্ট হইয়া যাইবে—ঈশ্বরের কৃপায় তাহা হয় নাই। এই সকল কারণে লোকের অবস্থা ভাল হওয়ায় আমরা ভেদিয়া, গুস্করা, মঙ্গলকোট এবং মাহাতা এই চারিটী কেন্দ্র যথাক্রমে বিগত ১২ই, ১৩ই, ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর বন্ধ করিয়া দিয়াছি।

নিম্নে সকল কেন্দ্রেব ২৯শে নভেম্বর হইতে শেষ পর্য্যন্ত চাউল বিতরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
ভেদীয়া	২২	১৯০	৯॥৫
ঐ (পর সপ্তাহে)	২২	১৮৫	৯।৫
গুস্করা	২১	১৩৩	৭৵০
ঐ (পর সপ্তাহে)	২১	১৩১	৭৵০
মঙ্গলকোট	১৯	১১৭	৬।০
ঐ (পর সপ্তাহে)	১৮	১৭৪	৯।০
ঐ	১৮	১৬৪	৮॥০
মাহাতা	২৬	১৭১	৮৸৬
ঐ (পর সপ্তাহে)	২৭	২৫৪	১২৸৮
ঐ	২৭	২৪৩	১৩৴২

গতবারের কার্য্যবিবরণীতে আমরা ইহাও প্রকাশ করিয়াছি যে, কাশী জেলার কেন্দ্র দুইটী বন্ধ করিয়া দিয়া আমরা বালিয়া জেলার বারিয়া গ্রামে একটী সাহায্যকেন্দ্র খুলিয়াছি। উক্ত কেন্দ্র বিগত ৬ই নভেম্বর খোলা হয় এবং উক্ত তারিখ হইতে ১লা জানুয়ারী, ১৯১৭, পর্য্যন্ত উক্ত কেন্দ্র হইতে গড়পড়্তা ১৭ খানি গ্রামের ২২১ জনকে ১৬৫।৫ সের খাদ্যদ্রব্য—গম, যব ইত্যাদি সাপ্তাহিক সাহায্য করা হইয়াছে। ১লা জানুয়ারী শেষ বিতরণান্তে উক্ত কেন্দ্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় লোকের অভাব এখনও কথঞ্চিৎ থাকিলেও এই দুই মাসে পূর্ব্বাপেক্ষা অবস্থা যে অনেক ভাল হইয়াছে তাহাতে

আর সন্দেহ নাই। এখন আশা করা যায় তাহারা কোন রকমে চালাইয়া লইতে পারিবে।

সর্ব্বশেষে যাঁহারা আমাদিগকে নিজেদের ব্যয়ভাগ এবং সাধারণ সাচ্ছন্দ্য সংক্ষেপ করিয়া অর্থসাহায্য করিয়া আসিয়াছেন এবং যাঁহারা শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের উপর ভগবানের আশীর্ব্বাণী বর্ষিত হউক এবং তাঁহাদের হৃদয় দরিদ্র ও আতুরের সেবার্থ উন্মুক্ত থাকুক—ইহাই আমাদের সতত প্রার্থনা।

অতঃপর যিনি যাহা দান করিবেন তাহা আমাদের স্থায়ী প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে গ্রহণ করা হইবে এবং তজ্জন্য রসিদ দেওয়া হইবে। উল্লিখিত সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড় পোঃ আঃ, হাওড়া।

১৪—১—১৭ বিনীত

কলিকাতা। সারদানন্দ।

দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে প্রাপ্তি স্বীকার।

১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত

উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত।

শ্রীরামধন সাহা অধিকারী; কুলাঘড়া	৫৵০
শ্রীসত্যচরণ কর্ম্মকার ও শ্রীচৈতন্যলাল দে, কলিকাতা	১০
সেক্রেটারী নৈতিক শিক্ষা সম্মিলনী ,,	৬
শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সোনারূপা চা বাগান	২৲
শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা	২৲
শ্রীহেমন্তকুমার বসু ,,	১
,, বি, এন, পাল, মীরাট	১২১৲
,, চিত্রলেখা রায়, ঘুঘুডাঙ্গা	৪৲
শ্রীরোহিণীরঞ্জন সেন, চট্টগ্রাম	২
শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়, ,,	১৲
জনৈক ভক্ত, কলিকাতা	১৫৲
জমাদার এন, এন, বসু, বসরা	৭৲
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, রিজলকোনা	১॥০
শ্রীভূতনাথ বসু, বাগুলডাঙ্গা	১
জনৈক বন্ধু	১০০৲
কানাইলাল সেন স্মৃতিভাণ্ডার, আলিপুর	১০
সেক্রেটারী নাগপুর দুর্ভিক্ষভাণ্ডার	১০৲
শ্রীনিবারণ চন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা	২
শৈলেশমোহিনী রায়, ঘুঘুডাঙ্গা	৩
শ্রীসত্যচরণ শী, বেসিন	৫৲
শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণেশ্বর	৫৲
শ্রীচুনিলাল শীল, হাওড়া	৫
জনৈক বন্ধু :	১৲
শ্রীযুক্ত ডি, এন, মুখার্জ্জি, কলিকাতা	৫৲
জনৈক ভদ্রমহিলা	১৲
শ্রীকানাইলাল পাল ,,	১০
মাঃ স্বামী সর্ব্বানন্দ, মান্দ্রাজ	৮১।/১০
শ্রীজয়ানন্দ সোম, ভবানীপুর	৩
সেক্রেটারী বার লাইব্রেরী, আলিপুর	৮১৷৵০

৫ই হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বেলুড় মঠে প্রাপ্ত।

মিঃ কে এস দে, ওয়াজা, সি, পি,	১৭৲
জনৈক বন্ধু	২৲
শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু, ঢাকা	১৲
চৌধুরী রহমন আলি, লক্ষ্ণৌ,—	২৬৵০
জনৈক মান্দ্রাজবাসী ভদ্রলোক	৫৲
মিঃ এস_কে মজুমদার পোর্টব্লেয়ার	২৲
ত্রিচিনোপল্লির সাব এ্যাসেষ্ট্যান্ট সার্জ্জন	২৲
ডাক্তার, বি এম বোস্, বর্ম্মা	৫৲
মিঃ ভি পনাম্পলম, পোর্ট সিটেনহাম্	৫০।৵০
মিসেস্ সেভিয়ার	৬৲

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

শিক্ষা ও সংসারসংঘর্ষ।

(স্বামী সারদানন্দ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

পিতার মৃত্যুর পরে এক দুই করিয়া তিন চারি মাস গত হইল, কিন্তু দুঃখ দুর্দ্দিনের অবসান হওয়া দূরে থাকুক আশার রক্তিম ছটায় নরেন্দ্রনাথের জীবনাকাশ ঈষৎমাত্রও রঞ্জিত হইল না। বাস্তবিক, এমন নিবিড় অন্ধকারে তাঁহার জীবন আর কখনও আচ্ছন্ন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। এই কালের আলোচনা করিয়া তিনি কখন কখন আমাদিগকে বলিয়াছেন—

"মৃতাশৌচের অবসান হইবার পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্মের চেষ্টায় ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে নগ্নপদে চাকরীর আবেদন হস্তে লইয়া মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে আফিস হইতে আফিসান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম—অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের কেহ কেহ দুঃখের দুঃখী হইয়া কোনদিন সঙ্গে থাকিত, কোন দিন থাকিতে পারিত না কিন্তু সর্ব্বত্রই বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। সংসারের সহিত এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল, স্বার্থশূন্য সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল—দুর্ব্বলের, দরিদ্রের, এখানে স্থান নাই। দেখিতাম, দুই দিন পূর্ব্বে যাহারা আমাকে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করিবার অবসর পাইলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছে, সময় বুঝিয়া তাহারাই এখন আমাকে দেখিয়া মুখ বাঁকাইতেছে এবং ক্ষমতা থাকিলেও সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া কখন কখন সংসারটা দানবের রচনা বলিয়া মনে হইত। মনে

হয়, এই সময়ে একদিন রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ের তলায় ফোস্কা হইয়াছিল এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়াছিলাম। দুই এক জন বন্ধু সেদিন সঙ্গে ছিল অথবা ঘটনাক্রমে ঐ স্থানে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন, বোধ হয় আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গাহিয়াছিল—

বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাস পবনে—ইত্যাদি।

শুনিয়া মনে হইয়াছিল মাথায় যেন সে গুরুতর আঘাত করিতেছে। মাতা ও ভ্রাতাগণের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথা মনে উদয় হইয়া ক্ষোভে, নিরাশায়, অভিমানে বলিয়া উঠিয়াছিলাম, 'নে, নে, চুপ্ কর, ক্ষুধার তাড়নায় যাহাদিগের আত্মীয়বর্গকে কষ্ট পাইতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাহাদিগকে কখন সহ্য করিতে হয় নাই, টানা-পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে তাহাদিগের নিকটে ঐরূপ কল্পনা মধুর লাগিতে পারে, আমারও একদিন লাগিত; কঠোর সত্যের সম্মুখে উহা এখন বিষম ব্যঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে।'

"আমার ঐরূপ কথায় উক্ত বন্ধু বোধ হয় নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল—দারিদ্র্যের কিরূপ কঠোর পেষণে মুখ হইতে ঐ কথা নির্গত হইয়াছিল তাহা সে বুঝিবে কেমনে! প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপনে অনুসন্ধান করিয়া যদিন বুঝিতাম গৃহে সকলের প্রচুর আহার্য্য নাই এবং হাতে পয়সা নাই সেদিন মাতাকে আমার নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া বাহির হইতাম এবং কোন দিন সামান্য কিছু খাইয়া, কোন দিন অনশনে কাটাইয়া দিতাম। অভিমানে, ঘরে বাহিরে কাহারও নিকটে ঐ কথা প্রকাশ করিতেও পারিতাম না। ধনী বন্ধুগণের অনেকে পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে তাহাদিগের গৃহে বা উদ্যানে লইয়া যাইয়া সঙ্গীতাদি দ্বারা তাহাদিগের আনন্দবর্দ্ধনে অনুরোধ করিত। এড়াইতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের সহিত গমনপূর্ব্বক তাহাদিগের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইতাম, কিন্তু অন্তরের কথা তাহাদিগের নিকটে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইত না—তাহারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয় জানিতে কখনও সচেষ্ট হয় নাই। তাহাদিগের মধ্যে বিরল

দুই এক জন কখন কখন বলিত, তোকে আজ এত বিষণ্ণ ও দুর্ব্বল দেখিতেছি কেন, বল দেখি? একজন কেবল আমার অজ্ঞাতে অন্যের নিকট হইতে আমার অবস্থা জানিয়া লইয়া বেনামী পত্র-মধ্যে মাতাকে সময়ে সময়ে টাকা পাঠাইয়া আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছিল।

"যৌবনে পদার্পণপূর্ব্বক যে সকল বাল্যবন্ধু চরিত্রহীন হইয়া অসদুপায়ে যৎসামান্য উপার্জ্জন করিতেছিল তাহাদিগের কেহ কেহ আমার দারিদ্র্যের কথা জানিতে পারিয়া সময় বুঝিয়া দলে টানিতেও সচেষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা ইতিপূর্ব্বে আমার ন্যায় অবস্থার পরিবর্ত্তনে সহসা পতিত হইয়া একরূপ বাধ্য হইয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য হীনপথ অবলম্বন করিয়াছিল, দেখিতাম, তাহারা সত্য সত্যই আমার জন্য ব্যথিত হইয়াছে। সময় বুঝিয়া অবিদ্যারূপিণী মহামায়াও এই কালে পশ্চাতে লাগিতে ছাড়েন নাই। এক সঙ্গতিপন্না রমণীর পূর্ব্ব হইতে আমার উপর নজর পড়িয়াছিল। অবসর বুঝিয়া সে এখন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল, তাহার সহিত তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্যদুঃখের অবসান করিতে পারি! বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা প্রদর্শনে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইয়াছিল। অন্য এক রমণী ঐরূপে প্রলোভিত করিতে আসিলে তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'বাছা, এই ছাই ভস্ম শরীরটার তৃপ্তির জন্য এতদিন কত কি ত করিলে, মৃত্যু সম্মুখে—তখনকার সম্বল কিছু করিয়াছ কি? হীনবুদ্ধি ছাড়িয়া ভগবানকে ডাক।'

"যাহা হউক, এত দুঃখ কষ্টেও এতদিন আস্তিক্য বুদ্ধির বিলোপ অথবা ঈশ্বর মঙ্গলময় একথায় সন্দিহান হই নাই। প্রাতে নিদ্রা-ভঙ্গে তাঁহাকে স্মরণ মননপূর্ব্বক তাঁহার নাম করিতে করিতে শয্যা ত্যাগ করিতাম এবং আশায় বুক বাঁধিয়া উপার্জ্জনের উপায় অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একদিন ঐরূপে শয্যা ত্যাগ করিতেছি এমন সময়ে পার্শ্বের ঘর হইতে মাতা শুনিতে পাইয়া বলিয়া

উঠিলেন, 'চুপ্ কর্ ছোঁড়া, ছেলে বেলা থেকে কেবল ভগবান্, ভগবান্, ভগবান্ ত সব কল্লেন!' কথাগুলিতে মনে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলাম। স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভগবান্ কি বাস্তবিক আছেন, এবং থাকিলেও মানবের সকরুণ প্রার্থনা কি শুনিয়া থাকেন? তবে এত যে প্রার্থনা করি তাহার কোনরূপ উত্তর নাই কেন? শিবের সংসারে এত অশিব কোথা হইতে আসিল—মঙ্গলময়ের রাজত্বে এত প্রকার অমঙ্গল কেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় পরদুঃখে কাতর হইয়া এক সময়ে যাহা বলিয়াছিলেন - তোর ভগবান্ যদি দয়াময় ও মঙ্গলময়, তবে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইয়া লাখ লাখ লোক দুটি অন্ন না পাইয়া মরে কেন?—তাহা, কঠোর ব্যঙ্গস্বরে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরের প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হইল, অবসর বুঝিয়া সন্দেহ আসিয়া অন্তর অধিকার করিল।

"গোপনে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বাল্যকাল হইতে কখন ঐরূপ করা দূরে থাকুক অন্তরের চিন্তাটি পর্য্যন্ত ভয়ে বা অন্য কোন কারণে কাহারও নিকটে কখনও লুকাইবার অভ্যাস করি নাই। সুতরাং ঈশ্বর নাই, অথবা যদি থাকেন ত তাঁহাকে ডাকিবার কোন সফলতা এবং প্রয়োজন নাই, একথা হাঁকিয়া ডাকিয়া লোকের নিকটে সপ্রমাণ করিতে এখন অগ্রসর হইব, ইহাতে বিচিত্র কি? ফলে স্বল্প দিনেই রব উঠিল, আমি নাস্তিক হইয়াছি এবং দুশ্চরিত্র লোকের সহিত মিলিত হইয়া মদ্যপানে ও বেশ্যালয় পর্য্যন্ত গমনে কুণ্ঠিত নহি! সঙ্গে সঙ্গে আমারও আবাল্য অনাশ্রব হৃদয় অযথা নিন্দায় কঠিন হইয়া উঠিল এবং কেহ জিজ্ঞাসা না করিলেও সকলের নিকটে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, এই দুঃখ কষ্টের সংসারে নিজ দুরদৃষ্টের কথা কিছুক্ষণ ভুলিয়া থাকিবার জন্য যদি কেহ মদ্যপান করে অথবা বেশ্যাগৃহে গমন করিয়া আপনাকে সুখী জ্ঞান করে তাহাতে আমার যে কিছুমাত্র আপত্তি নাই তাহাই নহে কিন্তু ঐরূপ করিয়া আমিও তাহাদিগের

ন্যায় ক্ষণিক সুখভাগী হইতে পারি একথা যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিব সেদিন আমিও ঐরূপ করিব, কাহারও ভয়ে পশ্চাৎপদ হইব না।

"কথা কাণে হাঁটে। আমার ঐসকল কথা নানারূপে বিকৃত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে এবং তাঁহার কলিকাতাস্থ ভক্তগণের কাছে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। কেহ কেহ আমার স্বরূপ অবস্থা নির্ণয় করিতে দেখা করিতে আসিলেন এবং যাহা রটিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, ইঙ্গিতে ইসারায় জানাইলেন। আমাকে তাহারা এতদূর হীন ভাবিতে পারেন জানিয়া আমিও দারুণ অভিমানে স্ফীত হইয়া দণ্ড পাইবার ভয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বিষম দুর্ব্বলতা একথা প্রতিপন্নপূর্ব্বক হিউম্, বেন্, মিল, কোঁতে প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক সকলের মতামত উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রচণ্ড তর্ক জুড়িয়া দিলাম। ফলে বুঝিতে পারিলাম, আমার অধঃপতন হইয়াছে, একথায় বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়া তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন। বুঝিয়া আনন্দিত হইলাম এবং ভাবিলাম ঠাকুরও হয়ত ইঁহাদের মুখে শুনিয়া ঐরূপ বিশ্বাস করিবেন। ঐরূপ ভাবিবামাত্র আবার প্রচণ্ড অভিমানে অন্তর পূর্ণ হইল। স্থির করিলাম, তা করুন, মানুষের ভাল মন্দ মতামতের যখন এতই অল্প মূল্য তখন তাহাতে আসে যায় কি? পরে শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম, ঠাকুর তাঁহাদিগের মুখে ঐকথা শুনিয়া প্রথমে হাঁ, না কিছুই বলেন নাই; পরে ভবনাথ রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে ঐকথা জানাইয়া যখন বলিয়াছিল, 'মহাশয়, নরেন্দ্রের এমন হইবে একথা স্বপ্নেরও অগোচর!' তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'চুপ্ কর্ শালারা, মা বলিয়াছেন, সে কখন ঐরূপ হইতে পারে না; আর কখন আমাকে ঐসব কথা বলিলে তোদের মুখ দেখিতে পারিব না!'

'ঐরূপে অহঙ্কারে অভিমানে নাস্তিকতার পোষণ করিলে হইবে

কি, পরক্ষণেই বাল্যকাল হইতে বিশেষতঃ, ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পরে জীবনে যে সকল অদ্ভুত অনুভূতি উপস্থিত হইয়াছিল সেই সকলের কথা উজ্জ্বল বর্ণে মনে উদয় হওয়ায় ভাবিতে থাকিতাম ঈশ্বর নিশ্চয় আছেন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার পথও নিশ্চয় আছে, নতুবা এই সংসারে প্রাণ ধারণের কোনই আবশ্যকতা নাই; দুঃখকষ্ট জীবনে যতই আসুক না কেন সেই পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং সংশয়ে চিত্ত নিরন্তর দোলায়মান হইয়া শান্তি সুদূর পরাহত হইয়া রহিল—সাংসারিক অভাবেরও হ্রাস হইল না।

"গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আসিল। এখনও পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্মের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একদিন সমস্ত দিবস উপবাসে ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাত্রে অবসন্ন পদে এবং ততোধিক অবসন্ন মনে বাটীতে ফিরিতেছি এমন সময়ে শরীরে এত ক্লান্তি অনুভব করিলাম যে, আর এক পদও অগ্রসর হইতে না পারিয়া পার্শ্বস্থ বাটীর রকে জড় পদার্থের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের জন্য চেতনার লোপ হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। এটা কিন্তু স্মরণ আছে, মনে নানা বর্ণের চিন্তা ও ছবি তখন আপনা হইতে পর পর উদয় ও লয় হইতেছিল এবং তাহাদিগকে তাড়াইয়া কোন এক চিন্তাবিশেষে মনকে আবদ্ধ রাখিব এরূপ সামর্থ্য ছিল না। সহসা উপলব্ধি করিলাম, কোন এক দৈবশক্তি প্রভাবে একের পর অন্য এইরূপে ভিতরের অনেকগুলি পর্দ্দা যেন উত্তোলিত হইল এবং শিবের সংসারে অশিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য প্রভৃতি যে সকল বিষয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এতদিন নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অনন্তর বাটী ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ এবং রজনী অবসান হইবার স্বল্পই বিলম্ব আছে।

"সংসারের প্রশংসা ও নিন্দায় এখন হইতে এককালে উদাসীন হইলাম এবং ইতর সাধারণের ন্যায় অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গের সেবা ও ভোগসুখে কালযাপন করিবার জন্য আমার জন্ম হয় নাই—এ কথায় দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া পিতামহের ন্যায় সংসারত্যাগের জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। যাইবার দিন স্থির হইলে সংবাদ পাইলাম, ঠাকুর ঐদিন কলিকাতায় জনৈক ভক্তের বাটীতে আসিতেছেন। ভাবিলাম, ভালই হইল, গুরুদর্শন করিয়া চিরকালের মত গৃহ ত্যাগ করিব। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি ধরিয়া বসিলেন, 'তোকে আজ আমার সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইবে।' নানা ওজর করিলাম, তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। অগত্যা তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। গাড়ীতে তাঁহার সহিত বিশেষ কোন কথা হইল না। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া অন্য সকলের সহিত কিছুক্ষণ তাঁহার গৃহমধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছি এমন সময়ে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। দেখিতে দেখিতে তিনি সহসা নিকটে আসিয়া আমাকে সস্নেহে ধারণপূর্ব্বক সজল নয়নে গাহিতে লাগিলেন—

কথা কহিতে ডরাই
না কহিতেও ডরাই
(আমার) মনে সন্দ হয়
বুঝি তোমায় হারাই হারাই।

অন্তরের প্রবল ভাবরাশি এতক্ষণ সযত্নে রুদ্ধ রাখিয়াছিলাম, আর বেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, ঠাকুরের ন্যায় আমারও বক্ষ নয়নধারায় প্লাবিত হইতে লাগিল। নিশ্চয় বুঝিলাম, ঠাকুর সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন! আমাদিগের ঐরূপ আচরণে অন্য সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। প্রকৃতিস্থ হইবার পরে কেহ কেহ ঠাকুরকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'আমাদের ও একটা হয়ে গেল।' পরে রাত্রে অপর সকলকে সরাইয়া আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'জানি আমি, তুমি মার কাজের জন্য আসিয়াছ, সংসারে কখনই থাকিতে পারিবে না, কিন্তু আমি যতদিন আছি

ততদিন আমার জন্য থাক!'—বলিয়াই ঠাকুর হৃদয়ের আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন!

"ঠাকুরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া পরদিন বাটীতে ফিরিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের শত চিন্তা আসিয়া অন্তর অধিকার করিল। পূর্ব্বের ন্যায় নানা চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলাম। ফলে এটর্ণির আফিসে পরিশ্রম করিয়া এবং কয়েকখানি পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতিতে সামান্য উপার্জ্জন হইয়া কোনরূপে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু স্থায়ী কোনরূপ কর্ম্ম জুটিল না এবং মাতা ও ভ্রাতাদিগের ভরণপোষণের একটা সচ্ছল বন্দোবস্তও হইয়া উঠিল না। কিছুকাল পরে মনে হইল, ঠাকুরের কথা ত ঈশ্বর শুনেন—তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া মাতা ও ভ্রাতাদিগের খাওয়া পরার কষ্ট যাহাতে দূর হয় এরূপ প্রার্থনা করাইয়া লইব, আমার জন্য ঐরূপ করিতে তিনি কখনই অস্বীকার করিবেন না। দক্ষিণেশ্বরে ছুটিলাম এবং না-ছোড়-বন্দা হইয়া ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলাম, 'মা ভাইদের আর্থিক কষ্ট নিবারণের জন্য আপনাকে মাকে জানাইতে হইবে।' ঠাকুর বলিলেন, 'ওরে আমি যে ওসব কথা বল্‌তে পারি না। তুই জানা না কেন? মাকে মানিস্ না সেই জন্যই তোর এত কষ্ট।' বলিলাম, 'আমি ত মাকে জানি না, আপনি আমার জন্য মাকে বলুন, বল্‌তেই হবে, আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না।' ঠাকুর সস্নেহে বলিলেন, 'ওরে আমি যে কতবার বলেছি, মা নরেন্দ্রের দুঃখ কষ্ট দূর কর, তুই মাকে মানিস্ না সেই জন্যই ত মা শুনে না। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি বল্‌ছি আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি মা তোকে তাই দিবেন। মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন!'

"দৃঢ় বিশ্বাস হইল, ঠাকুর যখন ঐরূপ বলিলেন তখন নিশ্চয় প্রার্থনামাত্র সকল দুঃখের অবসান হইবে। প্রবল উৎকণ্ঠায় রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে রাত্রি হইল। এক প্রহর গত

হইবার পরে ঠাকুর আমাকে শ্রীমন্দিরে যাইতে বলিলেন। যাইতে যাইতে একটা গাঢ় নেশায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম, পা টলিতে লাগিল, এবং মাকে সত্য সত্য দেখিতে ও তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিতে পাইব এইরূপ স্থির বিশ্বাসে মন অন্য সকল বিষয় ভুলিয়া বিষম একাগ্র হইয়া ঐ কথাই ভাবিতে লাগিল। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সত্য সত্যই মা চিন্ময়ী, সত্য সত্যই জীবিতা এবং অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণস্বরূপিণী। ভক্তি-প্রেমে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল, বিহ্বল হইয়া বারম্বার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, 'মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাহাতে তোমার অবাধ-দর্শন নিত্য লাভ করি এইরূপ করিয়া দাও!' শান্তিতে প্রাণ আপ্লুত হইল। জগৎ সংসার নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া একমাত্র মাই হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিলেন!

"ঠাকুরের নিকটে ফিরিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে মার নিকটে সাংসারিক অভাব দূর করিবার প্রার্থনা করিয়াছিস ত?' তাঁহার প্রশ্নে চমকিত হইয়া বলিলাম, 'না, মহাশয়, ভুলিয়া গিয়াছি! তাই ত, এখন কি করি?' তিনি বলিলেন, 'যা, যা ফের যা, গিয়ে ঐকথা জানিয়ে আয়।' পুনরায় মন্দিরে চলিলাম এবং মার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পুনরায় মোহিত হইয়া সকল কথা ভুলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণামপূর্ব্বক জ্ঞান ভক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া ফিরিলাম। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কিরে এবার বলিয়াছিস ত?' আবার চমকিত হইয়া বলিলাম, 'না মহাশয়, মাকে দেখিবামাত্র কি এক দৈবীশক্তি প্রভাবে সব কথা ভুলিয়া কেবল জ্ঞান ভক্তি লাভের কথাই বলিয়াছি! কি হবে?' ঠাকুর বলিলেন, 'দূর ছোঁড়া, আপনাকে একটু সামলাইয়া ঐ প্রার্থনাটা করিতে পারিলি না। পারিস ত আর একবার গিয়ে ঐ কথাগুলো জানিয়ে আয়, শীঘ্র যা!' পুনরায় চলিলাম কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ মাত্র দারুণ লজ্জা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। ভাবিলাম,

একি তুচ্ছ কথা মাকে বলিতে আসিয়াছি! ঠাকুর যে বলেন, রাজার প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহার নিকটে লাউ কুমড়া ভিক্ষা করা এ যে সেইরূপ নির্বুদ্ধিতা! এমন হীনবুদ্ধি আমার! লজ্জায়, ঘৃণায় পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, অন্য কিছু চাহি না মা, কেবল জ্ঞান ভক্তি দাও। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া মনে হইল ইহা নিশ্চয়ই ঠাকুরের খেলা, নতুবা তিন তিন বার মার নিকটে আসিয়াও বলা হইল না। অতঃপর তাঁহাকে ধরিয়া বসিলাম, আপনিই নিশ্চিত আমাকে ঐরূপে ভুলাইয়া দিয়াছেন, এখন আপনাকে বলিতে হইবে, আমার মা-ভাইদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব থাকিবে না। তিনি বলিলেন, 'ওরে আমি যে কাহারও জন্য ঐরূপ প্রার্থনা কখন করিতে পারি নাই, আমার মুখ দিয়া যে, উহা বাহির হয় না। তোকে বল্লুম, মার কাছে যাহা চাহিবি তাহাই পাইবি, তুই চাহিতে পারিলি না, তোর অদৃষ্টে সংসারসুখ নাই তা আমি কি করিব।' বলিলাম, 'তাহা হইবে না মহাশয়, আপনাকে আমার জন্য ঐকথা বলিতেই হইবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি বলিলেই তাহাদের আর কষ্ট থাকিবে না।' ঐরূপে যখন তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলাম না তখন তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা যা, তাদের মোটা ভাত কাপড়ের কখন অভাব হবে না।'

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল নরেন্দ্রনাথের জীবনে উহা যে একটি বিশেষ ঘটনা তাহা বলিতে হইবে না। ঈশ্বরের মাতৃভাবের এবং প্রতীক ও প্রতিমায় তাঁহাকে উপাসনা করিবার গূঢ় মর্ম্ম এতদিন তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবী মূর্ত্তি সকলকে তিনি ইতিপূর্ব্বে অবজ্ঞা ভিন্ন কখন ভক্তিভরে দর্শন করিতে পারিতেন না। এখন হইতে ঐরূপ উপাসনার সম্যক্ রহস্য তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাসিত হইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনে অধিকতর পূর্ণতা ও প্রসারতা আনয়ন করিল। ঠাকুর উহাতে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা বলিবার নহে। আমাদিগের জনৈক বন্ধু

* শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল।

ঐ ঘটনার পর দিবসে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক যাহা দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা এখানে উল্লেখ করিলে পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন।

"তারাপদ ঘোষ নামক এক ব্যক্তির সহিত এক আফিসে কর্ম্ম করায় ইতিপূর্ব্বে পরিচিত হইয়াছিলাম। তারাপদের সহিত নরেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। সেজন্য আফিসে তারাপদের নিকটে নরেন্দ্রকে ইতিপূর্ব্বে কথন কথন দেখিয়াছিলাম। তারাপদ একদিন কথায় কথায় বলিয়া-ও-ছিল পরমহংসদেব নরেন বাবুকে বিশেষ ভালবাসেন, তথাপি নরেন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করি নাই। অদ্য মধ্যাহ্নে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেখিলাম, ঠাকুর একাকী গৃহে বসিয়া আছেন এবং নরেন্দ্র এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। ঠাকুরের মুখ যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রহিয়াছে। নিকটে যাইয়া প্রণাম করিবামাত্র তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া বলিলেন, 'ওরে দ্যাখ্, ঐ ছেলেটি বড় ভাল, ওর নাম নরেন্দ্র, আগে মাকে মান্‌ত না, কাল মেনেছে। কষ্টে পড়েছে তাই মার কাছে টাকা কড়ি চাইবার কথা বলে দিয়েছিলাম, তা কিন্তু চাইতে পার্‌লে না, বলে, 'লজ্জা কর্‌লে!' মন্দির থেকে এসে আমাকে বল্‌লে মার গান শিখিয়ে দাও—'মা ত্বংহি তারা' গানটি * শিখিয়ে দিলাম। কাল সমস্ত রাত ঐ গানটা গেয়েছে! তাই এখন ঘুমুচ্চে। (আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে) নরেন্দ্র কালী মেনেছে, বেশ হয়েছে, না?' তাঁহার ঐকথা লইয়া বালকের ন্যায়

* (আমার) মা ত্বংহি তারা।
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
তোরে জানি মা ও দীন দয়াময়ী,
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা॥
তুমি জলে তুমি স্থলে, তুমিই আদ্য মূলে গো মা,
আছ সর্ব্ব ঘটে অক্ষপুটে
সাকার আকার নিরাকারা।

আনন্দ দেখিয়া বলিলাম, হাঁ, মহাশয় বেশ হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'নরেন্দ্র মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে—কেমন?' ঐরূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বারম্বার ঐকথা বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

"নিদ্রাভঙ্গে বেলা প্রায় ৪টার সময় নরেন্দ্র গৃহমধ্যে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। মনে হইল এইবার তিনি তাঁহার নিকটে বিদায়গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিবেন। ঠাকুর কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার গা ঘেঁসিয়া এক প্রকার তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, (আপনার শরীর ও নরেন্দ্রের শরীর পর পর দেখাইয়া) 'দেখ্‌ছি কি এটা আমি, আবার এটাও আমি, সত্য বল্‌ছি—কিছুই তফাৎ বুঝ্‌তে পার্‌চি না! যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে—সত্য সত্য কিন্তু ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে! বুঝ্‌তে পাচ্চ? তা মা ছাড়া আর কি আছে বল, কেমন?' ঐরূপে নানা কথা কহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তামাক খাব।' আমি ত্রাস্ত হইয়া তামাক সাজিয়া তাঁহার হুঁকাটি তাঁহাকে দিলাম। দুই এক টান টানিয়াই তিনি হুঁকাটি ফিরাইয়া দিয়া 'কল্কেতে খাব' বলিয়া কল্কেটি হাতে লইয়া টানিতে লাগিলেন। দুই চারি টান টানিয়া উহা নরেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন, 'খা, আমার হাতেই খা।' নরেন্দ্র ঐ কথায় বিষম সঙ্কুচিত হওয়ায় বলিলেন, 'তোর ত ভারি হীনবুদ্ধি! তুই আমি কি আলাহিদা? এটাও আমি, ওটাও আমি।' ঐকথা বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে তামাকু খাওয়াইয়া দিবার জন্য পুনরায় নিজ হাত দুইখানি তাঁহার মুখের সম্মুখে ধরিলেন। অগত্যা নরেন্দ্র ঠাকুরের হাতে মুখ লাগাইয়া দুই তিন

তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী
তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী
সদাশিবের মনোহরা॥

বার তামাক টানিয়া নিরস্ত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে নিরস্ত দেখিয়া স্বয়ং পুনরায় তামাকু সেবন করিতে উদ্যত হইলেন। নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মহাশয়, হাতটা ধুইয়া তামাক খান।' কিন্তু সে কথা শুনে কে? 'দূর শালা, তোর ত ভারি ভেদবুদ্ধি' এই কথা বলিয়া ঠাকুর উচ্ছিষ্ট হস্তেই তামাক টানিতে ও ভাবাবেশে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। খাদ্য দ্রব্যের অগ্রভাগ কাহাকেও দেওয়া হইলে যে ঠাকুর উহা উচ্ছিষ্টজ্ঞানে কখন খাইতে পারিতেন না, নরেন্দ্রের উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে তাঁহাকে অন্য ঐরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, নরেন্দ্রনাথকে ইনি কতদূর আপনার জ্ঞান করেন!

"কথায় কথায় রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়া গেল। তখন ঠাকুরের ভাবের উপশম দেখিয়া নরেন্দ্র ও আমি তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক পদব্রজে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। ইহার পরে কতদিন আমরা নরেন্দ্রনাথকে বলিতে শুনিয়াছি, 'একা ঠাকুরই কেবল আমাকে প্রথম দেখা হইতে সকল সময় সমভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, আর কেহই নহে—নিজের মা-ভাইরাও নহে। তাঁহার ঐরূপ বিশ্বাস ভালবাসাই আমাকে চিরকালের মত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! একা তিনিই ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন—সংসারের অন্য সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভাণ মাত্র করিয়া ফিরিয়া থাকে'।"

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

[যেমনটী দেখিয়াছি]

স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধকে কি চক্ষে দেখিতেন।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একদিন স্বামিজী বৌদ্ধদিগের প্রথম সংঘ এবং তাহার সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়া বিবাদের বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন, "তাঁহাদের কিরূপ তেজ ছিল, তোমরা কি তাহা কল্পনায়ও আনিতে পার? একজন বলিলেন, 'আনন্দই সভাপতি হইবে, কারণ, সেই তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিত।' কিন্তু আর একজন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'তাহা হইবে না। কারণ, আনন্দ তাঁহার মৃত্যুশয্যায় ক্রন্দন করার অপরাধে অপরাধী।' অমনি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অন্যব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করা হইল।"

তিনি বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু বুদ্ধ এই মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন যে, তিনি ভাবিতেন, সমগ্র জগৎকে উপনিষদের উচ্চ আদর্শে উন্নীত করা যাইতে পারে। ফলে স্বার্থপরতা আসিয়া সমস্ত নষ্ট করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহা অপেক্ষা বিজ্ঞ ছিলেন, কারণ, তিনি দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ আপোষের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আপোষ করার জন্য অবতারপুরুষও যে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, লোকে বুঝিতে না পারিয়া যে তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে—ইহা জগতের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে সঙ্ঘটিত হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধ যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য আপোষ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবদ্দশাতেই তিনি সমগ্র এসিয়ায় ঈশ্বরের ন্যায় পূজিত হইতে পারিতেন। তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন জান? তিনি শুধু বলিয়াছিলেন, 'বুদ্ধত্ব একটী উচ্চ অবস্থা মাত্র, কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে!' বাস্তবিক তিনিই জগতে একমাত্র লোক,

যাঁহার সম্পূর্ণ মাথার ঠিক ছিল—সমগ্র জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র স্থিরপ্রজ্ঞ ব্যক্তি।"

খৃষ্টান আমরা কষ্টকে পূজা করিতে ভালবাসি। স্বামিজী আমাদের ঐরূপ ভাবকে ঘৃণা করিতেন। ইহা ভারতবাসিগণের সম্যক্ চিন্তাশক্তিরই পরিচয়। পাশ্চাত্যে অনেকে তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, বুদ্ধ যদি ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মহত্ত্ব লোকের আরও অধিক হৃদয়গ্রাহী হইত! ইহাকে তিনি "রোমক নিষ্ঠুরতা" বলিয়া তীব্রভাবে নিন্দা করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন, "সর্ব্বাপেক্ষা নীচ এবং পাশব প্রকৃতির লোকেরাই একটা কিছু অসাধারণ রকমের ব্যাপারের পক্ষপাতী। সেই জন্যই জগৎ চিরকাল Epic বা মহাকাব্য ভালবাসিবে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, ভারত—'হেঁটমুণ্ডে গভীর অতলস্পর্শ গহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন' (Hurled headlong down the steep abyss) ইত্যাকার রচনার স্রষ্টা মিল্‌টনের ন্যায় কবি প্রসব করেন নাই। ঐ কাব্যের সবটার বদলে ব্রাউনিংএর দুই ছত্র কবিতা পাওয়া গেলেও লাভ।" তাঁহার মতে খৃষ্টের জীবনবৃত্তান্তের এই কাব্যোচিত ওজোগুণই রোমকদিগের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্ম যে রোমীয় জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা ঐ ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার ঘটনা হইতেই। তিনি আবার বলিলেন, "এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, পাশ্চাত্যবাসী তোমরা মস্ত মস্ত কাজ দেখিতে চাও! জীবনের প্রত্যেক সাধারণ ক্ষুদ্র ঘটনাটীর কবিত্ব তোমরা এখনও বুঝিতে পার না। অল্পবয়স্ক মাতার মৃতপুত্র ক্রোড়ে বুদ্ধের নিকট আগমন,—ইহার সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা আর কি কোন সৌন্দর্য্য অধিক হইতে পারে? অথবা, ছাগদিগের জীবন-রক্ষার গল্পটী? তোমরা জান যে, মহাভিনিষ্ক্রমণ ব্যাপারটী ভারতে নূতন জিনিস ছিল না। গৌতম এক সামান্য রাজার পুত্র ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে অনেকবার লোকে ঐরূপ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু নির্ব্বাণের পর, আহা দেখ কি কবিত্ব!

"রাত্রিকাল, অনবরত বৃষ্টি পড়িতেছে। তিনি এক গোপের কুটীরে আগমন করিয়া ছাঁচের নীচে দেওয়ালের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলেন। ছাঁচ হইতে বৃষ্টির জল ঝরিতেছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে এবং বায়ুও প্রবলতর হইতেছে।

"ভিতরে গোপ জানালা দিয়া চকিতের মত একখানি মুখ দেখিতে পাইল, এবং মনে মনে* বলিল, 'বা, বা, গেরুয়াধারী! থাক ঐখানে! তোমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট!' তার পর সে গান ধরিল—

'আমার গরুবাছুর ঘরে উঠিয়াছে, আগুনও খুব জ্বলিতেছে আমার স্ত্রী নিরাপদ, ছেলেমেয়েরাও সুখে নিদ্রা যাইতেছে! সুতরাং মেঘসকল, আজ রাত্রে তোমরা স্বচ্ছন্দে বর্ষণ করিতে পার।'

"বুদ্ধ বাহির হইতে উত্তর দিতেছেন, 'আমার মন সংযত, ইন্দ্রিয় সকল প্রত্যাহৃত; আমার হৃদয় দৃঢ়। সুতরাং মেঘসকল, আজ রাত্রে তোমরা স্বচ্ছন্দে বর্ষণ করিতে পার!'

"গোপ আবার গাইল, 'ক্ষেতে ফসল কাটা হইয়া গিয়াছে, ঘাসগুলিও খামারে ভাল করিয়া রাখা আছে; নদীতে যথেষ্ট জল আছে, এবং রাস্তাগুলিও বেশ শক্ত। সুতরাং মেঘ সকল, আজ রাত্রে তোমরা স্বচ্ছন্দে বর্ষণ করিতে পার!'

"এইরূপে খানিকক্ষণ চলিতে লাগিল, অবশেষে গোপ বিস্মিত ও অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

"অথবা ক্ষৌরকার উপালির † গল্পটীর অপেক্ষা আর কিছু অধিক সুন্দর আছে কি?

---

* স্বামিজী এখানে সুত্তনিপাতান্তর্গত ধনিয়া সুত্তের Rhys David কৃত পদ্যানুবাদের ভাবার্থটী স্মৃতি হইতে আবৃত্তি করিতেছিলেন। Rhys David এর আমেরিকা বক্তৃতাগুলি দ্রষ্টব্য।

† এই 'উপালিপৃচ্ছা' নামক গল্পটী প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে যে আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অধুনা লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ একটী রচনা যে ছিল, তাহা 'বিনয় পিটক' প্রভৃতি অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থে উহার উল্লেখ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়।

'ভগবান্ আমার বাটীর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন।
আমি ক্ষৌরকার, আমারও বাটীর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন!
'আমি দৌড়িলাম, কিন্তু তিনি নিজেই ফিরিলেন এবং আমার
জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।
আমি ক্ষৌরকার, আমারও জন্য অপেক্ষা করিলেন!
'আমি বলিলাম, —প্রভু, তোমার সহিত কথা কহিতে পারি কি?
তিনি বলিলেন, হাঁ।
আমি ক্ষৌরকার, আমাকেও 'হাঁ' বলিলেন।
'আমি বলিলাম—নির্ব্বাণ আমার মত লোকদের জন্য কি?
তিনি বলিলেন, হাঁ।
আমি ক্ষৌরকার আমার জন্যও!
'আমি বলিলাম—আমি তোমার পিছু পিছু যাইতে পারি কি?
তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই!
আমি ক্ষৌরকার, আমাকেও!
'আমি বলিলাম—প্রভু, আমি তোমার নিকট থাকিতে পারি কি?
তিনি বলিলেন, পার।
আমি দরিদ্র ক্ষৌরকার, আমাকেও!' "

একদিন স্বামিজী বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস সংক্ষেপে এইভাবে বলিতেছেন যে, উহার তিনটী যুগ আছে—পাঁচশত বৎসর বুদ্ধোক্ত বিধিসমূহের যুগ, পাঁচশত বৎসর প্রতিমাপূজার যুগ, এবং পাঁচশত বৎসর তন্ত্রের যুগ। বলিতে বলিতে তিনি সহসা সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "কখনও মনে করিও না যে, ভারতে কোন কালে বৌদ্ধধর্ম্ম নামে একটী পৃথক ধর্ম্ম ছিল, আর তাহার নিজস্ব মন্দির ও পুরোহিতাদি বর্ত্তমান ছিল! মোটেই নয়। বৌদ্ধধর্ম্ম চিরকাল হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেবল এক সময়ে বুদ্ধের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহারই ফলে সমগ্র জাতিটী সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করিয়াছিল।" আমার মনে হয়, পণ্ডিতগণের নিকট স্বামিজীর উক্ত মতের সত্যতা আরও প্রতিপন্ন হইতে এখনও

বহু সময় ও অধ্যয়নের আবশ্যক হইবে। এই মতানুসারে বৌদ্ধধর্ম্ম যে সকল দেশ, প্রচারক প্রেরণ দ্বারা জয় করিয়াছিল, কেবল সেই দেশগুলিতেই সম্পূর্ণ নিজস্ব মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কাশ্মীর এই সকল দেশের অন্যতম। স্বামিজী এই সম্বন্ধে এই মনোহর ইতিহাসটুকুর বর্ণনা করিলেন,—ঐ দেশে ভারতীয় মহাপুরুষগণ ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপে পরিগৃহীত হইলেন। ফলে স্থানীয় নাগগণ (অর্থাৎ লোকে পুণ্যতোয় কুণ্ডগুলির অভ্যন্তরে যে সকল অদ্ভুতক্ষমতাশালী সর্পের অস্তিত্ব কল্পনা করিত) তাহাদের দেবত্ব পদবী হইতে বিচ্যুত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, উহাদের বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে, লোকে পুরাতন সংস্কারগুলিকে ত্যাগ করিয়া, অথচ নূতনগুলিকে ঠিক ঠিক ভাবে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া এক মহা সঙ্কটে পড়িল, এবং ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি পুরাতন কুসংস্কার ও নূতন সত্য এই দুইয়ের মাঝামাঝি একটা আপোষ করিয়া লইল। তাহারই ফলে নাগগণ নূতন ধর্ম্মের ঋষি বা গৌণ দেবতারূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। মানুষ যে এইরূপ করিযাই থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত অন্যত্র বিরল নহে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও তাহার প্রসূতি হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে একটী প্রধান পার্থক্য এই যে, হিন্দুরা একই আত্মার পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর পরিগ্রহ দ্বারা কর্ম্মসঞ্চয়ে বিশ্বাস করেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা দেয় যে, এই আপাতপ্রতীয়মান একত্ব মায়া মাত্র, এবং ক্ষণিক। বৌদ্ধেরা বলেন যে, আমরা এ জীবনে যে কর্ম্ম সঞ্চিত রাখিয়া যাই, তাহা অপর এক আত্মা প্রাপ্ত হয়, এবং আমাদের ঐ অভিজ্ঞতা লইয়া নূতন কর্ম্মবীজ বপনে অগ্রসর হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বী মতদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টীতে কতটা সত্য নিহিত আছে, তৎসম্বন্ধে স্বামিজী অনেক সময় বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেন। তাঁহার মত, যাঁহাদের নিকট মহান্ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাঁহারা,—আর যাঁহারা কেবল উহার ছায়াংশে বাস করিয়াছেন, কতক পরিমাণে তাঁহারাও—দেখেন যে আত্মার শরীরে অবস্থিতি একটা চির-যন্ত্রণাদায়ী

বন্ধন। পিঞ্জরাবদ্ধ আত্মা শরীররূপ কারাগারের শলাকাসমূহে বিদ্রোহীর ন্যায় ক্রমাগত পক্ষদ্বারা আঘাত করিতে থাকে; উহা শরীরের বহির্দ্দেশে এবং পারে সেই শুদ্ধ, চৈতন্যময়, ভাবঘন, সদানন্দ, পরম জ্যোতির্ম্ময় ধাম দেখিতে পায়; উহাই তাহার আদর্শ এবং গন্তব্য স্থল। এই সকল ব্যক্তির নিকট শরীর, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার সহায় হওয়া দূরে থাকুক, বরং একটা আবরণ বা প্রাচীরস্বরূপ। সুখ দুঃখ সেই আদি জ্যোতিই—শুধু উহা ব্যষ্টিচৈতন্য-রূপ পরকলার মধ্য দিয়া আসিতেছে। লোকের একমাত্র কামনা হওয়া উচিত—উহাদের উভয়ের অতীত হইয়া সেই শুদ্ধ, অখণ্ড জ্যোতিস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা।

আচার্য্যদেব প্রচলিত ধারণাসমূহ সহিতে না পারিয়া যে সকল মত প্রকাশ করিতেন, তাহাতে মাঝে মাঝে এইরূপ ভাবপরম্পরাই লক্ষিত হইত। যেমন, একদিন তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! একজন্ম শরীর ধারণ করাই যেন লক্ষ লক্ষ বৎসর কারাবাস বলিয়া মনে হয়, লোকে আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে চাহে! এক এক দিনের ভাবনা দুশ্চিন্তাই সেই দিনকার পক্ষে যথেষ্ট, আর অন্যদিনের ভাবনায় কাজ নাই!" তথাপি একই দীর্ঘ, শৃঙ্খলিত অভিজ্ঞতা পরম্পরায় বিভিন্ন ব্যক্তি-গণের মধ্যে কাহার সহিত কাহার কতটা সম্বন্ধ—এই প্রশ্নটী তাঁহার সকল সময়েই চিত্তাকর্ষক হইত। পুনর্জ্জন্মবাদকে তিনি কখনও অবিসংবাদী সত্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। তাঁহার নিজের কাছে উহা একটী বিজ্ঞানসম্মত অনুমান মাত্র, তবে উহাতে মনের খুব সন্দেহ ভঞ্জন হয়। আমাদের পাশ্চাত্যদেশে, ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি হইতেই সকল জ্ঞানের উৎপত্তি—শিক্ষাসম্বন্ধে এই যে এক মত আছে, তাহার প্রতিকূলে স্বামিজী সর্ব্বদাই জন্মান্তরবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন এবং নিজ পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য দেখাইয়া দিতেন যে, পাশ্চাত্যকথিত এই জ্ঞানোন্মেষ প্রায়ই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সুদূর অতীত জীবনে ঘটে বলিয়া আর উহাকে লক্ষ্য করিতে পারা যায় না।

তথাপি উভয় পক্ষের সব বক্তব্য শেষ হইলেও, বৌদ্ধধর্ম্ম অবশেষে দার্শনিক হিসাবে যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে কিনা, এ প্রশ্ন বিচারাধীনই রহিয়া যায়। একই আত্মা পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে, অথচ উহা সেই একই রহিয়া যাইতেছে—এই সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু ধারণা, সমস্তই ভ্রান্তিমূলক নহে কি ? এবং পরিশেষে উহা 'একই সৎ, বহু অসৎ'- এই চরম অনুভূতির নিকট পরাভূত হয় না কি ? একদিন তিনি দীর্ঘকাল একাকী চিন্তা করিয়া পরিশেষে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "নিশ্চয়ই বৌদ্ধধর্ম্ম ঠিক বলিতেছে ! পুনর্জ্জন্ম মরীচিকা মাত্র। কিন্তু এই অনুভূতি কেবল অদ্বৈতমার্গেই লাভ হইতে পারে !"

এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের অপূর্ণতাটুকু দূর করিবার জন্য অদ্বৈতবাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, স্বামিজী যেন বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধাইয়া কৌতুক দেখিতে ভালবাসিতেন। হয়ত, ইহাতে ইতিহাসের দুইটী বিভিন্ন যুগের সম্মিলন সাধিত হয় বলিয়া তিনি উহাতে এত প্রীতি অনুভব করিতেন ; কারণ, উক্ত মতদ্বয়ের মধ্যে একটী অপরটীর সাহায্য ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়—ইহাই ইতিপূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইল। মনুষ্যত্বের চরম বিকাশের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ করিতে তিনি সর্ব্বদাই "বুদ্ধের হৃদয় এবং শঙ্করাচার্য্যের মনীষা"—এই কথা কয়টীর প্রয়োগ করিতেন। বৌদ্ধ কর্ম্মবাদের বিরুদ্ধে জনৈক পাশ্চাত্য রমণীর যুক্তিসমূহ তিনি ঐরূপ ভাবেই শ্রবণ করিয়াছিলেন। উক্ত মত গ্রহণ করিলে যে সঙ্গে সঙ্গে একটা অসাধারণ সামাজিক দায়িত্ববোধ* আসিয়া থাকে, সে কথা এই রমণী ধরিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, "যে স্থলে আমার কৃত সৎকর্ম্মের ফল আমি ভোগ করিতে পাইব না, অন্যে করিবে,

* যদি আমরা ভাবি যে, আমাদের দুষ্কৃতসমূহের ফলভোগ আমরা না করিয়া অপরে করিবে, তাহা হইলে আমাদের সৎকর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তিটী আরও দৃঢ়ীভূত হয়। অপরের সম্পত্তি বা সন্তানসন্ততি রক্ষার জন্য আমরা যে অধিক দায়িত্ববোধ করিয়া থাকি, তাহাও এই জাতীয়।

সে স্থলে কেন আমি আদৌ সেরূপ কর্ম্ম করিতে যাইব, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না!"

স্বামিজী নিজে এরূপ ভাবে চিন্তা করিতে একান্ত অশক্ত হইলেও উক্ত মন্তব্য তাঁহার খুব মনে লাগিল, এবং তিনি দুই এক দিন পরে সমীপস্থ এক ব্যক্তিকে বলিলেন, "সে দিন যে কথাটী উত্থাপিত হইয়াছে, সেটী বড় চমৎকার কথা,—অর্থাৎ পরোপকার করিবার কোনই কারণ থাকে না, যদি যাহাদের উদ্দেশে উহা করা হয় তাহারা না হইয়া অপরে উহার ফলভোগী হয়!"

যাঁহাকে স্বামিজী কথাগুলি বলিলেন, তিনি অশিষ্টের মত উত্তর দিলেন, "কিন্তু উহা লইয়া ত তর্ক হয় নাই! কথাটী এই ছিল যে, আমি ছাড়া অপর কেহ আমার কৃতকর্ম্মের ফলভোগী হইবে!"

স্বামিজী ধীরভাবে উত্তর দিলেন, "আমি তাহা জানি, কিন্তু আমাদের পরিচিতা রমণী যদি ঐ ভাবে কথাটী উঠাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার মতটী আরও যুক্তিযুক্ত হইত। ধর, তিনি ঐ ভাবেই প্রশ্নটী করিয়াছেন—অর্থাৎ আমরা কাহারও উদ্দেশে সেবা করিয়া বঞ্চিতই হইয়া থাকি, কারণ, ঐ সেবা তাহাদিগের নিকট পৌঁছায় না। দেখিতেছ না, উহার একটী মাত্র উত্তর আছে, তাহা অদ্বৈতবাদ! কারণ, আমরা সকলেই এক!"

তিনি কি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মধ্যযুগের ও বর্ত্তমান কালের হিন্দুমনের মধ্যে এইটীই প্রভেদ যে, ভারতের আধুনিক ধারণায় বৌদ্ধধর্ম্ম ও বুদ্ধের জন্য স্থান থাকিবেই? তিনি কি ভাবিয়াছিলেন যে, যে রামায়ণ ও মহাভারত গুপ্তরাজগণের সময় হইতে ভারতীয় শিক্ষার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে, তাহার সহিত অতঃপর সাধারণ লোকে অশোকের ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ইতিহাসও জুড়িয়া দিবে? এসিয়ার পক্ষে এরূপ একটী সমন্বয়ের অর্থ কতদূর ব্যাপক, উহাতে হিন্দুধর্ম্মের মধ্য হইতে কি নব জীবন বৌদ্ধ দেশসমূহে সঞ্চারিত হইবে, আবার জননীস্বরূপ হিন্দুধর্ম্ম আপনাকে চিনিতে পারিয়া কন্যাস্থানীয় বৌদ্ধ জাতিসমূহকে

জ্ঞানামৃতদানে তৃপ্ত করিলে স্বয়ং ভারতও কত বলবীর্য্য লাভ করিবেন—এ সকল কথা তিনি ভাবিয়াছিলেন কি? ভাবিয়া থাকুন আর নাই থাকুন, আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, এই দুইটী ধর্ম্মের দৃঢ় সম্মিলনভূমি তিনি হিন্দুধর্ম্মের ভিতরেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, জননীই (হিন্দুধর্ম্ম) সর্ব্বমত-সমঞ্জসা; কন্যা (বৌদ্ধধর্ম্ম) নহেন। তিনি মহীয়সী ও প্রেমময়ী জননী, তাই তিনি চিরকালের জন্য তাঁহার অবতারগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা বীরহৃদয়, মহামহিম বুদ্ধাবতারকে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। তিনি তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়সমূহকে স্থান দান করিয়াছেন, তাঁহার শিক্ষা বুঝিতে পারেন ও উহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণকে মাতার ন্যায় স্নেহ করেন, এবং তিনি যে সকল নবজাত সন্তান তাঁহার পাদমূলে আনিয়া দিয়াছেন, তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ও তাহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ করেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম কখনও বলিবেন না যে, বুদ্ধ সত্যকে যে আকারে প্রচার করিয়াছেন, তাহার বাহিরে আর সত্য নাই; কখনও বলিবেন না যে, শুধু সন্ন্যাসীর নিয়মের মধ্য দিয়াই মুক্তি লাভ হয়; অথবা চরম পূর্ণতালাভের মাত্র একটী পথ আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামিজীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উক্তি সম্ভবতঃ এইটী :—

বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, বৌদ্ধধর্ম্ম বলেন, 'যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই মায়া বলিয়া জানিও!' আর হিন্দুধর্ম্ম বলেন, 'জানিও যে মায়ার অন্তরালে সেই সত্য বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছেন।' কি করিয়া এই অনুভূতি লাভ করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্ম কোন ধরাবাঁধা নিয়ম করিয়া দেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের আদেশ শুধু সন্ন্যাসমার্গের দ্বারাই পালন করা চলে; হিন্দুধর্ম্মের আদেশ জীবনের সকল অবস্থায় পালিত হইতে পারে। হিন্দুধর্ম্ম বলেন যে, সকল মতই সেই অদ্বিতীয় সত্যে উপনীত হইবার এক একটী পথ। হিন্দুধর্ম্মের এক অতি উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা এক ব্যাধের (ধর্ম্মব্যাধ) মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে।

ব্যাধ এক পতিব্রতা রমণীর নিদেশক্রমে এক সন্ন্যাসীর নিকট ঐ ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছিলেন (ব্যাধগীতা)। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম এক সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম সন্ন্যাসাশ্রমের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেও, চিরকাল নিষ্ঠাপূর্ব্বক দৈনন্দিন কর্ত্তব্য পালনকেই—তা যাহার যেরূপ হউক না কেন—ঈশ্বরলাভের পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছে।"

(ক্রমশঃ)

তন্ত্রে শ্রীগুরুতত্ত্ব।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়)

গুরু বা আচার্য্যের উপাসনা ভারতে অতিপ্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত—এমন কি, বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগেও উহার প্রচলনের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীনতম উপনিষদ্‌সমূহে যদিও সকল স্থানে "গুরুই সাক্ষাৎ ভগবান্" এরূপ ভাবের ততটা স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তথাপি শিষ্যগণ যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত গুরুর সেবা করিতেন দেখিতে পাই, তাহাতে গুরুর ব্রহ্মত্বে বিশ্বাস—গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে পূর্ব্বাবধিই প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। তৎকালেও আচার্য্য-সেবাই জ্ঞানলাভের প্রধান সাধন ছিল। যে শিষ্য যতটা নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত গুরুর সেবা করিত তাহার অন্তর্নিহিত জ্ঞান ততটা ফুটিয়া উঠিত। তাই শ্রুতি বলিতেছেন,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং" অর্থাৎ তাহার (ব্রহ্মের) প্রত্যক্ষানুভূতিলাভের জন্য সে (শিষ্য) সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবে; "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" অর্থাৎ যে পুরুষের আচার্য্য আছে তিনিই জ্ঞান লাভ করেন; "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।"

অর্থাৎ যাঁহার দেবে (ঈশ্বরে) পরম ভক্তি আছে এবং ঈশ্বরে যেমন গুরুতেও তেমনি ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটেই শ্রুতিমন্ত্র-সমূহের অভ্যন্তরস্থ সত্যসকল প্রকাশিত হয়।

উপনিষদের অনুসরণ করিয়া শ্রীভগবানও গীতায় বলিতেছেন, "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" জ্ঞানের সাধন বলিতে গিয়া আবার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন—"আচার্য্যোপাসনং" ইত্যাদি। সপ্তদশ অধ্যায়ে শারীরতপস্যার কথা বলিতে গিয়া বলিতেছেন—"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং" ইত্যাদি। অবশেষে সমগ্র গীতাশাস্ত্রের উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—"ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং" অর্থাৎ গুরুসেবাহীন ব্যক্তিকে গীতা বলিবে না। ভাগবতাদি পুরাণ সমূহেও গুরুভক্তি সম্বন্ধে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দেখিতে পাই। ফলতঃ, শ্রুতি এবং তদনুবর্ত্তী হইয়া স্মৃতিও উচ্চকণ্ঠে একতানে আচার্য্যোপাসনার মহিমা প্রচার করিতেছেন। তন্ত্রও এ ক্ষেত্রে শ্রুতিরই সম্যক্ অনুবর্ত্তন করিতেছেন। শ্রুতিতে যে ভাবের অঙ্কুর দেখিতে পাই, পুরাণাদিতে ক্রমবিকশিত হইয়া তন্ত্রে তাহাই যেন মহান্ বৃক্ষরূপে পরিণত। শ্রুতিতে আচার্য্যোপাসনা সম্বন্ধে সূত্রাকারে যে উপদেশ নিবদ্ধ আছে, তন্ত্র যেন তাহারই বিস্তৃত ভাষ্য করিয়াছেন মাত্র। মহাভারতের সম্বন্ধে সাধারণতঃ একটা কথা আছে যে—"যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।" শ্রুতির সম্বন্ধেও এই কথাটী বেশ খাটে এবং আমরা বলিতে পারি যে, যাহা শ্রুতিতে নাই তাহা ভারতীয় ধর্ম্মে নাই। শুধু তাই বা বলি কেন?—জগতের কোন ধর্ম্মেই নাই। সুতরাং ভারতে প্রচলিত প্রত্যেক ধর্ম্মভাবেরই বীজ আমরা শ্রুতিতে দেখিতে পাইব, ইহা নিঃসন্দেহ। গুরুর ব্রহ্মত্বে বিশ্বাস সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ", "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। কিন্তু পরবর্ত্তী পুরাণতন্ত্রাদির ন্যায় শ্রুতিতে বিশেষরূপে ও বিস্তৃতভাবে শ্রীগুরুর মহিমা লিপিবদ্ধ দেখা যায় না। ইহার কারণ কি?

ইহার একাধিক কারণ থাকিতে পারে। এক কারণ হইতে পারে যে, শ্রুতি ত সাধারণ ভাবেই ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিতেছেন—"তত্ত্বমসি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম", "একো দেবঃ সর্ব্ব ভূতেষু গূঢ়ঃ", "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং গুরু যে ব্রহ্ম তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার কি প্রয়োজন? সব বিশেষ উপদেশই ত ঐ সাধারণ উপদেশেরই অন্তর্ভুক্ত? ঐ সাধারণ উপদেশ-সমূহকে ভিত্তি করিয়া যাহার যে ব্যক্তি বা বস্তু ভাল লাগে, সে প্রথমে তাহাতেই ব্রহ্মবুদ্ধি দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতে পারে এবং উহাতে সফলপ্রযত্ন হইলেই তাহার সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের চক্ষু খুলিয়া যাইবে। তবে কথা এই যে, এই কামকাঞ্চনসংস্পর্শকলুষিত সংসারে কেবল শ্রীগুরুর প্রতিই কামকাঞ্চনগন্ধহীন বিশুদ্ধ ভালবাসা হওয়া সম্ভব। আর সে ভালবাসা না হইলে ভগবৎপ্রেমের স্বর্গীয় ভাব জীবের মলিন মনবুদ্ধির অনধিগম্য। তাই শাস্ত্রকারগণ গুরুপ্রতীক অবলম্বনে অগ্রসর হইবার জন্য সাধকমাত্রকেই উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রুতিতে শ্রীগুরুর মহিমা পুরাণতন্ত্রাদির ন্যায় বিশদভাবে লিপিবদ্ধ না থাকার আরও এক কারণ হইতে পারে যে, বৈদিকযুগে জীবন্মুক্ত বা সিদ্ধ ঋষিকুলের অভ্যুদয় হইলেও অবতারশ্রেণীর মহাপুরুষগণের আবির্ভাব পৌরাণিক যুগেই হইয়াছিল। সকলের মধ্যেই ব্রহ্মত্ব অন্তর্নিহিত আছে এ বিশ্বাস পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত থাকিলেও এই সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত-পরিমিত মানবদেহের মধ্যেই যে অনন্ত ভগবচ্ছক্তির পূর্ণাভি-ব্যক্তি হইতে পারে তাহা তাঁহাদিগকে দেখিয়াই ভারত শিখিয়াছে। তাঁহাদের অতিমানুষ কার্য্যকলাপ দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াই ভারত "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" বলিয়া শ্রীগুরুর স্তব করিয়াছে। ফলতঃ, অবতার-গুরুর অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্যকলাপ ও লীলাসমূহ দেখিয়াই যেন পুরাণতন্ত্রাদি শ্রীগুরুর মহিমাকীর্ত্তনে শতমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরে সেই অবতার-গুরুর শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরাক্রমে সকলের মধ্যেই

সেই আদি শ্রীগুরুর সঞ্চারিত গুরুশক্তি বিদ্যমান আছে ভাবিয়া সকল গুরুতেই পূর্ণব্রহ্মবোধ আনয়নের উপদেশ দিয়াছেন।

এখন গুরুর স্বরূপ সম্বন্ধে তন্ত্র কি বলেন তাহা দেখা যাউক। নিম্নে আমরা তন্ত্রশাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেনঃ—

"যঃ শিবঃ সর্ব্বগঃ সূক্ষ্মো নিষ্কলশ্চোন্মনাব্যয়ঃ।
ব্যোমাকারো হ্যজোঽনন্তঃ স কথং পূজ্যতে প্রিয়ে॥
অতএব গুরুঃ সাক্ষাৎ গুরুরূপং সমাশ্রিতঃ।
ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্দেবি! ভুক্তিং মুক্তিং প্রযচ্ছতি॥
শিবোঽহমাকৃতির্দ্দেবি নর দৃগ গোচরা ন হি।
তস্মাৎ শ্রীগুরুরূপেণ শিষ্যান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥
মনুষ্যচর্ম্মণা নদ্ধঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ং।
স্বশিষ্যানুগ্রহার্থায় গূঢ়ং পর্য্যটতি ক্ষিতৌ॥

* * *

সদাশিবস্য দেবস্য শ্রীগুরোরপি পার্ব্বতি।
উভয়োরন্তরং নাস্তি যঃ করোতি স পাতকী॥

* * *

শিবরূপং সমাস্থায় পূজাং গৃহ্ণামি পার্ব্বতি।
গুরুরূপং সমাদায় ভবপাশং নিকৃন্তয়ে॥"

অর্থাৎ হে প্রিয়ে! যে শিব সর্ব্বব্যাপী, আবার যিনি সূক্ষ্ম অর্থাৎ অণু হইতেও অণু, যাঁহার কণা অর্থাৎ অংশ নাই, যিনি মনোরাজ্যের ঊর্দ্ধে, যিনি অব্যয়, যিনি আকাশতত্বের মত (সর্ব্বত্রই অনুস্যূত আছেন অথচ ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করিবার যো নাই), যিনি অজ ও অনন্ত সেই নির্গুণ পুরুষকে কি ভাবে পূজা করা যায়? তাই (জীবের পূজা গ্রহণ করিয়া জীবকে ধন্য করিবার জন্য) সেই চরাচর গুরুই মনুষ্য গুরুরূপ আশ্রয় করিয়াছেন। হে দেবি! তাঁহাকে ভক্তির সহিত সম্যক্ পূজা করিবে। (পূজিত হইয়া তিনি) ভোগ মোক্ষ (যার যেরূপ মানসিক অবস্থা তদনুসারে) দান করেন। হে দেবি!

আমি শিব, আমার মূর্ত্তি জীবের নয়নগোচর নহে। তজ্জন্য আমি সর্ব্বদা শ্রীগুরুরূপে শিষ্যদিগকে (দর্শন দিয়া) রক্ষা করি। স্বীয় শিষ্যগণকে অনুগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ পরমশিব অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম মনুষ্যচর্ম্মে আবৃত হইয়া গুপ্তভাবে (সাধারণ জীবের রাক্ষসী ও আসুরী জ্ঞানের অতীত থাকিয়া) পৃথিবীতে পর্য্যটন করেন। হে পার্ব্বতি! সদাশিব এবং শ্রীগুরু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ নাই—যে ভিন্ন জ্ঞান করে সে পাতকী। হে পার্ব্বতি! আমি শিবরূপে সংস্থিত হইয়া পূজা গ্রহণ করি (ধ্যানভজনাদি সাধনের বিষয় হই), আর গুরুরূপ গ্রহণ করিয়া (সাধকের) ভবপাশ ছেদন করি।

তন্ত্র হইতে এইরূপ আরও অসংখ্য শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু এ সঙ্কীর্ণ স্থানে তাহা সম্ভবপর নহে। অথচ ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্র এ সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা পৃথক ভাবে দেখিবারও প্রয়োজন নাই—মূল ভাবটী দেখিলেই হইল। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে আমরা দেখিলাম গুরুদেহ ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি! সাধককে মায়ার পর পারে লইয়া যাইবার জন্য তিনিই শ্রীগুরুরূপে আগমন করেন। নতুবা ক্ষুদ্র মানুষের কি সাধ্য যে জীবের ভববন্ধন মোচন করে? তাঁহার তত্ত্ব তিনি না জানাইলে কাহার সাধ্য তাহা জানে? তাই সেই ইষ্ট-দেবই লীলায় শ্রীগুরুরূপ ধারণ করিয়া, শিষ্যকে তাঁহার স্বরূপাভিমুখে অগ্রসর করিতে থাকেন। সাধনরাজ্যের সোপানের পর সোপান অতিক্রম করিতে করিতে শিষ্য যখন শ্রীগুরুর করুণাবলে ইষ্টমূর্ত্তির সম্মুখীন হয় তখনই গুরু ইষ্টে লীন হইয়া যান—শিষ্যের নিকট তখন গুরু আর ইষ্ট দুটী জিনিষ থাকে না, এক হইয়া যায়। তখন গুরুকে আর গুরুরূপে দেখা যায় না, গুরুতেই তখন ইষ্ট দর্শন হয়. সুধু গুরুতেই বা বলি কেন, সর্ব্বত্রই যে তখন ইষ্টদর্শন হয়—"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" তখনই "নৈব গুরুর্নশিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ" শিবোঽহং শিবোঽহং" এ বাক্যের সার্থকতা হয়। কিন্তু সে অদ্বৈতাবস্থা লাভের পূর্ব্বে "অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ" এই উপদেশের অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

তন্ত্রশাস্ত্রে শ্রীগুরুরস্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা আর একটী বিশেষত্ব দেখিতে পাই যে, সকল গুরুই এক—তোমার গুরু, আমার গুরু, তাঁহার গুরু—পরস্পর ভিন্ন নহেন। পার্থিবদেহে তোমার গুরু, আমার গুরু পরস্পর ভিন্ন হইতে পারেন। কিন্তু গুরুতত্ত্বের স্বরূপে সকলেই অভিন্ন। তজ্জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন, "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।" অর্থাৎ আমার নাথই জগতের নাথ, আমার গুরুই জগতের গুরু। যোগিনীতন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই, মহাদেব বলিতেছেন :—

আদিনাথো মহাদেব মহাকালো হি যঃ স্মৃতঃ।
গুরুঃ স এব দেবশি সর্ব্বমন্ত্রেষু নাপরঃ॥
মন্ত্র প্রদানকালে হি মানুষে নগনন্দিন।
অধিষ্ঠানং ভবেত্তস্য মহাকালস্য শঙ্করি॥
অতস্তু গুরুতাদেব মানুষে নাত্র সংশয়ঃ।
মন্ত্রদাতা শিরঃপদ্মে যদ্‌ধ্যানং কুরুতে গুরোঃ॥
তদ্‌ধ্যানং কুরুতে দেবি শিষ্যোহপি শীর্ষপঙ্কজে।
অতএব মহেশানি এক এব গুরুঃ স্মৃতঃ॥
অধিষ্ঠানং ভবেত্তস্য মানুষেষু মহেশ্বরি।
মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতং তস্য সর্ব্বশাস্ত্রেষু শঙ্করি॥"

অর্থাৎ—হে মহাদেবি! যিনি আদিনাথ মহাকাল, হে দেবেশি, সর্ব্বমন্ত্রে তিনিই গুরু—অন্য কেহ নহেন। নগনন্দিনি! শিষ্যকে মন্ত্র প্রদান কালে মানবের দেহে সেই মহাকালের অধিষ্ঠান হয়। শঙ্করি! তজ্জন্যই মানবের গুরুত্ব ইহা নিঃসংশয়। দেবি! মন্ত্রদাতা নিজ শিরঃপদ্মে গুরুর যাদৃশ মূর্ত্তি ধ্যান করেন, শিষ্যও নিজ শীর্ষপঙ্কজে গুরুর সেই স্বরূপই ধ্যান করেন। অতএব, হে মহেশ্বরি, গুরু শিষ্য উভয়ের নিকটেই গুরুপদার্থ এক। শঙ্করি! মনুষ্য গুরুর দেহে সেই পরমগুরুর অধিষ্ঠান হয়—এই জন্যই সর্ব্বশাস্ত্রে সেই গুরুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। আরও বলিয়াছেন—"মুক্তির্ন জায়তে দেবি মানুষে গুরুভাবনাৎ।

এই উদ্ধৃত শ্লোকানুসারে সকল গুরুর একত্ব প্রতিপাদন করিতে যাইয়া তন্ত্র শ্বেতপদ্মাসীন শ্বেতমাল্যাম্বরধারী গুরুর একটী বিশেষ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। তুমি আমি ভিন্ন ভিন্ন মানব গুরুর শিষ্য হইলেও গুরুমূর্ত্তি ধ্যান করিতে গেলে ঐ এক মূর্ত্তিই তোমার আমার এবং সকলেরই ধ্যান করিতে হইবে। যাহাতে লোকে গুরুর জড় দেহটার প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহার চিন্ময় স্বরূপ ভুলিয়া না যায় এই সদুদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই তান্ত্রিক আচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন গুরুর শিষ্য সকলের জন্য গুরুর এক প্রকার ধ্যানই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু এতটা সাবধানতা অবলম্বন না করিলেও চলিত। কারণ, সবই ত সেই অনন্ত ব্রহ্মের এক একটী রূপ মাত্র। সুতরাং নিজের গুরুর মূর্ত্তিটীকেই ঠিক ঈশ্বরমূর্ত্তি ভাবিয়া ধ্যান করিলে এমন কি দোষের বিষয় হইতে পারে? মন লইয়া কথা। আমি যদি ঈশ্বরভাব ঠিক রাখি তবে যেখানে ইচ্ছা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি। আমি যদি মনে রাখি যে, আমার গুরুমূর্ত্তিটীও অনন্তরূপী শ্রীভগবানের একটী রূপ, আমাকে কৃপা করিবার জন্য তিনি ঐরূপে অবতীর্ণ—তাহা হইলেও ত একত্বের কিছুমাত্র বাধা হয় না। যেহেতু, কারণ-স্বরূপে ত সকলেই এক। উপনিষদ্ তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।" "অগ্নি র্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টঃ রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥" গুরুর পার্থিব মূর্ত্তিটীর ধ্যান করায় আরও সুবিধা এই যে, উহাতে আর কাল্পনিক রূপ ধ্যান করিতে হয় না। যে রূপটী চিরদিন প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া আসিয়াছি, যে রূপের সঙ্গে আমার প্রাণের অনেক মধুর স্মৃতি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত সেই রূপটী ধ্যান করিতে আমার আর বৃথা কল্পনায় মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করিতে হয় না। সে রূপটী হৃদয়ে উদয় হইবামাত্রই আমার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে, জীবনের কত মধুরিমাময় চিত্র চিত্তপটে উদয় হয়—জোর করিয়া ভক্তি আনয়ন করিতে হয় না, আপনা আপনি ভক্তি আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। প্রকৃতিই আমাকে অনেকটা সাহায্য করে।

শ্রীগুরুর মহিমা সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে অনেক সুন্দর সুন্দর উক্তি আছে। কিন্তু ঐ সমুদয় উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে, তাই গুরুতত্ত্বের আলোচনা আমরা এখানেই সমাপ্ত করিলাম।

নীচে (Friedrich Nietzsche) রচিত গ্রন্থাদির শ্রেণীবিভাগ।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী এম, এ, বি, এল)

নীচে রচিত সমুদয় গ্রন্থগুলিকে পর পর সাজাইয়া, আমরা তাহার কোনটীতে কি তত্ত্বের অবতারণা হইয়াছে মোটামুটি তাহাই বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কোন কবি বা দার্শনিকের গ্রন্থাবলীকে পর পর সাজাইয়া গেলেই সেই সমস্ত গ্রন্থাদির শ্রেণীবিভাগ হয় না। শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে কোন একটা আদর্শের অনুপাতে করিতে হয়।

(ক) পাশ্চাত্যদেশে হেফ্‌ডিং (Hoffding) এইরূপ শ্রেণী-বিভাগের একটা চেষ্টা করিয়াছেন। নীচের গ্রন্থাবলীতে আমরা কতকগুলি বড় বড় তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই—যেমন পুনরাবর্ত্তন (Eternal Recurrence), অতিমানুষবাদ (Superman), প্রভু ও দাসের নীতি (Master and Slave moraliy), শক্তির অর্জ্জনে প্রবৃত্ত ইচ্ছা (The will to Power), ইত্যাদি। এই সমস্ত তত্ত্ব যে সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে উদ্ভাবিত ও আলোচিত হইয়াছে সেই সমস্ত গ্রন্থগুলিকে এক এক শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিতে যাইয়া হেফ্‌ডিং একটি তত্ত্বের সহিত আর একটি তত্ত্বের সম্বন্ধ নির্ণয়েরও চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে নীচের উদ্ভাবিত বিভিন্ন তত্ত্বের

পরস্পর অসামঞ্জস্য ও নীচের অব্যবস্থিত চিত্ততার উপর কটাক্ষ করিয়া হেফ্‌ডিং নীচের গ্রন্থাবলীর শ্রেণীবিভাগ কার্য্যের দুরূহতা সম্বন্ধে আক্ষেপ করিয়াছেন। হেফ্‌ডিংএর এবম্বিধ শ্রেণীবিভাগ একমাত্র সম্ভবপর শ্রেণীবিভাগ বলিয়া ধরিয়া না নিলেও ইহাতে হেফ্‌ডিংএর বিশ্লেষণমূলক (analytic) সমালোচনার প্রশংসা আমরা করিতে বাধ্য।

(খ) নীচের মানসিক অবস্থা সব সময়ে একরকম থাকিত না। কখন কখন তিনি সুস্থ থাকিতেন, আবার কখন কখন তাঁহার মানসিক অসুস্থতা ও বিকার দেখা দিত। কাজেই যাহা কিছু তিনি লিখিয়াছেন, তাহা কখন সুস্থ অবস্থায় কখনও বা বিকারের অবস্থায়। সুতরাং তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর যেগুলি সুস্থ অবস্থায় লিখিত, দ্বিতীয় শ্রেণীর যে গুলি মানসিক বিকারের অবস্থায় লিখিত।

কিন্তু আমাদের মতে ইহা খুব উচ্চদরের শ্রেণীবিভাগ নহে। নীচে যে রকম প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তাঁহার উদ্ভাবিত তত্ত্বাদি প্রথম দৃষ্টিতে যেরূপ উদ্ভট বলিয়া মনে হয় তাহাতে তাঁহার কোন্ তত্ত্ব সুস্থ অবস্থায় এবং কোন্ তত্ত্ব বিকারের অবস্থায় উদ্ভাবিত তাহা নিরূপণ করা কঠিন। নীচের মানসিক অবস্থা সাধারণ মানুষের মানসিক অবস্থা হইতে স্বভাবতঃই পৃথক, ইহা বলা যত সহজ, কোন্ গ্রন্থ লিখিবার সময়ে নীচের মানসিক অবস্থা সাধারণ মানুষের মত সুস্থ, আর কোন্ গ্রন্থ লিখিবার সময় তাহা নয়, ইহা বলা তত সহজ নহে। এরূপ বলিলে নীচের সমগ্র মানসিক অবস্থার মধ্যে যে এক অঙ্গাঙ্গী যোগ রহিয়াছে এবং সমস্ত অবস্থার পশ্চাতেই যে এক অখণ্ডমন বিরাজ করিতেছে তৎসম্বন্ধে বিস্মরণ হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে।

(গ) অনেকের নিকট নীচের দার্শনিক তত্ত্বগুলির কোনই মূল্য নাই। তবে শিল্পী (Artist) বা কবি (Poet) হিসাবে তাঁহার স্থান খুব উচ্চে একথা তাঁহারা স্বীকার করেন। সুতরাং কাব্যের

হিসাবে তাঁহার যে সমস্ত গ্রন্থগুলি উৎকৃষ্ট তাহাই প্রথম শ্রেণীর, আর তদতিরিক্ত অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর।

এই প্রকারের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য যে, নীচের সকল সমালোচকই নীচেকে শিল্পী হিসাবে প্রথম স্থান দিয়া, দার্শনিক হিসাবে দ্বিতীয় স্থান দেন নাই। পরন্তু এমন সমালোচকও থাকিতে পারেন, যাঁহারা নীচের কবিত্ব অপেক্ষা দার্শনিকতারই অধিকতর পক্ষপাতী। সুতরাং তাঁহাদের নিকট উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগ একেবারেই উল্টা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে ইহা নিশ্চিত। এরূপ শ্রেণীবিভাগ সর্ব্ববাদীসম্মত হইতে পারে না।

(ঘ) পাশ্চাত্য সভ্যতায় কতকগুলি জটিল সমস্যা আসিয়া দেখা দিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সেই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা লইয়া খুব বিব্রত। এমন ক ঐ সমস্ত সমস্যার মীমাংসার উপরেই পাশ্চাত্য সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। নীচেও ঐ সমস্ত সমস্যাগুলির মীমাংসার ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার গ্রন্থগুলি, তাহা কাব্যই হউক আর দর্শনই হউক, রচনা করিয়াছেন। নীচের ঐ সমস্ত মীমাংসার উপযোগীতা ও সভ্যতার উপর এযুগে তাঁহার প্রতিভা ও কৃতিত্ব স্থান পাইবে। সুতরাং অনেকের মতে নীচের মীমাংসার উপযোগীতার অনুপাতে তাহার গ্রন্থাবলীর শ্রেণীবিভাগ হওয়া সঙ্গত।

ইহা একটি সমীচিন এবং প্রণিধানযোগ্য কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিবে যে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার যদি একটা সঙ্কট মুহূর্ত্তই উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে সেই সঙ্কটকালে তাহার সমস্যাগুলি কি? এবং তার পর অন্যান্য পণ্ডিতেরা যে গুলিকে সমস্যা বলিয়া নিরূপণ করিতেছেন, নীচেও সেই গুলিকেই আসন্ন সমস্যা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন কিনা? যদি এই সমস্যা নিরূপণ বিষয়ে অন্যান্য পণ্ডিতদের সহিত নীচে একমত না হইয়া থাকেন, অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে যে গুলি সমস্যা সেগুলিকে যদি নীচে সমস্যা বলিয়াই স্বীকার না করেন, তবে নীচের উদ্ভাবিত

মীমাংসা ও অন্যান্য পণ্ডিতদের মীমাংসার কোন তুলনামূলক বিচারই হইতে পারে না।

নীচের প্রদর্শিত সমস্যা ও অন্যান্য পণ্ডিতদের নিরূপিত সমস্যার পার্থক্য লইয়াও একটা বিচার চলিতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার বর্ত্তমানে প্রকৃত সমস্যা কি, তাহা এখনই একেবারে বলিয়া ফেলা ও সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে স্বীকার করা সঙ্গত হইবে না। তজ্জন্য আমাদিগকে এখনও কিছুকাল ধৈর্য্যের সহিত অনাগত ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ-ইতিহাসের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং উল্লিখিত আদর্শের অনুপাতে নীচের গ্রন্থাবলীর শ্রেণীবিভাগ সহজ ও সঙ্গত হইবে না।

(ঙ) নীচের লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেক সমালোচক কেবল কতকগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রলাপবাণী দেখিতে পান। আরও আক্ষেপের বিষয় এই, সমস্ত প্রলাপবাণী আবার অসংবদ্ধ ও পরস্পর-বিরোধী। যাহা অসংবদ্ধ ও পরস্পরবিরোধী তাহার মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য ও মিলের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া নীচের গ্রন্থাবলীকে একটা প্রাঞ্জল শ্রেণীবিভাগে সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে।

এই রকমের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইহা আগে হইতেই একটা সিদ্ধান্ত লইয়া উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে। এবং এই কল্পিত সিদ্ধান্তের সত্যতার উপরেই—এই শ্রেণী-বিভাগের উপযোগীতা নির্ভর করিতেছে। যদি এই কল্পিত সিদ্ধান্ত সত্য না হয় তবে তাঁহাদের এই শ্রেণীবিভাগের স্থান কোথায়?

তবে, কবি ও দার্শনিক হিসাবে, নীচের মনের গতি ও পরিণতির একটা ক্রমাভাষ এবং তাঁহার উদ্ভাবিত বিচিত্র দার্শনিক তত্ত্বগুলির উদ্ভব ও ক্রমপরিণতি, কাব্যের ভাষায় ঐ সমস্ত তত্ত্বের আশ্চর্য্য প্রকাশ বা অভিব্যক্তির হেতু নির্ণয়—এই সমস্ত যদি উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগে সম্যক্ ফুটিয়া উঠে তবে অন্যান্য

আদর্শের অনুপাতে শ্রেণীবিভাগ হইতে ইহার উপযোগিতা অস্বীকার করা যাইবে না।

(চ) কেহ বলেন, নীচে একজন দার্শনিক। কেহ বলেন, তিনি একজন কবি। আবার অনেকের মতে তিনি এক সঙ্গে কবি ও দার্শনিক—দুইই। অধিকাংশ সমালোচকই এই শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী।

কবির কাব্যের শ্রেণীবিভাগ চলে, দার্শনিকের দর্শনেরও শ্রেণীবিভাগ চলে। কিন্তু যাহা একসঙ্গে কাব্য ও দর্শন—দুইই, তাহার শ্রেণীবিভাগ বাস্তবিকই কঠিন হইয়া পড়ে। হেফ্‌ডিং বলিয়াছেন যে, নীচের অব্যবস্থিত-চিত্ততা ও পরস্পর-বিরোধী উক্তিই তাঁহার গ্রন্থাবলীর শ্রেণীবিভাগের পক্ষে এক প্রবল অন্তরায়। তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমরা বলিতে চাই যে, নীচের গ্রন্থাবলী একসঙ্গে কাব্য ও দর্শন বলিয়াই, তাহার শ্রেণীবিভাগ সমালোচকের পক্ষে এতাদৃশ বিঘ্নসঙ্কুল।

নীচের গ্রন্থালোচনায় আমাদের ধারণা এইরূপ যে,(১) কতকগুলি গ্রন্থ সৃষ্টিমূলক (creative), আর কতকগুলি গ্রন্থ সমালোচনামূলক (critical) ; (২) আর সমালোচনামূলক গ্রন্থগুলি সৃষ্টিমূলকগ্রন্থাদির ব্যাখ্যা বা টীকাস্বরূপ লিখিত।

আরও আমাদের ধারণা যে, যে সমস্ত গ্রন্থ সৃষ্টিমূলক তাহার তত্ত্বের অংশে দার্শনিকতার উদ্ভব—আর ভাষায় প্রকাশের অংশে কাব্যের সৃষ্টি। সৃষ্টিমূলক গ্রন্থাদিতে দর্শন ও কাব্যের এইরূপ মৌলিক সংমিশ্রণের জন্যই, তাহার ব্যাখ্যার প্রয়োজনে সমালোচনামূলক গ্রন্থাদির সৃষ্টি। কিন্তু এই সমালোচনামূলক গ্রন্থাদিও নীচের বিশিষ্ট প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া, ইহারও ভাবে ও ভাষায় এক নূতন সৃষ্টি। বস্তুতঃ প্রত্যেক সৃষ্টিমূলক গ্রন্থের মধ্যেও সমালোচনা আছে, আবার প্রত্যেক সমালোচনামূলক গ্রন্থেই নূতন সৃষ্টি বিদ্যমান। প্রভেদ এই যে, সৃষ্টিমূলক গ্রন্থে সমালোচনা প্রচ্ছন্ন—সৃষ্টি প্রকট। আর সমালোচনামূলক গ্রন্থে সৃষ্টি প্রচ্ছন্ন—

সমালোচনা প্রকট। উভয় শ্রেণীর গ্রন্থই শিল্পীর (artist) প্রতিভা প্রসূত।

নীচের প্রথম গ্রন্থ 'Birth of Tragedy' কল্পনাবহুল, সৃষ্টিমূলক। শেষ গ্রন্থ 'Ecce Homo' সমালোচনামূলক। 'The Dawn of Day', যাহাতে তিনি পুনরাবর্ত্তন (Eternal Recurrence) মতবাদ প্রচার করিয়াছেন ; এবং 'Thus Spake Zarathustra', যাহাতে তিনি অতিমানুষবাদ (Superman) তত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন,—এই দুইখানি গ্রন্থই বিশেষভাবে সৃষ্টিমূলক। আবার 'Thoughts out of Season' এবং 'The Genealogy of Morals' গ্রন্থদ্বয় অত্যন্ত সমালোচনা-মূলক। 'Human, All-too-Human' একখানি প্রতিক্রিয়ামূলক আত্মোপলব্ধির গ্রন্থ—ইহাও সমালোচনামূলক। 'The Joyful Wisdom' এবং 'Beyond good and evil' ইহারা কল্পনাবহুল কাব্য বিশেষ। এই দুইখানি গ্রন্থ ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আর দুইখানি সৃষ্টিমূলক গ্রন্থের (The Dawn of Day, Thus Spake Zarathustra) পর পর রচিত বলিয়াই ঠিক ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ সমালোচনামূলক গ্রন্থের শ্রেণীতে আমরা সন্নিবেশিত করিতে প্রস্তুত নহি। পরন্তু দুইটি গভীর তত্ত্বসমন্বিত গ্রন্থের পরে পরে এই দুইখানি গ্রন্থে নীচে তত্ত্ব ছাড়িয়া যেন কল্পনার মধ্যে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্রামলাভের চেষ্টা করিয়াছেন। নীচের মানসিক গতি ও পরিণতির মধ্যে এই রকমের একটা প্রয়াস তাঁহার গ্রন্থরচনার পূর্ব্বাপর শৃঙ্খলা হইতে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। 'The Will to Power' এক তত্ত্বমূলক গ্রন্থ। ইহাতে নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনারও যথেষ্ট প্রসার দেখিতে পাই। নীচের যাহা মূলতত্ত্ব, এই গ্রন্থে সেই তত্ত্বের, উপ-লব্ধির জন্য যেরূপ সাধনা আবশ্যক তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে সৃষ্টি ও সমালোচনা দুইই দৃষ্ট হয়।

আমাদের এই উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, ইহাতে কোন ত্রুটি নাই, এমন কথা বলিতে সাহসী নহি। যে কোন আদর্শের অনুপাতে যে কোন বড় দার্শনিক বা কবির গ্রন্থাবলীর শ্রেণীবিভাগ

করিতে গেলে, যে সমস্ত ত্রুটি অনিবার্য্য, তাহা আমরা অতিক্রম করিতে পারি নাই। তবে পাশ্চাত্য দেশের সমালোচকদের সম্মুখে নীচে রচিত গ্রন্থাদির এই কথঞ্চিৎ নূতন শ্রেণীবিভাগ উপস্থিত করিতে আমরা অভিলাষী।

নীচের উপর প্রভাব।

গ্রীক সভ্যতা।

প্রথম হইতেই নীচের জীবনে আমরা গ্রীক সভ্যতার প্রভাব লক্ষ্য করি; এবং গ্রীকের আদর্শ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনে কার্য্য করিয়াছে, ইহা নিশ্চিত। কি নূতন তত্ত্বের উদ্ঘাটনে কি কাব্য-সৃষ্টিতে গ্রীক প্রভাব তাঁহার মধ্যে জাজ্জ্বল্যমান। পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ সমালোচকই এবিষয়ে একমত। খৃষ্টান ধর্ম্মের নিষেধাত্মক (Nay Saying) নীতির আদেশের (commandments) বিরুদ্ধে নীচের যে ভীষণ সমরঘোষণা, মানব জীবনের একটা বাধামুক্ত, পরিপূর্ণ প্রকাশ ও বিকাশের জন্য নীচের যে ব্যাকুলতা ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তাহার মূলেও গ্রীক প্রভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। বস্তুতঃ নীচে খৃষ্টান ছিলেন না, গ্রীক বা প্যাগ্যান (pagan) ছিলেন। ইউরোপের সভ্যতার বর্ত্তমান সমস্যাসকল তিনি গ্রীক আদর্শের অনুপাতেই সম্পূরণ করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। ইউরোপের অন্ধযুগের (Dark Age) পর পঞ্চদশ শতাব্দীতে গ্রীক সাহিত্য যে নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গ্রীক সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া, নীচেও তদনুরূপ আর একটি চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে নীচে –

(১) গ্রীক সভ্যতার পূর্ণ আদর্শ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই। গ্রীকের ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যের (Valour, Virtue) আদর্শ তাঁহাকে উদ্দীপিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে গ্রীকের নীতি-বাদ বা Justice এর আদর্শ তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই। এবং তাহা পড়ে নাই বলিয়াই মনুষ্যজীবনের বিকাশের জন্য যে সমস্ত

তত্ত্বের কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত থাকিলেও সেই সমস্ত মূলতত্ত্ব হইতে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইয়াছেন, তাহা সাধারণতঃ নীতিবিগর্হিত হইয়াছে এবং স্ববিরোধী দোষে দুষ্টও হইয়াছে। কোন একটা পূর্ণ জিনিষের অংশের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলে যে সমস্ত একদেশদর্শিতা ও ত্রুটি অনিবার্য্য, নীচের মধ্যে আমরা তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করি।

(২) দ্বিতীয় কথা, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে যে নবযুগের সূচনা দেখা দিয়াছে, তাহা শুধু গ্রীক সভ্যতার প্রেরণা হইতে সফলতা লাভ করিতে পারে না। ইউরোপকে যুগে যুগে উদ্বোধিত করিতে যাইয়া গ্রীক সভ্যতা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এখন আর গ্রীক সভ্যতার দিবার বিশেষ কিছু নাই। অনেক পণ্ডিতদের মতে ইউরোপের এই নবযুগের প্রেরণা আসিবে হিন্দু সভ্যতা হইতে। কিন্তু নীচে, মনুর স্মৃতিগ্রন্থ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলেও এবং পল্ ডয়সেনের (Paul Deussen) বন্ধু হইলেও হিন্দু সভ্যতার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে কিছুই প্রভাবান্বিত হয়েন নাই। এযুগে গ্রীক ও হিন্দু এই উভয় সভ্যতা দ্বারা পরিপুষ্ট না হইয়া ইউরোপের এই সঙ্কটময় নবযুগে কোন মনীষীই সকল দিক হইতে একটা পূর্ণ মীমাংসা বা সমন্বয়ের আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন না। নীচেও পারেন নাই। হিন্দু সভ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত না হওয়াই তাহার অন্যতম কারণ।

সোপেনহয়ার (Schopenhauer)।

গ্রীক সভ্যতার পরেই নীচের উপর সোপেনহয়ারের প্রভাব আমরা দেখিতে পাই এবং তাঁহার উপর সোপেনহয়ারের এই প্রভাবসম্বন্ধে ১৮৬৬ খৃঃ তিনি পল্ ডয়সেনকে এক চিঠিও লিখিয়াছিলেন।

সমস্ত সৃষ্টির মূলে এক অনাদি অনন্ত ও দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি (will force) কার্য্য করিতেছে। সৃষ্টি জ্ঞানপ্রসূত নহে, ইচ্ছাশক্তিপ্রসূত এবং এই বিশ্বব্যাপী ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানময় নহে,—

ইহা অজ্ঞান ও অন্ধ। ইচ্ছাশক্তির এক অনির্ব্বচনীয় অন্ধ প্রেরণায় এই সৃষ্টির বিকাশ, স্থিতি ও লয় সাধিত হইতেছে। এই দার্শনিক তত্ত্ব যে নীচের উপর প্রথম জীবনে স্বতঃই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমরা পাই। সৃষ্টির অভ্যন্তরে ও অন্তরালে যে বাস্তবসত্তা (reality) কার্য্য করিতেছে, তাহা জ্ঞান নয়, ইচ্ছাশক্তি,—এই ধারণা নীচে সোপেনহয়ারের নিকট হইতে লাভ করেন।

নীচের মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সোপেনহয়ারের প্রভাব ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তাহার কারণ—

(১) সোপেনহয়ারের দুঃখবাদ (Pessimism) নীচে পরবর্ত্তী জীবনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। মানবজীবনের পূর্ণতা উপলব্ধি ও তাহার সাধনায় এবং বিকাশে এই দুঃখবাদ বিশেষ সহায়তা করিতে ত পারেই না, পরন্তু উহা এক বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছিল। সমস্ত রকম দুঃখ, ক্লেশ, পাপ-তাপের মধ্যেও জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশ হইতেছে আনন্দ ও মুক্তিতে। নীচের এই সিদ্ধান্ত সোপেনহয়ারের দুঃখবাদকে ক্রমে অতিক্রম করিতে বাধ্য হয়।

২) সোপেনহয়ারের দয়াবাদ Pity নীচে একেবারেই সহ্য করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল J S Mill) সামাজিক হিতবাদের (Utility) দিক হইতে এই অনুকম্পার একটা স্থান বা উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক সামাজিক সাম্যবাদ (Socialism) এই অনুকম্পাবৃত্তির উপর অনেকটা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নীচে ইহার একান্ত বিরোধী। নীচের মতে, যে দয়া করে তাহার মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়, আর যাহার প্রতি দয়া করা হয়, তাহারও মনুষ্যত্ব নষ্ট করা হয়। যাহারা দয়ার পাত্র, তাহাদিগের একান্ত বিলোপ বা উচ্ছেদসাধনেই মনুষ্যজাতির কল্যাণ। নীচের মত এ বিষয়ে সোপেনহয়ারের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, সোপেনহয়ারের দুঃখবাদ (Pessimism) ও দয়াবাদ (Pity) নীচেকে তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিতে বাধ্য করে।

ওয়েগনার (Wagner)।

নীচে জীবনের প্রথমেই ওয়েগনারের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। নীচে বাল্যাবধি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। আর সঙ্গীত-বিদ্যায় ওয়েগনার তখন ইউরোপের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

কিন্তু পরে ওয়েগনারের সহিত নীচের বিচ্ছেদ অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক হইয়া পড়ে।

(১) নীচে, ওয়েগনার ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং এই বিচ্ছেদের যদি কিছু ব্যক্তিগত কারণ থাকে, তাহা কোন পক্ষ হইতেই সাধারণে প্রকাশ হয় নাই।

(২) নীচে একরূপ ওয়েগনারের শিষ্যের মত ছিলেন। ওয়েগনার একজন অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী বিখ্যাত ব্যক্তি। সাধারণতঃ এইরূপ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা গুণমুগ্ধ যুবকদের দ্বারা স্বীয় মহিমা প্রকাশের জন্য চেষ্টা করেন। তাহাতে এই সমস্ত যুবকদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়। নীচে সম্ভবতঃ ওয়েগনারের প্রভাবের পেষণে নিজ স্বাতন্ত্র্য বিলোপের আশঙ্কাতেই ওয়েগনারকে ছাড়িয়া আসেন।

(৩) ওয়েগনারের দুঃখবাদ (pessimism) এবং

(৪) ওয়েগনারের মধ্যযুগের খৃষ্টানী আদর্শ স্বতঃই নীচেকে ওয়েগনার হইতে দূরে সরাইয়া আনিতে বাধ্য করে।

(৫) আমাদের মনে হয়, ওয়েগনার ও নীচে উভয়েই অসাধারণ প্রতিভা ও প্রখর ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ। কাজেই ইঁহাদের মধ্যে মতের বিরোধিতাই পরস্পর বিচ্ছেদের প্রধান কারণ।

ইউরোপের পারিপার্শ্বিক অবস্থা (Environment of Europe) নীচের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আমাদের এইরূপ ধারণা।

এক দিকে নীচের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অন্য দিকে ইউরোপের সমস্যা, ইহার সংঘর্ষ হইতেই নীচের জীবন, কাব্য ও দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে। ইউরোপের সঙ্কট নীচেকে উদ্বেলিত করিয়াছে।

এবং ইউরোপের দিক হইতেই তিনি সমগ্র মনুষ্যজাতির উপর দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

সুতরাং আমাদের মতে ইউরোপের বর্ত্তমান সমস্যা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাই (Environments) নীচের জীবনকে বিশিষ্টরূপে আন্দোলিত ও বিকশিত করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ভগিনী নিবেদিতা।*

আমরা যে সমস্ত উদ্দেশ্যে আজ এখানে সমবেত হইয়াছি, তাহাদের মধ্যে একটী উদ্দেশ্য আচার্য্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণোদিত সিষ্টার নিবেদিতা কর্ত্তৃক স্থাপিত আমাদের এই বালিকাবিদ্যালয়টীর বিষয়ে কিছু আলোচনা করা। স্কুল ও স্কুলের কার্য্য আলোচনা করিতে গেলেই, যিনি আত্মবলিদানে আমাদের এই পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই ভগিনী নিবেদিতাকে স্মরণ করিতে হয় ; কেন না, আমাদের স্কুল বলিলে আমরা ইষ্টককাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত একটা বাড়ী বা কতকগুলি বিশেষ কার্য্যপ্রণালী বা নিয়মকে স্মরণ করি না, কিন্তু তিনি যে মহান্ উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া সমগ্র নারীজাতির উন্নতিকামনায় আপন স্বার্থ, আপন সুখ, আপন দেহমন-প্রাণ বলি দিয়া আত্মনিবেদন বা প্রেমের সাধন করিয়া গিয়াছেন তাঁহার সেই মহান্ উদ্দেশ্য ও নিবেদিত হৃদয়টীকেই স্মরণ করি। সেই উদ্দেশ্যটী সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পারিলেও আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহা এক কথায় এই যে, নারীজাতির নারীত্বের বিকাশ। ইহারই

* সিষ্টার নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়ে ৺ সরস্বতী পূজোপলক্ষে সিষ্টার নিবেদিতার প্রিয় ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক পঠিত।

একটী উপায় শিক্ষাদান। সমুদ্ররূপ পূর্ণ বিকাশের যে তরঙ্গরূপ ক্ষুদ্র স্ফূরণ এই প্রাণ-মন দেহের সমষ্টি, ইহারই অন্তর্নিহিত বৃত্তিগুলিকে বিকাশমুখীন করাকেই বলে শিক্ষাদান, আর জীবনব্যাপী এই শিক্ষাব্যাপারের একটী সোপানের নাম বিদ্যাশিক্ষা এবং সেই বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয়টী স্থাপিত।

দ্বিতীয়তঃ সিষ্টার নিবেদিতার সেই হৃদয়ের, তাঁহার সেই প্রেম পূর্ণ নিবেদিত হৃদয়ের বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে তাঁহারই প্রদত্ত শিক্ষায় আমরা তাঁহাকে যতটুকু বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহাই প্রকাশের চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

তাঁহার হৃদয় বলিতে আমরা তাঁহার ভালবাসা ও ত্যাগ, বিশেষতঃ এই দুইটী বিষয়েরই উল্লেখ করিতেছি। সেই যে মহাপুরুষ বাক্য—

"স্বার্থ মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জ্জন—"

"দাও আর ফিরে নাহি চাও,
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল—"

সে বাক্য যথার্থই তিনি কার্য্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। এখন, এইরূপ দিতে হইলে য কতখানি ভালবাসিতে হয়, বা কতখানি ভালবাসিলে যে ইহা দেওয়া যায়, ইহাই চিন্তার বিষয়।

বাস্তবিক, কতখানি ভালবাসিলে মানুষ অপরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করে? কতখানি ভালবাসিতে পারিলে মানুষ অপরের যন্ত্রণায় যন্ত্রণা বোধ করে, ও সেই যন্ত্রণা ও দুঃখ হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করে? কতখানি ভালবাসায় নারীজাতির দুর্দ্দশা, দুঃখ, নির্জীবতা নিবেদিতার হৃদয়কে আঘাত দিয়াছিল যাহার প্রেরণায় নিজের নিজত্ব ভুলিয়া সারা জীবনব্যাপী কঠোর সংযম ও তপস্যা দ্বারা তিনি এই নির্জীবতা দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, নিজের জীবনপাত করিয়া প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন? এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা আপন আপন হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করা এবং কার্য্যে পরিণত করাই আমাদের শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। এমন স্নেহময়ী শিক্ষা, তাহারই আশাবীজ

বক্ষে ধারণ করিয়া আমাদের বিদ্যালয় দণ্ডায়মান। কাজেই ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁহার স্থাপিত এই বিদ্যালয়ের মধ্যে এক হিসাবে কোনও প্রভেদ নাই। ইহা তাঁহারই যেন প্রত্যক্ষ প্রতীক। ইহার ও ইহার কার্য্যসম্বন্ধে আলোচনা, ও নিবেদিতা-জীবনের আলোচনা, যেন একই কথা। এই একত্বের সিদ্ধান্তই তাঁহার দৈহিক অভাব-জনিত মর্ম্মান্তিক দুঃখে শান্তি প্রদান করিতেছে।

তাই আজ এই বিশেষ দিনে যে দিন সমগ্র জগৎ অবিদ্যানাশিনী বিদ্যার আরাধনায় আনন্দে ভাসিতেছে; সেই বিশেষ দিনে আমরাও সেই শিক্ষাধিষ্ঠাত্রী বিদ্যারূপিনী বাণীব পূজান্তে আমাদের শিক্ষা-দায়িনীকে স্মরণ করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করি। সেই শিক্ষা-দায়িনী নিবেদিতা যে শিক্ষার আদর্শ আমাদের সম্মুখে ঘোষণা করিতেছেন, যে শিক্ষা সকলকে দান করিবার জন্য আমাদের পথ উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন, যে প্রেমের প্রবাহ তুলিয়া দেখাইতেছেন যে, স্বামীজির মন্ত্রাদিষ্ট 'দিয়ে দেওয়ার' সঙ্গে সঙ্গে কি মহান্ 'পাওয়ায়' হৃদয় ভরিয়া যায়, আজ তাঁহার সেই ঘোষণার সেই উৎসাহের বাণী বীণাবাদিনীর বীণায় ঝঙ্কারিত হইতেছে। তাঁহার সেই শুভ্র নির্ম্মল পুষ্পসকাশহৃদয় শ্বেতবরণার শ্বেতবর্ণে প্রতিভাত হইতেছে এবং তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত আনন্দ ও আশা আজ হাস্যময়ীর মৃদুহাস্যে ব্যক্ত হইতেছে। আর ঐ দেখ নারীজাতির উন্নতি ও কল্যাণের জন্য তাঁহার যে উদ্দাম অক্লান্ত আকাঙ্ক্ষা আজ তাহা শত দিকে শত ভাবে প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে।

আজ গৃহাগতা দেবীকে মনোমধ্যে ধ্যান করিয়া তাঁহার নিকট এই মনস্কামনা নিবেদন করি, যেন তিনি আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগরিত করিতে সহায় হউন; যেন অবিদ্যানাশিনীর কৃপায় আমরা সকল অবিদ্যা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, প্রেমপূর্ণ প্রাণ লইয়া বিশ্বের সেবায়, বিশ্বে সেই বিশ্বপ্রাণকে অধিষ্ঠিত দেখিয়া জীবন সফল করি।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

(শ্রীকানাইলাল পাল, এম, এ, বি, এল)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইতিপূর্ব্বে এরিষ্টটলের জীবনী ও গ্রন্থাবলী মোটামুটী আলোচিত হইয়াছে। অতঃপর তাঁহার দর্শনালোচনায় অগ্রসর হওয়া যাউক।

এই স্থলে প্রথমে প্লেটোর সহিত এরিষ্টটলের দর্শনের ভেদাভেদ বিচার করিয়া দেখা দরকার। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বাহ্যজগত প্লেটোর নিকট একটী প্রকাণ্ড ছায়া বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, তিনি প্রজ্ঞাশক্তিবলে জগৎ রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন; আর আদর্শের তুলনায় প্রতিচ্ছবি যেমন হীন, সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ, কল্যাণ-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ মূল পদার্থের তুলনায় বিশ্বজগৎ অকিঞ্চিৎকর—এই বোধে তিনি সেই মূল তত্ত্বের আলোচনায় বিশেষভাবে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া বিশ্বজগতের অস্তিত্ব তিনি একেবারে অস্বীকার করিতেন না। প্লেটো ও এরিষ্টটলের এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। তবে প্লেটোর মতে বাহ্যজগতের সহিত ভাব জগতের সম্বন্ধ কি সেটী সহজে বুঝা যায় না—সেই কারণ এরিষ্টটল প্লেটোর দর্শনে দোষ প্রদর্শন করেন। প্লেটোর মতে ভাব-পদার্থকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড় পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিশেষভাবে প্রণিধান করিলে উভয়ের মধ্যে সেরূপ বিরোধ দৃষ্ট হয় না। দুইটীকে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ মনে করিলে উভয়ের সম্বন্ধ বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়া পড়ে। এবং যদি জড়-পদার্থ ও ভাব-পদার্থ দুইটী বিরুদ্ধ পদার্থ হয় তাহা হইলেই ঐ আপত্তি উঠিতে পারে। প্লেটোর দর্শনালোচনায় প্রথমেই ঐ সন্দেহ অনেকের মনে উঠিতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকই কি দুইটী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পদার্থ বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন, আমাদের মনে হয় না।

দেখা যাক, এরিষ্টটল এ বিষয়ে কি বলেন। তাঁহার মতে দুইটী বিরুদ্ধ পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ অস্বাভাবিক। ভাবপদার্থকে জড়াতিরিক্ত (Transcendent) না বলিয়া জড়পদার্থের অন্তর্নিহিত (Immanent) বলিলেই উভযের সম্বন্ধের যুক্তিযুক্ত কারণ পাওয়া যায। জড়াতিরিক্ত কোন ভাবপদার্থের অস্তিত্ব এজগতে স্বীকার করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। এরিষ্টটল এবম্বিধ মত প্রচার করিলেও তাঁর মতে মূল পদার্থ অজড় (Immaterial) মূল পদার্থে জড়ের সম্বন্ধ নাই—মূল পদার্থ ভাব-স্বরূপ।

এরিষ্টটলের মতানুসারে জাগতিক পদার্থ মাত্রেই রূপ (from) ও জড়ের (matter) সমাবেশ বর্ত্তমান। রূপ ছাড়িয়া জড় নাই, জড় ছাড়িয়া রূপ নাই—বিশ্বজগতের ইহাই নিয়ম। 'রূপ' বলিতে কি বুঝায় একটু প্রণিধান করিয়া বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ রূপ বলিতে আকারকেই বুঝায়। এই দোয়াতটী চতুষ্কোণবিশিষ্ট একটী পদার্থ, দোয়াতের ইহাই রূপ। এরিষ্টটল কিন্তু 'রূপ' শব্দ এই সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিতেন না। পিথাগুরু সম্প্রদায় এই 'রূপ'কে 'সংখ্যা' দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াসী হইযাছিলেন, সে কথা যথাযথ স্থানে আলোচিত হইয়াছে। প্লেটো 'সংখ্যা' বলিতে শুধু পরিমাণকে (Number বা Quantity) বুঝিতেন না। 'সংখ্যা' বলিতে গুণকেও (Quality) বুঝিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে প্লেটোর দর্শনে সংখ্যার আলোচনা দ্রষ্টব্য। এরিষ্টটল 'রূপ' শব্দের দ্বারা অবিকাশাবস্থার (Potential State) বিকাশাবস্থাকে (Actual State) বুঝিতেন। তাঁর মতে 'জড়' পদার্থ পদার্থের অবিকাশাবস্থা, 'রূপ' পদার্থ তাহারই বিকাশাবস্থা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পদার্থ মাত্রই এই বিকাশে ও অবিকাশের সমাবেশে গঠিত। সদ্যোজাত শিশুর অবস্থা বালকের অবস্থার তুল্য নয়—অবিকাশাবস্থা। বালকের অবস্থা আবার পূর্ণযৌবন মানবের অবস্থার তুলনায় অবিকাশাবস্থা, পাক্ষান্তরে কিন্তু সদ্যোজাত শিশুর অবস্থার তুলনায বালকের অবস্থা বিকাশাবস্থা। সদ্যোজাত শিশুতে আবার গর্ভস্থ প্রাণের

তুলনায় বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর যে কোন পদার্থ লও না কেন সর্ব্বত্রই এই বিকাশ অবিকাশের, এই বিপরীতের অদ্ভুত ঐক্যবন্ধন। আরও দেখা যায়, একই পদার্থে এক হিসাবে বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্য হিসাবে অবিকাশেরও পরিচয় মেলে।

প্লেটোর দর্শনালোচনায় দেখা গিয়াছে, তাঁহার মতে প্রত্যেক পদার্থ এক হিসাবে বিশেষ-পদার্থ (particular) ও অন্য হিসাবে তাহা জাতি (genus); বিশেষ-পদার্থ জাতির অন্তর্গত, জাতি আবার পরতর জাতির, পরতর জাতি পরতম জাতির, এই ক্রম অবলম্বনে সকলগুলিকে শেষে মূল জাতি বা মূল সত্তার অন্তর্গত করিয়া লওয়া যায়। এরিষ্টটলের মতে প্রত্যেক পদার্থই অবিকাশ অবস্থা হইতে বিকাশাবস্থায় পরিণত হইতেছে। মূল পদার্থে এই পরিণতির বিরাম হইয়াছে, মূল পদার্থে বিকাশের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মূল পদার্থ জড়-সম্বন্ধহীন (Immaterial)।

প্লেটোর ও এরিষ্টটলের দর্শনের মূল সিদ্ধান্তে কোন বিরোধ নাই, বুঝা গেল। যাহা কিছু অনৈক্য আছে, শুধু চিন্তা-প্রণালী লইয়া। এই স্থলে উভয় দর্শনের ভেদাভেদের আলোচনায় আরও একটু অগ্রসর হওয়া যাক।

আমরা দেখিয়াছি, প্লেটোর মূল ভাবপদার্থ এক হইলেও তিনি বহু ভাবপদার্থের উল্লেখ করিতেন। পরন্তু ভাব-পদার্থগুলিকে শ্রেণীপরম্পরায় সুসজ্জিত করিয়া সকলগুলিকেই একের অন্তর্গত করিয়া লওয়াই তাঁহার দর্শনের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। সকল ভাবপদার্থই মূল ভাবপদার্থের বিকাশ মাত্র—দেশগত, কালগত বিকাশ বা প্রতিচ্ছায়া। মূল ভাবপদার্থকে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের কোনই অস্তিত্ব থাকে না। এবং সেই ক্রমপরম্পরায় তাহারা এক হিসাবে ব্যষ্টি ও অপর হিসাবে সমষ্টির পরিচায়ক। ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টিতে সমধিক বিকাশ, সে কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। মূল পদার্থে সকলেরই সমাবেশ সুতরাং মূল পদার্থের বিকাশ সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট অন্য কথায় মূল পদার্থ পূর্ণ বিকশিত, বহু ভাব পদার্থগুলি

তাহারই আংশিক বিকাশ মাত্র। প্লেটো ও এরিষ্টটলের দর্শনে তবে প্রভেদ কোথায়? প্রভেদ এই যে, প্লেটো স্বীয় প্রজ্ঞাশক্তিবলে মূল পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিয়া এই জগৎকে তাহারই বিকাশ বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, এরিষ্টটল এই প্রত্যক্ষ জগতের যাবতীয় পদার্থেই বিকাশের অপূর্ণতা দেখিয়া চিন্তা ও তর্কশক্তি দ্বারা পূর্ণবিকাশের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

আর একটী কথা, প্লেটোর মতে যাবতীয় পদার্থ সেই মূলকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছে। মূল পদার্থই আদর্শ পদার্থ, জাগতিক পদার্থ মাত্রেই তাহার আংশিক বিকাশ। আবার যাবতীয় জাগতিক পদার্থকে ক্রমপরম্পরায় বিকাশশীল বলা চলে; যে পদার্থ যে পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে সে তদপেক্ষা কম বিকশিত পদার্থের আদর্শরূপে বর্ত্তমান। ফলে পাওয়া গেল, মূল আদর্শ এবং সেই মূল আদর্শের অন্তর্গত বহু আদর্শ; এবং সেই বহু আদর্শ আবার পরস্পরের আদর্শ। এরিষ্টটল 'রূপ' (from) বলিতে এই আদর্শকেই বুঝিয়াছিলেন—জাগতিক পদার্থ মাত্রেরই রূপ হইতে রূপান্তরে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে—একমাত্র মূল পদার্থই স্বরূপে নিত্য অবস্থিত। এরিষ্টটের from ও প্লেটের Idea আমাদের মনে হয় একই পদার্থ।

এই স্থলে আর একটী কথা লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা এরিষ্টটলের দর্শন বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইব। সক্রেটীস প্রচার করেন, বস্তুর ভাব (Conception) হইতে বস্তুর জ্ঞান জন্মে। বস্তুর জ্ঞান ছাড়া বস্তুর অস্তিত্ব অন্য কোন উপায়ে উপলব্ধি হয় না। বস্তু বলিতে কি বুঝি, বিশ্লেষণ করিলে সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। সম্বন্ধ জ্ঞানসাপেক্ষ। ফলে দাঁড়ায়, বস্তুর সত্তা জ্ঞানসাপেক্ষ। জ্ঞানের উপর তাহার অস্তিত্ব সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে। সক্রেটীসের Conception, প্লেটোর Idea, এরিষ্টটলের form একই পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র।

(ক্রমশঃ)

সৎকথা।

ভগবানের উপর শ্রদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন। তাঁর কৃপা না হলে হয় না। সেই জন্য সাধুরা কি করে তাঁর কৃপালাভ করেছেন বুঝ্‌তে হয়, তাঁদের জীবন দেখ্‌তে হয়, আলোচনা কর্‌তে হয়। সেই জন্যই যত অবতার বলেছেন, "সাধুসঙ্গ কর"।

* * * *

সৎলোকের নিন্দে কর্‌তে নেই। যদি কোন বড় লোকে সৎলোকের নিন্দা করে, তা হলে কতকগুলি লোককে সৎসঙ্গ হতে বঞ্চিত করা হয়। কারণ বড় লোকের কাছেই বেশী লোক আসে। ঐরূপ করা অতি খারাপ। আর যদি সে সৎএর প্রশংসা করে তা হলে পাঁচজন সৎসঙ্গ কর্‌তে চাহিবে। কারণ, তারা বুঝ্‌বে এ লোকটাও যখন তাকে ভালবাস্‌ছে তখন সাধুর সঙ্গ করা উচিত।

* * * *

মানুষের সংশয় লেগেই আছে। সংশয় যাওয়া কি মুখের কথা! মানুষের সংশয় দূর কর্‌বার জন্য ভগবান্ শরীর ধারণ করেন।

* * * *

ভগবান্ কাহাকেও বড় করেন, আবার কাহাকেও ছোট করেন। তার অর্থ কি? সংসারেই দেখা যায়, ধনীলোক মৃত্যুর সময় তার বিষয়-সম্পত্তি তার উপযুক্ত সৎপুত্রের হাতে দিয়ে যায়। কারণ, সে জানে এ ছেলেটা নিজেও খাবে, অপর ভাইদেরও দেবে। লক্ষ্মীছাড়া ছেলেদের দিয়ে যান না; তারা নিজেও খাবে না, অপর ভাইদেরও দেবে না। সেই রকম ভগবান্ এমন লোককে শক্তি দিয়ে বড় করেন, যার দ্বারা অপরেরও উপকার হবে।

* * * *

এমন শক্তি আছে, যাতে নিজেও সুখী হয়, পরকেও সুখী করে; ইহা সৎশক্তি। আর নিজেও দুঃখী হয়, আর অপরকেও দুঃখী করে, ইহা অসৎ শক্তি।

ঈশ্বর লাভ করতে হলে ঠিক ঠিক ত্যাগ চাই, ভগবান্ ত্যাগীকে খুব ভালবাসেন। ত্যাগের ভাব না এলে ভগবান্ লাভ হয় না। ত্যাগ বলতে গেলে—ধন, মান এসব ত ত্যাগ করতে হবেই, এমন কি দেহটাও যা এত আদরের সামগ্রী সে দেহটাকেও সময় সময় ভুলে যেতে হবে। ভোগের ইচ্ছা একটু থাকলে ত্যাগ কখনও সম্ভব হয় না। বাসনা-পূর্ণ মন কখনও কি ত্যাগের কথা পর্য্যন্ত প্রকাশ করতে পারে? যে মান চায় তার কাছে ভগবান্ দূরে।

* * * *

ধন মানের মধ্যে থেকে ভগবানের উপর মন রাখা কি কম কথা? ঈশ্বর হতে যে কোন জিনিষ আমাদিগকে পৃথক্ করে, তাহাই মায়া। মায়ার বন্ধন কাটতে না পারলে ভগবানের কৃপা লাভ হয় না। সাধন ভজন ও গুরুকৃপা ব্যতীত এই মায়া কাটাতে পারা যায় না।

* * * *

এ জগতে ঠিক ঠিক গুরুও দুর্লভ, শিষ্য মেলাও দুর্লভ। যে শিষ্য গুরুবাক্য পালন করে, তার সংসারে কেউ শত্রু থাকে না। ভগবান্ তার সঙ্গে সদা সর্ব্বদা থাকেন। সে এক দিন না এক দিন ভগবানকে বুঝতে পারে।

* * * *

ভগবান্ লাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে। তার মধ্যে যে কোন একটা জোর করে ধরে থাকতে হয়। ভগবান্ লাভ করতে হলে একনিষ্ঠ হতে হয়।

শ্রীনাথে জানকীনাথে যদিচ অভেদ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমললোচন।

কমললোচন।

হনুমানের মত এইরূপ একনিষ্ঠ নিষ্ঠা চাই।

মানের মত পাজি জিনিষ আর নেই। কত রকম সংশয়, অবিশ্বাস এনে দেয়। কিন্তু ভগবানের নাম কর্‌তে কর্‌তে মান যশের আকাঙ্ক্ষা চলে যায়; চিত্ত শুদ্ধ হয়।

* * * *

সৎগ্রন্থ, যাতে ভগবানের কথাবার্ত্তা আছে তারা সৎসঙ্গের কাজ করে। সকল সময়েই ত আর ভগবানের নাম কর্‌তে পারা যায় না সেই জন্য ঐইরূপ গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। তাতেও ভগবানের স্মরণ-মনন করা হয়। যাঁরা দিনরাত ভগবানের নাম কর্‌তে পারে তাদের সহিত ভগবানের কি তফাৎ?

* * * *

ঠিক ঠিক গুরু, শিষ্যকে ভক্তি শ্রদ্ধা দেন। যে শিষ্য টাকাকড়ি, মানযশ চায় তাদের কখনও সৎগুরু লাভ হয় না। যারা ভগবানের দর্শন প্রার্থনা করে তারা সৎলোকের নিকট জাগাতিক কোন সুখের আশা না থাকলেও যায়।

* * * *

অভাব থাক্‌তে মানুষ ঠিক ঠিক ভগবানকে ডাক্‌তে পারে না। কিন্তু মানুষের অভাবের সীমা নেই। অভাববোধ এমনি জিনিষ যত মনে কর্‌বে আমার অভাব আছে ততই দেখ্‌বে অভাব বাড়্‌ছে। সেইজন্য যারা ভগবানকে পেতে চায় তাদের নিবৃত্তি অবলম্বন করা উচিত।

* *

[illegible]নি পাজি যে, যদি ভগবানকে ডাক্‌বার কখনও ইচ্ছা হল, ত অমনি খতাতে বসি যে, আমি যদি ভগবানে মন প্রাণ সমর্পণ করি, তাহা হইলে, আমাকে খাওয়াবেই বা কে, আমার পরিবার-বর্গকে খাও[illegible]বে কে, আমি থাক্‌বো কোথায় ইত্যাদি। কিন্তু একটু ভেবে দেখি না পৃথিবীতে এতলোক যে ভগবানের জন্য ঘর বাড়ী ত্যাগ

করেছে তাদের কি কখনও কোন অভাব হয়েছে! ভগবানের জন্য যে ত্যাগ করে, তাকে তিনিই খেতে দেন, পড়্‌তে দেন, বল ভরসা সব দেন। তার সমস্ত সুবিধা করে দেন—তাঁর নাম নিয়ে একবার বেরিয়ে পর্‌তে পার্‌লেই হল।

* * * *

ঠিক ঠিক গুরু শিষ্যের সংস্কার, মনের গতি, পূর্ব্বের কর্ম্ম ইত্যাদি বিচার করে কথা বলেন—যাতে তার উপকার হয়। সেই জন্য যার তার কথা শুনে নাচ্‌তে নেই। এ এটা বল্‌লে, সে সেটা বল্‌লে, সকলের কথা শুনে নেচে এধারও হয় না ওধারও হয় না।

* * * *

হাজার হাজার ধর্ম্মকথা জানার চেয়ে, বলার চেয়ে, লোককে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে ভগবানকে ডাকা ভাল।

সফল সাধনা।

(শ্রীমায়াময় মিত্র)

কার্ত্তিক মাসে পবিত্র তপোভূমি উত্তরাখণ্ডের প্রসিদ্ধ তীর্থ কেদারনাথের পট (দ্বার) দীপান্বিতা অমাবস্যার পর বন্ধ হয়। শীত-ঋতুর প্রারম্ভেই এ অঞ্চলে যাত্রীর সংখ্যা বিরল হইয়া থাকে।

দীর্ঘ ছয়মাসকাল এই তুষারাবৃত কেদারের রাজ্যে বাস করিয়া প্রধান পূজারী ও সেবকগণ গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত। আজই মধ্যাহ্নে নিয়মিত পূজার পর মন্দির বন্ধ হইয়াছে। আবার বৈশাখ মাসে সাধারণের জন্য পট খোলা হইবে। প্রবল শীতে কেহই সেখানেই বাস করিতে পারেন না। আবার প্রবাদও আছে শীতের কয় মাস দেবতারা কেদারনাথের পূজা করিয়া থাকেন সুতরাং মর্ত্ত্যবাসীর সে সময়ে দর্শনাদির সুযোগ হয় না।

অপরাহ্নে জনৈক সাধু দীর্ঘ পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া রুদ্ধ মন্দির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দর্শনপ্রার্থী হইয়া তিনি প্রধান পূজরীকে একটিবার দ্বার খুলিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সনির্বন্ধ অনুরোধ ও কাতর প্রার্থনাসত্ত্বেও পূজারী সংক্ষেপে জানাইলেন প্রচলিত প্রথা ভঙ্গ করিয়া আগামী বৈশাখের পূর্ব্বে মন্দিরদ্বার কিছুতেই খুলিতে পারা যায় না।

একনিষ্ঠ সাধক চিরপোষিত আশাভঙ্গে ব্যথিত হইয়া সংকল্প করিলেন যে, ইষ্ট দর্শন না করিয়া তিনি কিছুতেই এস্থান ত্যাগ করিবেন না; মন্দিরের উপকণ্ঠে কোথাও বাস করিবেন।

পূজারী তাঁহাকে এই জীবন-সংশয় কঠোর প্রতিজ্ঞা হইতে নিরস্ত করিবার বহু চেষ্টা করিলেন। উত্তরে সাধক জানাইলেন যে, প্রবল শীতে যদি তাঁহার দেহপাতও হয় তাহাও বরং বাঞ্ছনীয় তথাপি তিনি দর্শন পূজাদি না করিয়া অন্যত্র যাইবেন না।

পূজারী ও সেবকগণ ফিরিয়া গেলেন, অল্পসময়ের মধ্যেই সেই জনমুখরিত যাত্রীবহুল তীর্থভূমি নীরব হইয়া গেল। সন্ধ্যার ঘনচ্ছায়া পর্ব্বতগাত্র ছাইয়া ফেলিল। তপস্বী কেবলমাত্র সেই বিজন গম্ভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে একাকী বিষণ্ণচিত্তে স্বীয় মন্দ ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া শিবসকাশে মনবেদনা নিবেদন করিতে লাগিলেন।

তপস্বী কিয়ৎক্ষণ পরে মন্দির পার্শ্বে পদশব্দ শুনিয়া সেই দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া দেখেন যে, এক প্রসন্ন বদন বিভূতি মণ্ডিত সন্ন্যাসী তাঁহারই

দিকে আসিতেছেন। তিনি সেই সৌম্য-গঠন জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসীকে নির্নিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন।

নবাগত সন্ন্যাসী তপস্বীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয় আপনি এমন সময়ে কাহার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছেন?"

সাধক সংক্ষেপে স্বীয় মন্দভাগ্যের কথা বিবৃত করিলেন। সন্ন্যাসী তাহার মনঃক্ষোভ নিবারণ উদ্দেশ্যে বলিলেন, "আসুন, আপাততঃ শীত নিবারণের জন্য ধুনি প্রজ্বলিত করিয়া অদ্য রাত্র অতিবাহিত করিবার চেষ্টা করি।"

অপরিচিত হইলেও নবাগত সন্ন্যাসীর সরল ব্যবহারে অল্প সময়েই উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ জন্মিল।

পরে তিনি তপস্বীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন খেলা ধূলা জানেন কি?"

তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ দাবা খেলা একটু জানি"—পরক্ষণেই ক্ষুদ্র ঝুলিটির ভিতর হইতে একখানি ছক ও খেলার সরঞ্জাম বাহির হইল।

উভয়ে মগ্ন হইয়া খেলিতে লাগিলেন।

* * * *

ঊষার রক্তিম ছটায় পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত হইয়া উঠিল—তপস্বী ফিরিয়া দেখিলেন রাত্র ভোর হইয়াছে। সন্ন্যাসী তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া বলিলেন, "খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; আমি প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া আসি, আপাততঃ খেলা বন্ধ থাক।" এই বলিয়া তিনি ছক প্রভৃতি ঝুলির ভিতর পুরিয়া উঠিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরেই প্রধান পূজারী ও সেবকগণ মন্দিরসমীপে আসিয়া দ্বার উন্মুক্ত করায় তপস্বী জিজ্ঞাসা করিলেন, "গতকল্য সন্ধ্যায় আমার

সকাতর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া গেলেন—অথচ আজ প্রভাতেই সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পট খুলিতেছেন, আপনার এই ব্যবহারের অর্থ কি?"

বিস্ময়ে পূজারী বলিলেন, "সে কি আমরা যে ছয় মাস পরে আজ এই প্রথম আসিলাম; আপনি কি এতদিন এই খানেই ছিলেন?"

পরে সেই সন্ন্যাসীর অশ্রুতপূর্ব্ব খেলার কথা শুনিয়া সকলেরই ভ্রম ঘুচিয়া গেল। তপস্বীর সফল সাধনায় উপস্থিত জনমণ্ডলী বিস্মিত হইয়া গেলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের পঞ্চপঞ্চাশৎ জন্মোৎসব।

বিগত ১৫ই জানুয়ারী, সোমবার, বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে তিথিপূজা ও ২১ জানুয়ারী, রবিবার, মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তিথিপূজার দিন স্বামীজির গৃহ এবং সমাধি-মন্দির নানাবর্ণের বিবিধ সুগন্ধি পুষ্পাদির দ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ স্বামীজির গৃহটীতে ফুলগুলি এবং স্বামীজি যে সকল জিনিষপত্র ব্যবহার করিতেন সেইগুলি এরূপভাবে সংস্থাপিত হইয়াছিল যে, উক্ত স্থানে উপস্থিত হইবামাত্রই মনে হইতেছিল, স্বামীজি বুঝি ভক্তগণের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণান্তর এইমাত্র অন্যত্র গমন করিয়াছেন। সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলগুলিকেও দেখিয়া মনে হইতেছিল তাহারাও যেন মহাপুরুষের সেবায় ব্যবহৃত হওয়ায় নিজদিগকে ধন্য

এবং অপর সকল পুষ্প অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেছে। এবং ফুলগুলি ভক্তবিশেষের প্রাণেও সেই মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের সহিত স্থানবিনিময়ের বাসনা উদ্দীপিত করিয়া দিতেছিল। উক্ত দিবস প্রায় সহস্রাধিক ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই স্বামীজির যথাবিধি পূজা ও ভোগরাগের পর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে পরিতৃপ্ত জ্ঞান করিয়াছিলেন।

মহোৎসবের দিবস মঠবাটী নানাবিধ পতাকা, পুষ্প, মাল্য প্রভৃতি দ্বারা অতি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। উক্ত দিবস সকলেরই মুখে তাহারা তাহাদের আদর্শ পুরুষের জন্মোৎসবে যোগদান করিতে যাইতেছে বলিয়া যেন একটা আনন্দ ও উৎসাহের ভাব লক্ষিত হইতেছিল। মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে স্বামীজির গৈরিক-বস্ত্র পরিহিত সন্ন্যাসিবেশের তৈলচিত্রখানি মস এবং নানাবিধ লতাপাতা এবং পুষ্প-সম্ভারে সজ্জিত হইয়া স্থাপিত হওয়ায় দর্শকগণের মনে যুগপৎ ভক্তি এবং ত্যাগের ভাব সঞ্চারিত করিয়া দিতেছিল। চিত্রসম্মুখে প্রথমে কন্‌সার্ট ও পরে বাঁ্যাটরা কালীকীর্ত্তনসম্প্রদায় কর্ত্তৃক মধুর মাতৃনাম গীত হওয়ায় স্থানটীকে এরূপ ভাবময় করিয়া তুলিয়াছিল যে, উক্ত স্থানে যাইবামাত্রই সকলের মন ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া পড়িতেছিল। স্বামীজির সমাধি-মন্দির ও তাঁহার মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তিটী অতি সুন্দরভাবে পুষ্পাদির দ্বারা সাজান হইয়াছিল। উৎসবের প্রধান অঙ্গ দরিদ্র-নারায়ণ সেবা অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই সেবাকার্য্যে যুবকগণের উৎসাহ দর্শন করিলে মনে হয়, স্বামীজি যে বলিয়াছিলেন,—আমার ভক্তগণ পরে আসিতেছে; তাহা বোধ হয় ইহারাই। মান অপমানের কথা ভুলিয়া, সকলকে আত্মজ্ঞানে, শুধু সেবার অধিকারে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত অনুভব করিয়া সেবা করিবার ভাব যে ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা তাহাদের কার্য্যকলাপেই বেশ প্রতীয়মান হইতেছিল। স্বামীজি ইহাদের এই ভাব চিরজাগরূক রাখুন! এই উপলক্ষে আমাদের স্মরণ করা উচিত স্বামীজি অন্নদান অপেক্ষা বিদ্যাদান এবং তদপেক্ষা জ্ঞান-

দানের দ্বারা সেবা করাকে শ্রেষ্ঠ বলিতেন। কিন্তু ঐরূপ সেবা করিতে হইলে উহা নিজদিগকেই প্রথমে অধিগত করিতে হইবে। উহা অধিগত হইলে তবেই আমরা বিদ্যা এবং জ্ঞানদানের দ্বারা অপরকে সেবা করিতে সক্ষম হইব। অতএব, আসুন, আমরা সকলে সেই মহাপুরুষের জন্মোৎসব দিন হইতেই, দরিদ্র নারায়ণগণকে সেবা করাই যাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল, যিনি উক্ত কার্য্যে নিজ জীবন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আশির্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া এইরূপভাবে সেবায় যত্নবান হই।

উক্ত দিবস প্রায় চতুঃসহস্রাধিক দরিদ্রনারায়ণ তৃপ্তিসহকারে সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা ব্যতীত আরও তিন সহস্র ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রায় দশ সহস্র ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন। তাঁহাদের মুহুর্মুহু 'জয় স্বামীজির জয়' ধ্বনি সকলেরই প্রাণে আনন্দের ধারা প্রবাহিত করিয়া দিতেছিল। অবশেষে সন্ধ্যাসমাগমে যখন ভক্তবৃন্দ দলে দলে নৌকাযোগে কিম্বা অন্য পথে চলিয়া যাইতে লাগিলেন—তখন বাস্তবিকই অপর সকলকে এই আনন্দের পর একটু বিমর্ষ হইতে হইয়াছিল।

ময়লাপুর, মাদ্রাজ, শ্রীরামকৃষ্ণ হোমে শ্রীশ্রীস্বামীজির তিথিপূজা এবং জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবের দিবস মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কীর্ত্তন ও ভজনাদি হয়। তাহার পর সমাগত প্রায় দুই সহস্র ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ পান। বৈকালে দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত পি, কেশবা পিল্লাই মহাশয়ের সভাপতিত্বে সদালোচনার জন্য একটী সভা আহূত হয়। প্রথমেই ব্রহ্ম শ্রীচক্রবর্ত্তী আয়েঙ্গার মহাশয় 'বিভীষণের শরণাগতি' সম্বন্ধে বলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত এম, কে, তাথাচারিয়ার, বি, এ, মহোদয় তামিল ভাষায় 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের সার্থকতা' সম্বন্ধে এবং চিঙ্গলিপুটের জেলামুন্সেফ শ্রীযুক্ত সি, ভি,

কৃষ্ণস্বামী আয়ার বি, এ, বি, এল, মহাশয় ইংরাজী ভাষায় "হিন্দু-শ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় স্বামীজির সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিবার পর সভা এবং উৎসব সমাপ্ত হয়।

বাঙ্গলোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীস্বামীজির জন্মোৎসব উপলক্ষে তিথিপূজা ও উৎসব হইয়া গিয়াছে। তিথিপূজার দিন যথাবিধি পূজা ও ভোগরাগাদির পর বৈকালে প্রায় একশত বালকবালিকাকে প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং রাত্রে প্রায় ২৫০।৩০০ ভক্ত প্রসাদ পান। উৎসবের দিবস সহরের কয়েক স্থান হইতে ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের ও স্বামীজির প্রতিমূর্ত্তি রথাদিতে স্থাপন করিয়া ভজন করিতে করিতে প্রায় বেলা ১২॥০ সময় আশ্রমে আগমন করেন। তৎপরে বেলা ৫॥০ পর্য্যন্ত প্রায় ২০০০ লোক প্রসাদ পান। অবশেষে ইংরাজী ও কানাড়ী ভাষায় স্বামীজির সম্বন্ধে বক্তৃতার পর উৎসব সন্ধ্যাসমাগমে সমাপ্ত হয়।

সারগাছি (বহরমপুর) শ্রীরামকৃষ্ণমিশন অনাথ আশ্রমে শ্রীশ্রীস্বামীজির জন্মোৎসব উপলক্ষে যথাবিধি তিথিপূজা ও উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত দুই দিবসই পাঠশালার ছাত্রগণকে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কৃষকগণকে ভোজন করান হইয়াছিল।

মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীস্বামিজীর তিথিপূজা ও তদুপলক্ষে উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

উৎসবের দিবস স্তোত্র পাঠ, গান, ভজন, পূজা ইত্যাদি হয়। উক্ত দিবস প্রায় ৫০০ দরিদ্রনারায়ণ ও ভদ্রলোক তৃপ্তির সহিত প্রসাদ পান।

কনখল, বৃন্দাবন, কাশী, মায়াবতী প্রভৃতি মিশনের ও মঠের অন্যান্য কেন্দ্রসমূহেও স্বামীজির জন্মোৎসব যথাবিধি সমারোহের সহিত হইয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই ভক্তগণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আগামী ১৩ই ফাল্গুন, সন ১৩২৩ সাল, ইংরাজি ২৫ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭, রবিবার ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দ্ব্যশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড়মঠে মহোৎসব হইবে। ভক্তগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

আমরা কনখল, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অক্টোবর মাসের রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। গত পৌষ সংখ্যায় আমরা উক্ত আশ্রমের সেপ্টেম্বর মাসের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছি তাহাতে সাধারণকে জ্ঞাত করিয়াছি যে, ১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাসের তুলনায় সেপ্টেম্বর মাসে যাহাদিগকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়, তাহাদের সংখ্যা সাড়ে সাতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অর্থাৎ ঐ প্রকার রোগী জানুয়ারীতে ৭টী ভর্ত্তি হইয়াছিল, সেপ্টেম্বরে ৫২ জন ভর্ত্তি হয়। কিন্তু অক্টোবরের যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে ঐ মাসে ঐরূপ নূতন রোগী ৭৪ জন ভর্ত্তি হয়, এবং ১১ জন পুরাতন রোগী ছিল। ইহাদের মধ্যে ৬৭ জন আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, ২ জন মারা যায়, ৪ জন চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং ১২ জন

মাসশেষেও চিকিৎসাধীন আছে। গত সেপ্টেম্বরে ৫২ জন রোগীকেই স্থানাভাববশতঃ, যক্ষ্মা-ওয়ার্ডের ন্যায় অবাঞ্ছনীয় স্থানে, রোগীর সংখ্যা কম থাকায় রাখা হইয়াছিল, এবার যখন গত আলোচিত মাস অপেক্ষাও রোগীর সংখ্যা ২২ জন অধিক, তখন তাহাদিগকে স্থান দান করা কিরূপ দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বলা অসম্ভব। রোগীর সংখ্যা এরূপ মাস মাস বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয় সাধারণ রোগীদিগকে রাখিবার জন্য অন্ততঃ চারিটী ঘর সংযুক্ত একটী ওযার্ড নির্ম্মাণের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই ওযার্ড নির্ম্মাণের সম্ভাবিত ব্যয় ৫০০০্ টাকা। ঐ ওয়ার্ডের দুইটী ঘর নির্ম্মাণের জন্য ২৫০০্ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। সিয়ারসোলের রাণী শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী একখানি ঘর নির্ম্মাণের ব্যয ১২৫০্ টাকা এবং বম্বের সেট রামদাস কিষণদাস আর একখানি ঘরের জন্য ১২৫০্ টাকা দান করিয়া আশ্রমবাসিগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এখনও দুইখানি ঘর নির্ম্মাণের জন্য অর্থের প্রয়োজন। যাঁহারা এ দরিদ্র-নারায়ণগণের সেবার সহিত নিজেদের প্রিয়জনের নাম জড়িত রাখিতে চান, তাঁহারা উক্ত দুইখানি কিম্বা একখানি ঘরের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিয়া উক্ত ঘরের উপর মার্ব্বেল পাথর বসাইয়া তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত উক্ত ওয়ার্ড নির্ম্মাণার্থ কিম্বা আশ্রমের অন্যান্য ব্যয়ের জন্য যিনি যাহা দান করিতে চান তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে পারেন।

অক্টোবর মাসে যাহারা আশ্রমে আসিয়া ঔষধ লইযা গিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা ৩৪৮৩ জন; তন্মধ্যে ১৪৮৭ জন নূতন রোগী।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—স্বামী কল্যাণানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনখল পোঃ সাহারানপুর।

বিগত ২৮শে জানুয়ারী, রবিবার, কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর স্বামী বিবেকানন্দের পঞ্চপঞ্চাশৎ জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউট হলে একটী সভা আহূত হয়।

কুচবিহার অধিপতি মহারাজ স্যার জিতেন্দ্রনারায়ণ ভুপ বাহাদুর, কে, সি, এস, আই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত এ, চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর, ডাক্তার হিরালাল বসু প্রভৃতি গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইনিষ্টিটিউটের সুপ্রশস্ত হলটী জনসমাগমেপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ডেইসের দুইধারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামীজির দুইখানি তৈলচিত্র পুষ্পাদির দ্বারা সজ্জিত হইয়া স্থাপিত হইয়াছিল।

স্বামী সারদানন্দ কর্ত্তৃক মঙ্গলাচরণের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত পুলীনবিহারি মিত্র 'স্তিমিত চিৎসিন্ধু নীরে' এই গানটী সুললিত কণ্ঠে গাহিবার পর, শ্রীযুক্ত দয়াময় মিত্র স্বামীজি রচিত 'To The Awakened India' নামক ইংরাজী কবিতাটী অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করেন। তৎপরে বিবেকানন্দ সোসাইটী যে তিনটী উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত—(১) বেদান্তের সার্ব্বজনীনভাব যাহা স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নিজেদের জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই ভাবের আলোচনা এবং উপলব্ধি করা; (২) উহা সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে প্রচার করা; এবং (৩) প্রত্যেক মানবকে ভগবানের সাক্ষাৎ বিগ্রহ জ্ঞানে তাঁহাদের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সহায়তা করিয়া সেবা করা—তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য গত বৎসর সোসাইটী যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করা হয়। উহাতে দেখা যায় সোসাইটী গত বৎসর সাধারণের মধ্যে বেদান্তের সত্যসমূহ প্রচারের জন্য খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের সহায়তায় সাধারণ সমক্ষে ৩৬টী বেদান্ত বক্তৃতার, সপ্তাহিক একটী করিয়া গীতাক্লাশ ও কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন পল্লিতে ১২টী ধর্ম্ম সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আরও দেখা যায় সদস্যগণ যাহাতে নিজ নিজ ইষ্ট এবং উপাস্যসম্বন্ধে নির্জ্জনে চিন্তা করিতে পারেন তজ্জন্য সোসাইটীর একটী ধ্যানগৃহ আছে। সোসাইটীর

কিঞ্চিৎ অধিক পাঁচশত সৎগ্রন্থাবলী সম্বলিত একটী লাইব্রেরী এবং সাধারণের জন্য একটী পাঠাগারও আছে—তথায় সাধারণে সৎগ্রন্থ পাঠ এবং সৎচর্চ্চা করিতে পারেন। দরিদ্র বিদ্যার্থীদের জন্য একটী ষ্টুডেণ্টস ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছে। ১৯টী ছাত্র উক্ত ফণ্ড হইতে মাসিক ১৲ টাকা করিয়া সাহায্য পাইতেছেন। ইহা ব্যতীত সদস্যগণ সাধারণ জনহিতকর ও সেবাকার্য্যে যথাসাধ্য অর্থ এবং সেবক প্রেরণ দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনকে সাহায্য করিয়াছেন। সোসাইটীর এখন সদস্য সংখ্যা ১২০ জন।

কার্য্যবিবরণী পাঠের পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বার-এট ল মহাশয় ইংরাজীতে বেদান্তের সিদ্ধান্তসমূহের আলোচনা করেন। তৎপরে মাননীয় জাষ্টিস উড্‌রফ সংক্ষেপে তন্ত্রের সহিত বেদান্তের সম্বন্ধ ইংরাজী ভাষায় বিবৃত করেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় স্বামীজিকে বেদান্তের সত্যসমূহের পুনঃ-প্রচারক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া সমাগত জনমণ্ডলীকে তাঁহার জন্মোৎসবের দিন হইতেই উক্ত সত্যসমূহ উপলব্ধি এবং তাহাদের প্রচারার্থ চেষ্টান্বিত হইবার জন্য আহ্বান করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয়, আমরা ভাবের ঘরে চুরি না করিলে যে নিজেদের নিজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইব এবং উহা যে স্বামীজির জীবনের একটা মস্ত কথা তাহা তাঁহার জীবনের দুই একটী ঘটনার বিবৃতির দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় স্বামীজি যে সকল শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলেন। তাহাদের মধ্যে মানুষ গড়িয়া তোলা (Man making principle) যে তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ ছিল এবং আপামর সাধারণের মধ্যে জাগতিক শিক্ষার বিস্তারেই যে জাতীয় উন্মেষ সম্ভবপর এই দুইটীর বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সর্ব্বশেষে স্বামীজি রচিত 'নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি'—'এই

গানটী গীত এবং মহাবীরের পূজা ও রামনাম সংকীর্ত্তনান্তর সভা ভঙ্গ হয়।

সারগাছি (বহরমপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন অনাথ আশ্রমে দুই বৎসর যাবত একটী লাইব্রেরীগৃহ নির্ম্মাণের চেষ্টা হইয়া আসিতেছি। উহার নির্ম্মাণ কার্য্য কতক পরিমাণে অগ্রসর হইলেও অর্থাভাববশতঃ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর উহার নির্ম্মাণ কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করিবেন বলিয়াছেন, এমন কি, তিনি স্বয়ং কোষাধ্যক্ষ হইয়া তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেও উদ্যত হইয়াছেন। মাননীয় কুমার বাহাদুর এই সৎউদ্দেশ্যের জন্য আশ্রমবাসী এবং সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যদুপতি চট্টোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি, ২৫০৲ টাকা; মাননীয় রাজা বিজয় সিং দুধোরিয়া, আজিমগঞ্জ, ১০০৲ টাকা এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামলাল ঘোষ, রামকৃষ্ণপুর, ৬৬৲ টাকা উক্ত লাইব্রেরী নির্ম্মাণার্থ ইতিপূর্ব্বে দান করিয়া আশ্রমের সকলকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণও আশ্রমের অন্যান্য কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া এবং উহার ব্যয়ভার বহনার্থ অর্থ সহায্য করিয়া আশ্রমবাসিগণকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। পাকপাড়ার রাণী শ্রীমতী দেবেন্দ্র বালা আশ্রমের জমীর (৫০ বিঘা) বার্ষিক ২০০৲ টাকা খাজনার জন্য এক কালীন ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। মুক্তাগাছার রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্যচৌধুরী উক্ত জমির খাজনার জন্য বাৎসরিক ১০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আশ্রমের সাধারণ-হিতার্থে রাজা বিজয় সিংহ দুধোরিয়া বার্ষিক ৬০৲ টাকা এবং এককালীন দান হিসাবে মিঃ বি, কে, চক্রবর্ত্তী বার-এট ল, ২০৲; মিঃ জি, সি, গডফ্রে, বি, এন, রেলের এজেণ্ট, ২০০৲ টাকা;

রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, দিনাজপুর, ৫৲ ; এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু, ঘুম ৪০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত দিনাজপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আশমস্থ বালক ও সেবকগণকে ভূরী ভোজন করাইয়া এবং ৺শারদীয় পূজার সময় তাঁহাদের জন্য বস্ত্র ইত্যাদি এবং শীতেরসময় শীতবস্ত্র পাঠাইয়া দিয়া সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

আমরা বৃন্দাবন, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের বিগত জানুয়ারী মাসের কার্যবিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। উহাতে দেখা যায়, যাহাদিগকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয় এরূপ রোগী গত বৎসরের ৬ জন ছিল এবং আলোচ্য মাসে ২১ জন নূতন রোগী আসে। তাহাদের মধ্যে ১৪ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে, দুই জন মারা পড়িয়াছে, দুই জন চলিয়া যায় এবং ৮ জন চিকিৎসাধীন আছে। যাহারা ঔষধ লইয়া যায় এরূপ রোগীর সংখ্যা ২২২৫ তাহার মধ্যে ৬৬ জন নূতন এবং অবশিষ্ট উহাদেরই পুনরাবৃত্তি। ইহা ছাড়া দুইজনকে তাহাদের বাড়ী যাইয়া ঔষধপথ্যাদির দ্বারা সেবা করা হইয়াছে। আলোচ্য মাসে মোট আয় ১২৫॥০ টাকা ; তন্মধ্যে মাসিক চাঁদা হিসাবে ১১৮॥০ টাকা এবং এককালীন দান হিসাবে ৭৲ টাকা। উক্ত মাসে মোট ৮৪৵॥৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে ; তন্মধ্যে সেবাশ্রমের সাধারণ খরচ বাবদ ১৫৩॥৫ টাকা এবং বিল্ডিং ফণ্ড হইতে ৬৫৯৵০ খরচ হইয়াছে।

১৪ই জানুয়ারী, ১৯১৭, কলিকাতা বাগবাজারস্থ 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটীর' প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সোসাইটীর সদস্যগণ পল্লীস্থ ভদ্রগৃহস্থের বাটী হইতে প্রতি সপ্তাহে চাউল সংগ্রহ করিয়া, পল্লীরই অভাবগ্রস্ত প্রতিবেশিগণকে চাউল সাহায্য করিয়া থাকেন। প্রত্যেক পল্লীতেই যদি এইরূপ

এক একটী করিয়া গরীবকে সাহায্য করিবার বন্দোবস্ত থাকে তাহা হইলে অনেক নিরন্নের অন্নের সংস্থান হয়। সোসাইটীর সদস্যগণের উপর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাণী বর্ষিত হউক।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী, ইংরাজীতে এবং বাঙ্গলায় "স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও উপদেশ" সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে যথাক্রমে একটী স্বর্ণপদক এবং একটী রৌপ্যপদক ও স্বামীজির সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী পারিতোষিকরূপে দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত এন, আর, কেদারী রাওএব—টিচার্স কলেজ, সৈদাপেঠ, মান্দ্রাজ—ইংরাজী প্রবন্ধটী এবং ময়মনসিং জেলার ঘারিন্দা নিবাসী, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাঙ্গালা প্রবন্ধটী উৎকৃষ্ট বলিয়া গৃহীত হওয়ায় তাঁহারা উক্ত পারিতোষিকদ্বয় লাভ করিয়াছেন।

বিগত পৌষ সংক্রান্তির গঙ্গাসাগর স্নান উপলক্ষে যাত্রিগণের সেবাকার্য্যের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় এবারও মিশন হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৮ জন সেবক গিয়াছিলেন। সেবকগণ নিম্নলিখিত ভাবে তীর্থযাত্রিগণের সেবা করেন। কলেরা ও অন্যান্য রোগীর সন্ধান করিয়া ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের ডাক্তারের সহযোগীতায় চিকিৎসা করা। কলেরা হাঁসপাতালটীর সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করা। এবৎসর দুইটী কলেরা রোগীকে সেবা করা হয় তাহারা দুই জনেই আরোগ্য লাভ করে। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বসমেত ১৩৬ জন রোগীকে সেবকগণ নানাপ্রকার রোগের জন্য চিকিৎসা করেন। যাতায়াতের পথে ষ্টিমারের উপর কয়েকজন রোগীকে ঔষধপথ্যাদি দিয়া সেবা করা হয়। জনতার মধ্যে যাত্রীরা আত্মীয়গণকে হরাইয়া ফেলিলে খুজিয়া তাহাদের স্বজনগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া।

মেসার্স হোরমিলার এণ্ড কোং এবৎসর ষ্টিমারের উপর ও মেলায় ব্যবহার করিবার জন্য সমস্ত ঔষধ ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ও সেবকগণের

যাতায়াতের জন্য ২০ খানি পাস দিয়া এবং মেসার্স কিলবরণ কোং ২০খানি পাস দিয়া মিশনের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মেলার কণ্ট্রাক্টার নিজ ব্যয়ে মিশনের জন্য ৩ খানি ঘর প্রস্তুত করিয়া দেন। সবডিভিসনল অফিসর, পুলিস, ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের কর্ম্মচারিগণ ও অপরাপর স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী মেলার কয়দিন অতি সহৃদয়তার সহিত সেবকগণকে সাহায্য করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

রোগীর পথ্য, সেবকগণের জন্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাবদ এবৎসর ১৭২৶০ আনা ব্যয় হইয়াছে। মেলার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট এককালীন অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সাসমল, কাঁথি, ৫০৲; মাঃ প্রেসিডেণ্ট, বিবেকানন্দ সোসাইটী, কলিকাতা, ১৬৷৷০ ; ও শ্রীযুক্ত নৃত্যানন্দ ধর, কলিকাতা, ২৲।

পথিক।

(শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ)

দিবস ফুরায়ে আসে ঘনাইছে অন্ধকার,
নিসঙ্গ ব্যথিত প্রাণে ছুটিয়াছি অনিবার।
হবে নাকি যাত্রা শেষ? পুরোভাগ কি বন্ধুর।
বিক্ষত চরণ দুটি যেতে নারে অত দূর।
চৌদিকে করাল ছায়া, চৌদিকে ভীতির গান,
পলে পলে করে হৃদি নিরাশায় ম্রিয়মান।
তবু যেতে হবে মোরে - নাহিক আশ্রয় আর,
দিবস ফুরায়ে আসে—ঘনাইছে অন্ধকার!

কবে যে অজানা দিনে, বাহিরিনু একদিন,
ছায়া তার পড়ে মনে স্বপ্নসম পরিক্ষীণ।
সেদিন প্রভাত-রবি প্রসারি পিঙ্গল কর
বলেছিল 'জাগ পান্থ, হও ত্বরা অগ্রসর।'
বাহিরিনু পথমাঝে নবোৎসাহে পূর্ণ হিয়া,
বাঁধিনু হৃদয় যন্ত্র বাসনার তন্ত্রী দিয়া।
সলজ্জ প্রকৃতিলক্ষ্মী গুণ্ঠন খুলিলা তার,
চারিদিকে কি উৎসব, কি সৌন্দর্য্য-পারাবার!

নবীন জীবনযাত্রী, নবীন পথের আলো,
ধরণীর নবীনতা বড়ই লাগিল ভাল।
পথমাঝে হল দেখা কতজন কব কায়,
আদরে ধরিয়া মোরে সকলে বাঁধিতে চায়।

জনকজননী-স্নেহ, সখা সখী প্রিয়ভাষী,
প্রিয়ার আনন-ইন্দু প্রবাহিল সুধারাশি,
পিয়ায় আয়েয় স্রোত, কোথা ক্লান্তি শ্রান্তি আর !
রূপ রস গন্ধে মরি পুলকিত চারিধার !

উদিল মধ্যাহ্ন রবি খর কর লাগে গায়,
একে একে প্রিয়জন বিদায় মাগিতে চায়।
এল ক্লান্তি—আশা তবু বলে বাড়াইয়া কর,
"অদূরে বিরাজে কুঞ্জ, হও পান্থ অগ্রসর।"
ছুটিলাম ছুটে যথা তৃষিত পথিক হায়,
এক বিন্দু বারি-আশে সুদুস্তর সাহারায়।
হৃদয়ে বাসনাসিন্ধু উদ্বেলিত নিরন্তর,
এলায়ে আসিল পদ, স্বেদসিক্ত কলেবর।

আজি এই অপরাহ্নে সজল দুইটি আঁখি,
কত না অতীত স্মৃতি পড়ে মনে থাকি থাকি।
পশ্চাতে চাহিয়া দেখি—চিহ্ন কিছু নাহি আর,
বিস্তৃত প্রান্তর শুধু ধূ ধূ করে অনিবার।
নিসঙ্গ সম্বলহীন দীন হতে দীনতম,
কে মোরে দেখাবে পথ, হরিবে আশঙ্কা মম !
দেখা দাও মায়াধীশ দেহ পদাশ্রয় আর,
দিবস ফুরায়ে আসে—ঘনাইছে অন্ধকার !

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

[যেমনটী দেখিয়াছি]

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঐতিহাসিক খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামিজীর মত।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

আমাদের জীবনের কোন কোন সুগভীর বিশ্বাসের মূলে এমন কতকগুলি ব্যাপার থাকে, যাহারা স্বভাবতঃই আমাদিগকে ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রভাবিত করিতে পারে না। যেমন, ব্যক্তিবিশেষ-সম্বন্ধে বা কাহারও কোন উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে আমরা তৎক্ষণাৎ যে ধারণা করিয়া লই, তাহা সেরূপ জীবন্তভাবে অপরকে বুঝান যায় না; তথাপি উহা আমাদের মনে একেবারে বদ্ধমূল হইয়া যায়। উহা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে, অর্থাৎ উহা হয়ত এমন এক সূক্ষ্ম দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা অতি অল্প লোকেরই পক্ষে সম্ভবপর; অথবা উহা ভাবপ্রসূত মাথার খেয়ালমাত্র হইতে পারে। যাহাই হউক না কেন, যাঁহার মনে একবার ঐরূপ প্রবল অনুভূতির ছাপ পড়িয়া গিয়াছে, তাঁহার পরজীবনের চিন্তাসমূহ অনেকটা উহার দ্বারা অনুরঞ্জিত হইবেই; আর অপরে, সৌভাগ্যক্রমে যদি উহা বাহ্য ঘটনার সহিত মিলিয়া যায়, তাহা হইলে উহাকে জ্ঞান বলিয়া বিবেচনা করিবে, আর দুরদৃষ্টবশতঃ যদি মিল না হয়, তবে উহাকে খেয়াল বলিয়া গণ্য করিবে। সেইরূপ, যদি তর্কের খাতিরে আমরা পুনর্জ্জন্মবাদকে সত্য বলিয়া মানিয়া লই, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও বুঝিতে পারি যে, কতকগুলি লোক আপনাদের অন্তরস্থ সুপ্ত স্মৃতিভাণ্ডারে মধ্যে মধ্যে প্রবেশসুখ লাভ করিতে পারেন; তাহা অপরের পক্ষে দুঃসাধ্য। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ইহাও সম্ভবপর যে, ঐরূপ

গতিবিধির ফলে তাঁহারা অনেক বিষয়ে মূল্যবান তথ্যের আভাস পাইতে পারেন, যদিও শুদ্ধ কল্পনা ও ইহার মধ্যে কতটুকু পার্থক্য, তাহা কেবল যিনি ঐরূপে অন্তররাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন।

আমার গুরুদেবের চিন্তা ও মনের উপর যে তিনটী অদ্ভুত আন্তর্জ্জগতিক অনুভূতি স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে কতকটা ঐভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে প্রধান, সম্ভবতঃ,—তাঁহার ধ্যানযোগে সিন্ধুনদতীরে এক বৃদ্ধকে বৈদিক ঋঙ্মন্ত্র আবৃত্তি করিতে দেখা। উহা হইতেই তিনি তাঁহার সংস্কৃত আবৃত্তির অদ্ভুত রীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন; উহা সাধারণ বেদোচ্চারণপ্রণালী অপেক্ষা, অনেকাংশে গ্রিগরি-প্রবর্ত্তিত সাদাসিধা সুরের* সদৃশ। তিনি সর্ব্বদা বিশ্বাস করিতেন যে, এই উপায়ে তিনি আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণের সঙ্গীতের সুরটী পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের কবিতাবলীতে তিনি এমন কিছু দেখিতে পাইয়াছিলেন, যাহার সহিত এই আবৃত্তিকরণপ্রণালীর আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য আছে। এই ঘটনাটীর প্রসঙ্গেই তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আচার্য্য শঙ্করও তাঁহারই ন্যায় কোন প্রকারের দর্শন হইতে বেদোচ্চারণরীতির ইঙ্গিত পাইয়া থাকিবেন। †

ঐরূপ আর একটী অনুভূতি তাঁহার বাল্যকালে উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি তখন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট গমনাগমন

*খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পোপ প্রথম গ্রিগরি রোম্যান-ক্যাথলিক উপাসনার অঙ্গস্বরূপ উক্ত সুরের প্রবর্ত্তনা করেন। উহা সাদাসিধা অথচ গম্ভীর, এবং উহাতে বেশী আরোহ অবরোহ নাই।

† স্বামী সারদানন্দ বলেন—স্বামিজীর ঐ দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের প্রায় দুই বৎসর পরে, সম্ভবতঃ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ঘটিয়াছিল। যে মন্ত্রটী তিনি শুনিয়াছিলেন তাহা গায়ত্রী দেবীর আবাহন :—

"আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে॥"

করিতেছেন। একদিন তিনি বাটীতে নিজ ক্ষুদ্র পাঠাগারে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার সম্মুখে এক দীর্ঘাকৃতি আয়তবপুঃ পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বদনে এমন একটী স্থির, গভীর শান্তি বিরাজ করিতেছিল যে, তরুণবয়স্ক স্বামিজী তাঁহার দিকে চাহিয়া বোধ করিলেন যেন তিনি অনন্তকাল ধরিয়া দুঃখ ও সুখ উভয়ই বিস্মৃত হইয়াছেন। সাধক আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আগত পুরুষপ্রবরের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন; তৎপরে ভক্তি ও বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার বোধ হইল, যেন সম্মুখস্থ মূর্ত্তি কিছু বলিবেন। কিন্তু উহাতে বালকের মনে কেমন একটা ভয়ের সঞ্চার হইল, এবং তিনি কি বলেন শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া, তিনি আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। এই দর্শন সম্বন্ধেই স্বামিজী পরে বলিয়াছিলেন যে, ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার বাল্যকালে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। "আর আমি তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়াছিলাম, কারণ আমি জানিতাম, স্বয়ং ভগবান্ই আসিয়াছেন।" বুদ্ধের প্রতি স্বামিজীর যে জীবন্ত জ্বলন্ত ভাব ছিল—তাঁহার অসাধারণ স্থিরবুদ্ধি সম্বন্ধে বিশ্বাস এবং তাঁহার অসীম ত্যাগ ও দয়া সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা, এ সকলের কতটা তাঁহার বাল্যের সেই সাক্ষাৎ দর্শনমুহূর্ত্ত হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে?

তাঁহার অন্তরঙ্গগণের যতদূর জানা আছে, তাঁহার এই বিশিষ্ট দর্শনগুলির তৃতীয় এবং শেষ দর্শন তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। বুঝা যায় যে, ইউরোপের ক্যাথলিক দেশসমূহে ভ্রমণকালে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী অপর সকলের ন্যায়, হিন্দুধর্ম্মের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের সহস্র নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে সৌসাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। খৃষ্টানদের Blessed Sacrament (ঈশ্বরোদ্দেশে রুটী ও মদ্য নিবেদন) তাঁহার নিকট হিন্দুদিগের ভোগ নিবেদনেরই রূপান্তর বলিয়া বোধ হইত। যাজকদিগের Tonsure বা মস্তকের কিয়দংশ মুণ্ডন, ভারতীয় সন্ন্যাসিগণের

মস্তকমুণ্ডনের কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিত। আর যখন তিনি একখানি চিত্রে দেখিলেন যে, জাষ্টিনিয়ান * দুইজন মুণ্ডিতমস্তক সাধুর নিকট হইতে মুসাপ্রচারিত ধর্ম্মবিধি গ্রহণ করিতেছেন, তখন তাঁহার মনে হইল, তিনি যাজকদিগের মস্তকের কিয়দংশ মুণ্ডন প্রথার উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার নিশ্চিত মনে ছিল যে, বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বেও ভারতে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী ছিল, এবং ইউরোপ Thebaid † নামক গ্রন্থ হইতে তাহার সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের ভাব গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু-ক্রিয়াকাণ্ডেও ধূপদীপ দান ও গীত-বাদ্যের ব্যবস্থা আছে। ক্যাথলিকদিগকে মধ্যে মধ্যে অঙ্গে অঙ্গুলি-দ্বারা ক্রুশের চিহ্ন অঙ্কিত করিতে দেখিয়া, তাঁহার হিন্দুদিগের পূজাদিতে ন্যাসের কথা মনে পড়িয়াছিল। তারপর যখন তিনি এক গীর্জ্জায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উহাতে অল্প কয়েকখানি মাত্র চেয়ার রহিয়াছে, এবং ঘেরা নির্দ্দিষ্ট আসন (Pews) মোটেই নাই—তখন তিনি এই বিষয়ের চরম নিদর্শন পাইলেন। এতদিন পরে তিনি যেন ঠিক নিজেদের দেশেই রহিয়াছেন, বোধ করিলেন। এখন হইতে আর তিনি খৃষ্টধর্ম্মকে বিদেশী জিনিস বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

আমি স্বামিজীর যে স্বপ্নবৃত্তান্তটী বলিতে যাইতেছি, আর কতকগুলি চিন্তা হয়ত তাঁহাকে অজ্ঞাতসারে উহার জন্য উন্মুখ করিয়া দিয়াছিল। উহাদিগের মূল এই :—আমেরিকায় তাঁহার এক ইহুদী শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বামিজীকে নিষ্ঠাবান্ ইহুদী-সমাজের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে অল্পবিস্তর মনোযোগ সহকারে ইহুদী-

* ফ্লেবিয়াস্ এনিসিয়াস্ জাষ্টিনিয়ানাস্ (৪৮৩ ৫৬৫) রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি তৎকালপ্রচলিত নীতিসমূহ "Corpus Juris Civilis" নামে সংগত করেন এবং এই জন্যই জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

† ষ্ট্যাসিউস প্রণীত থীবসের ইতিবৃত্তমূলক ল্যাটিন কাব্য—খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত। থীবস প্রাচীন গ্রীসের এক অংশের সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল সিংহাসনার্থী ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পর যুদ্ধই উহার আখ্যানবস্তু।

দিগের ধর্ম্মগ্রন্থ তালমুদ (Talmud) পাঠ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে স্বামিজী, যে পারিপার্শ্বিক চিন্তারাশির মধ্য হইতে সেণ্ট পল উদ্ভূত হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে সাধারণ লোকদের অপেক্ষা পরিষ্কার ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মালোচনা সম্বন্ধে আরও একটী বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি আমেরিকায় "কৃশ্চান সায়েন্স" নামক আন্দোলনটীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি একবার বলিয়াছিলেন যে, সকল ধর্ম্মেরই উৎপত্তি আলোচনা করিতে গেলে আমাদিগকে সর্ব্বদা তিনটী জিনিষের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—মতবাদ, কর্ম্মকাণ্ড এবং ইন্দ্রজাল অথবা অলৌকিক ব্যাপারজাতীয় আর একটী জিনিস, যাহা সচরাচর রোগ ভাল করা রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমার মনে হয়, তাঁহার উক্ত লক্ষণত্রয়ের শেষটীকে গণনা করার কারণ—কতকটা তাঁহার কৃশ্চান-সায়েন্স ও ঐ শ্রেণীর অপরাপর আন্দোলনের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা (তৎসঙ্গে তাঁহার নিজ বিশ্বাসের কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা এক্ষণে ধর্ম্মের এক নূতন মহা সমন্বয়ের দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছি), এবং কতকটা তাঁহার বক্ষ্যমান অনুভূতিটী—কারণ, উহা তাঁহার মস্তিষ্কে এত জ্বলন্তভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল যে, উহাকে তিনি জীবন্ত, বাস্তব প্রত্যক্ষ সকলেরই অন্যতম বলিয়া চিরকাল মনে রাখিয়াছিলেন।

রাত্রিকাল; তিনি নেপল্‌সে যে জাহাজে উঠিয়াছিলেন, তাহা তখনও পোর্ট সৈয়দ অভিমুখে চলিতেছে, এমন সময়ে তিনি এই স্বপ্নটী দেখেন। জনৈক বৃদ্ধ শ্মশ্রুধারী লোক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "যে স্থানটী তোমাকে দেখাইতেছি, ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও! তুমি এখন ক্রীট দ্বীপে। এই স্থানেই খৃষ্টধর্ম্মের আরম্ভ।" খৃষ্টধর্ম্মের এই উৎপত্তির সমর্থন জন্য বৃদ্ধ দুইটী শব্দের উল্লেখ করিল—তন্মধ্যে একটী শব্দ 'থেরাপিউটী'—এবং উভয়েই যে প্রত্যক্ষভাবে সংস্কৃত ধাতু হইতে উৎপন্ন, তাহাও বলিল। উত্তরকালে স্বামিজী

পুনঃ পুনঃ এই স্বপ্নটীর কথা বলিতেন এবং সর্ব্বদাই শব্দদ্বয়ের ধাতু-প্রত্যয় নির্দ্দেশ করিতেন। কিন্তু তথাপি অপর শব্দটী * আর এখন পাওয়া যাইতেছে না, বোধ হয় কখনও যাইবে না। বৃদ্ধ 'থেরাপিউটী' (থেরপুত্র) শব্দের অর্থ বলিয়াছিল—থের অর্থাৎ উচ্চপদস্থ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের পুত্রেরা। ভূমির দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বৃদ্ধ আরও বলিল, "প্রমাণ সব এইখানে আছে, খুঁড়িলেই দেখিতে পাইবে!"

স্বামিজী জাগিয়া উঠিলেন—বুঝিলেন যে, তিনি সাধারণ স্বপ্ন দেখেন নাই। তিনি বায়ু সেবনের জন্য কোন প্রকারে ডেকের উপরে বাহির হইয়া পড়িলেন। বাহিরে আসিয়াই জাহাজের একজন কর্ম্মচারীকে দেখিতে পাইলেন—তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কালব্যাপী কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া নিজ কামরায় ফিরিতেছেন। স্বামিজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কটা বাজিয়াছে?"

উত্তর হইল, "মধ্যরাত্রি।"

"আমরা এখন কোথায়?"

"ক্রীটের ঠিক পঞ্চাশ মাইল দূরে!"

এই অপ্রত্যাশিত ঐক্য দর্শনে স্বামিজী বিস্মিত হইলেন; উহাতে তাঁহার স্বপ্নটাকেও অনেকটা সত্য বলিয়া বোধ হইল। এক্ষণে তাঁহার বোধ হইল, যেন উক্ত অনুভূতি হইতে এমন কতকগুলি বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে, যাহা উহার সাহায্য ব্যতীত তাঁহার নিকট চিরকাল অর্থহীন ও অসম্বদ্ধই রহিয়া যাইত। পরে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে খৃষ্টের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কথা তাঁহার মনেই হয় নাই, কিন্তু ইহার পরে তিনি আর উহাতে পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। তিনি সহসা বুঝিতে পারিলেন যে, কেবল সেণ্ট পল সম্বন্ধেই আমরা নিশ্চিত হইতে পারি। Acts of the Apostles (খৃষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের কার্য্যাবলী) নামক

* আমার নিজের বিশ্বাস যে, দ্বিতীয় শব্দটী 'Essene'; কিন্তু দুঃখের বিষয় উহার সংস্কৃত ধাতুপ্রত্যয় আমার মনে নাই—নিবেদিতা।

গ্রন্থ Gospel (খৃষ্টের জীবনী) চতুষ্টয় অপেক্ষা কেন প্রাচীনতর, তিনি তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন। তিনি আরও অনুমান করিলেন যে, হয়ত খৃষ্টের উপদেশাবলী র‍্যাবি হিলেল (Rabbi Hillel)* হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এবং ন্যাজারীন নামক প্রাচীন সম্প্রদায় এবং তাহার সুদূর অতীতের গর্ভ হইতে প্রতিধ্বনিত সুন্দর সুন্দর উক্তিসমূহ,—হয়ত ইহারাই খৃষ্টের নাম ও জীবন, এই দুইটীকে জোগাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু যদিও তাঁহার দর্শনটী এইরূপে তাঁহার নিজ মনের উপর স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তথাপি তিনি উহাকে প্রমাণস্বরূপে অপরের নিকট উপস্থিত করিতে যাওয়াকে বাতুলতা জ্ঞান করিতেন। তিনি মনে করিতেন যে, এইরূপ অনুভূতির কোন ফলাফল আছে বলিয়া স্বীকার করিলে, উহা শুধু যিনি ঐরূপ অনুভব করিয়াছেন তাঁহারই কাজে আসিতে পারে। ইহার প্রভাবে স্বামিজী ন্যাজারেথ-সম্ভূত ঈশার ঐতিহাসিক চরিত্রকে অবিশ্বাস করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি ক্রীট দ্বীপই যে সম্ভবতঃ খৃষ্টধর্ম্মের জন্মভূমি, একথা কখনও বলেন নাই। উহা একটী অনুমান মাত্র, যাহার সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণ কেবল লৌকিক পণ্ডিতেরাই করিতে পারিবেন। এতৎ সংক্রান্ত ভৌগোলিক ব্যাপারসমূহের মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ায় ভারতীয় ও মিসরীয় উপকরণসমূহের সম্মিলনের সর্ব্বজনস্বীকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার কথাই শুধু তিনি উল্লেখ করিতেন। আর বিচারবুদ্ধির চক্ষে এই সন্দেহটুকু থাকিলেও, উহাতে তাঁহার মেরীতনয়ের প্রতি জ্বলন্ত প্রেমের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। হিন্দুদিগের মতে, কোন আদর্শের আদর্শহিসাবে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতাই আসল জিনিস, উহার দেশকালের সহিত সম্বন্ধ কতদূর সত্য তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং স্বামিজীর পক্ষে ভক্তির ভাব হইতে Sistine Madonna বা পুত্র-ক্রোড়ে খৃষ্টমাতার একখানি ছবিকে আশীর্ব্বাদ করিতে অস্বীকার, এবং

*ইহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান ব্যাখ্যাতৃবর্গের অন্যতম। ইনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

তৎপরিবর্ত্তে শ্রীভগবানের বালগোপালমূর্ত্তির পাদপদ্ম স্পর্শ করা খুব স্বাভাবিকই হইয়াছিল। সেইরূপ জনৈক মহিলার প্রশ্নের তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাও খুবই স্বাভাবিক হইয়াছিল,—"যদি আমি ন্যাজারেথ-নিবাসী ঈশার সময়ে প্যালেষ্টাইনে বাস করিতাম, তাহা হইলে আমি অশ্রুধারার পরিবর্ত্তে হৃদয়ের শোণিতে তাঁহার পাদযুগল ধৌত করিয়া দিতাম।" এতদ্ভিন্ন এ বিষয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্পষ্ট সম্মতিও পাইয়াছিলেন। বাল্যকালে তিনি ঐরূপ একটী প্রশ্ন সম্বন্ধে ব্যগ্রভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের মতামত জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "একথা কি তোমার মনে হয় না যে, যাঁহারা একরূপ সব জিনিস সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা অপরের উপাসনার নিমিত্ত যে সকল আদর্শ প্রচার করিলেন, নিজেরাই সে গুলির সজীব বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন ?"

সত্যলাভ।

(ব্রহ্মচারী বিমলচৈতন্য)

সত্য কি ?

উৎপত্তিশীল বস্তুমাত্রেই বিকার প্রাপ্ত হয়। বিকার ছয় প্রকার—জন্ম (birth), সত্তা (relative existence), বৃদ্ধি (growth), বিপরিণাম (change), অপক্ষয় (decay) ও বিনাশ (death)। একটী বৃক্ষের কথা ধরুন। এই বৃক্ষটী ইতিপূর্ব্বে ছিল না। একদিন একটী বীজ পুঁতিলাম, সেই বীজ রস ও উত্তাপ সহযোগে অঙ্কুরিত হইল—বৃক্ষটী জন্মলাভ করিল। এতদিন বৃক্ষের সত্তাই ছিল না ; জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের অস্তিত্ব হইল। তৎপরে বৃক্ষটী বড়

হইতে লাগিল ; ক্রমে তাহাতে পত্র, পুষ্প ও ফলোদ্গম হইল। বৃক্ষটী তাহার উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিল। এইবার বৃক্ষদেহের মূলীভূত কারণগুলি ধীরে ধীরে পৃথক্ হইতে লাগিল—কার্য্য কারণে লয় হইয়া গেল—বৃক্ষের ক্ষুদ্র জীবনের অবসান হইল—বৃক্ষ মরিয়া গেল। ইহাই নামরূপাত্মক যাবতীয় বস্তুর জীবনেতিহাস। কারণ, যাহা কিছু দেশ কাল-নিমিত্তের অধীন তাহাই কতকগুলি কারণের সমবায়ে গঠিত—তাহা বদ্ধ—তাহার অস্তিত্ব কারণগুলির উপর নির্ভর করিতেছে। যতদিন তাহারা সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবে ততদিনই বস্তুর অস্তিত্ব—যে মুহূর্ত্তে তাহারা পৃথক হইয়া যাইবে সেই মুহূর্ত্তে তাহার লয়। সূর্য্য, চন্দ্র, কোটী কোটী নক্ষত্রমণ্ডলী সকলেরই এই পরিণাম। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিমুহূর্ত্তে নব নব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে—তাই ইহার নাম জগৎ অর্থাৎ সদা পরিবর্ত্তনশীল—তাই ইহা অনিত্য—মিথ্যা।

তবে কি সত্য বলিয়া কিছুই নাই—সবই মিথ্যা—সবই দুদিনের ? আছে। এই দেশ-কাল-নিমিত্তের পারে এমন এক বস্তু আছে যাহা অপর কতকগুলি কারণের সমবায়ে জন্মলাভ করে না—যাহা এ থাকের বস্তু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। যাহার অস্তিত্ব ধার করা নয়—যাহা নিজের সত্তায় সত্তাবান্—যাহা অস্তিঃস্বরূপ। দেশে যাহার উদ্ভব নয়, দেশ যাহা হইতে উদ্ভূত ; কালে যাহার উদ্ভব নয়, কাল যাহা হইতে উদ্ভূত ; নিমিত্তে যাহার উদ্ভব নয়—নিমিত্ত যাহা হইতে উদ্ভূত।

এই দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত অবস্থা বুঝিতে হইলে, দেশ, কাল ও নিমিত্ত কি তাহা প্রথমে বুঝা আবশ্যক। পাশাপাশি দুইটী পদার্থ রহিয়াছে ; কে উহাদিগকে পৃথক্ করিতেছে ?—দেশ (Space)। পর পর দুইটী একই প্রকার শব্দ হইল ; কে উহাদের পৃথক্ জ্ঞান উৎপাদন করিল ? —কাল (Time)। আজ একটী বীজ রোপণ করিলাম, কাল উহা এক প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইল ; কে এই পার্থক্য ঘটাইল ? - নিমিত্ত (Causation)। অতএব

বহুত্বের জ্ঞান দেশ-কাল-নিমিত্ত হইতেই জন্মায়। বহুত্বজ্ঞানের আর অপর কোন কারণ নাই। সুতরাং যাহা দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত সেখানে দুই নাই—তাহা একমেবাদ্বিতীয়ং—তাহাই সত্য। যাহা এক তাহা অনন্ত, অসীম—কে তাহাকে সীমাবদ্ধ করিবে? তাহা অবিনাশী—কে তাহাকে বিনাশ করিবে? তাহা অভয়—কে তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিবে?

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র বা অস্য সর্ব্ব মাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ? তৎ কেন কং পশ্যেৎ? তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ? তৎ কেন কমভিবদেৎ? তৎ কেন কং মন্বীত? তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ? যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ? বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ?*

—বৃহদারণ্যকোপনিষদ্।

আমরা কি করিয়া এই মহান্ সত্যকে লাভ করিব? ধনের দ্বারাই ধন লাভ হয়। বিদ্যা দ্বারাই বিদ্যালাভ হয়, ত্যাগের দ্বারাই সন্ন্যাস লাভ হয়, প্রেমের দ্বারাই প্রেমস্বরূপকে লাভ করা যায়—আমরা সত্যের দ্বারাই সত্য লাভ করিব। শ্রুতি বলিতেছেন—

"সত্যেনলভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা।"

"সত্যমেব জয়তে নানৃতং

* যেখানে যেন দ্বৈতই হইয়াছে সেখানে এক অপরকে আঘ্রাণ করে, এক অপরকে দেখে, এক অপরকে শ্রবণ করে, এক অপরকে অভিবাদন করে, এক অপরকে চিন্তা করে এক অপরকে জানিতে পারে? আর যেখানে সমস্তই আত্মা হইয়া যায় সেখানে কে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে? কে কাহাকে দেখিবে? কে কাহাকে শ্রবণ করিবে? কে কাহাকে অভিবাদন করিবে? কে কাহাকে চিন্তা করিবে? কে কাহাকে জানিবে; যাহা দ্বারা এই সমস্তই বিজ্ঞাত হইতেছে, তাহাকে কে জানিবে? অয়ি মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে কে জানিবে?

সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।"

—মুণ্ডকোপনিষদ্।

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি।

—প্রশ্নোপনিষদ্।

তাঁহাদেরই এই বিরজঃ ব্রহ্মলোক যাঁহাদের কপটতা, মিথ্যা-ব্যবহার ও ছল নাই।

সত্যনিষ্ঠা ও তপস্যার দ্বারাই এই আত্মলাভ হয়। সত্যেরই জয় হয়। মিথ্যার কখনও জয় হয় না। সত্যের দ্বারাই সেই বিস্তীর্ণ দেবযান মার্গ লাভ করা যায়।

সত্যনিষ্ঠা বলিতে কি বুঝায়? কায়মনোবাক্যে সত্যপালনের নামই সত্যনিষ্ঠা। বাক্যে সত্যপালন, যথা—সত্য কথা বলা অর্থাৎ ফলাফলের দিকে না চাহিয়া কোন বিষয়ের যথাজ্ঞান বিবৃতি। মনে সত্যপালন, যথা—(১) মন হইতে সকল প্রকার মিথ্যা জল্পনা-কল্পনা পরিত্যাগ করা, অর্থাৎ কোন একটী অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াও তাহা গোপন করিবার জন্য মনে মনে কোন প্রকার মিথ্যা কল্পনার পোষণ না করা। (২) সর্ব্বদাই সদসৎ বিচার করা। কায়ে সত্যপালন তিন প্রকারের হইতে পারে। যথা—(১) কথা রক্ষা করা অর্থাৎ যাহা করিব বলিয়াছি তাহা কার্য্যে পালন করা। (২) অকপট ব্যবহার করা অর্থাৎ ভিতর বাহির সমান করিয়া চলা। যাহারা কপট তাহাদের মনে এক ভাব কিন্তু তাহারা বাহিরের হাবভাব চালচলনে অন্য প্রকার দেখায়—এরূপ না করা। (৩) মনে সদসৎ বিচার করিতে করিতে যেটী মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারিব তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত সমস্ত দৈহিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সত্যটী গ্রহণ করা।

অন্যান্য গুণ অপেক্ষা সত্যের এত আদর কেন? ইহার কারণ, সত্য সকল গুণের আয়তন—আধার। পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে যেমন ভ্রমর আসিয়া জুটে, সেইরূপ যে সত্যকে দৃঢ় আলিঙ্গনে ধরিয়া থাকে, তাহার অন্তরে দিন দিন নব নব গুণের বিকাশ হইতে থাকে।

সত্যবাদী হইতে হইলে অকপট হইতে হইবে—মন মুখ এক করিতে হইবে। অকপট লোক সংসারে অতি বিরল। যে অকপট, লোকে তাহাকে শ্রদ্ধা করে এবং স্ত্রী-পুত্রাদি অপেক্ষাও অধিক বিশ্বাস করে। অকপট ব্যক্তি সকলের নিকট প্রাণ খুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে আপনার করিয়া লয়। সে কোন অপবিত্র ভাব বা বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারে না—অন্ততঃ, লোকলজ্জার ভয়েও তাহাকে উহা পরিত্যাগ করিতে হয়।

একটা মিথ্যা কথা বলিলে সেটী ঢাকিয়া রাখিবার জন্য আরও দশটা মিথ্যা কথা বলিতে হয়, নানারূপ প্রতারণা, জাল, জুয়াচুরি করিতে হয়—তাহার উপর সদাই ভয় কখন ধরা পড়ি কখন অপদস্থ হই। তাহার মন সর্ব্বদাই ভীত ও সঙ্কুচিত থাকে। কিন্তু সত্যবাদীর পথ অতি সরল—তাহাতে লুকোচুরি নাই—ভয় নাই। সে সদাই প্রফুল্ল—সদাই নিশ্চিন্ত। যদি কখনও সে অন্যায় করে তাহা হইলে তাহা স্পষ্টই স্বীকার করে এবং স্থিরচিত্তে তাহার ফলভোগ করে।

সত্যবাদীকে বাক্‌সংযম করিতে হয়। বেশী কথা বলিলে তাহার সঙ্গে দুই চারিটা মিথ্যা কথাও বাহির হইয়া যায়। সেই জন্য তাহাকে পরনিন্দা, পরচর্চ্চা প্রভৃতি বাজে কথা পরিত্যাগ করিতে হয়। কাজেই সে "বিবিক্তদেশসেবিত্বম্ অরতির্জ্জন সংসদি"—গীতার এই উপদেশ অনুসরণ করিয়া সচ্চিন্তায় কালাতিপাত করে।

সত্যবাদী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাহার নিকট কথা কেবল শব্দ মাত্র নয়; সে জানে, Man's word is God in man—কথা দিলাম ত জান দিলাম—এই তার ভাব। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা চক্ষু লজ্জার খাতিরেই হউক অথবা প্রাধান্য লাভের জন্যই হউক, কোন কাজের জন্য প্রতিশ্রুত হইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না কিন্তু তার পর কাজের সঙ্গে কোন খোঁজ খবর নাই। আর যে সত্যবাদী সে হয় ত সব কাজ করিতে রাজি হয় না কিন্তু যেটী করিব বলিয়া কথা দেয় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। তখন যেন প্রতিজ্ঞা-

রক্ষা করাই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সে দেহ-মন-প্রাণ সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। এইরূপে সত্যবাদীর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হইতে থাকে।

সত্য হৃদয়ে সৎসাহস আনিয়া দেয়। দণ্ডীরাজ যখন শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে অশ্বিনীকে লইয়া রাজামহারাজার দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াও প্রত্যাখ্যাত হইয়া দুঃখে ও ক্ষোভে নদীতে আত্মহত্যা করিতে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে কে আশ্রয় দিয়াছিল কে তাঁহাকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল? একটী অবলা রমণী। কিসের সাহসে, কিসের প্রেরণায় রমণী তাহার ত্রিভুবনবিজয়ী ভ্রাতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ারূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইল? -সত্যের প্রেরণায়। কি হেতু ভীমসেন প্রাণপ্রতিম যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল? সত্যের প্রেরণায়। সত্যনিষ্ঠাই নচিকেতার হৃদয়ে সেই অমানুষিক সাহস আনিয়া দিয়াছিল, যাহাতে বালক মৃত্যুভয় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যমালয়ে যাত্রা করিয়াছিল। সত্য-নিষ্ঠাই তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী করিয়াছিল। বালক পুনঃ পুনঃ প্রলোভিত হইয়াও যখন জলদগম্ভীর স্বরে বলিল—

"যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে॥"

অর্থাৎ এই যে আত্মবিষয়ক গূহ্য বর, নচিকেতা এ ছাড়া অন্য কোন বর চায় না, তখনই যম তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

সত্যবাদীর হৃদয় দিন দিন শতদলের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। তাহার মন মিথ্যা, দু-দিনের বস্তু পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ উচ্চতর চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকে। কথায়, কার্য্যে, চিন্তায়—প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে সে কেবল সত্যকেই অনুভব করিতে চায় এবং দিন দিন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সত্যের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া নব নব রহস্য অবগত হইতে থাকে। তাহার মুখে সত্যের বিমলজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে। তাহাকে যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়—যে

তাহার সঙ্গ করে সেই পবিত্র হইয়া যায়। সত্যের মহিমা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না—উহা উপলব্ধির বস্তু যে উপলব্ধি ক রিবে সেই দেখিবে সত্যের ভাণ্ডারে কি অমূল্য ধন রহিয়াছে—পার্থিব রত্নরাজি তাহার নিকট তুচ্ছ। "যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মাননা মণি" বলিয়া সনাতন নদীনীরে মাণিক ফেলিয়াছিল, এ সেই ধন। বহ্নিপুরাণে আছে—

"সত্যং পরং ব্রহ্ম সত্যমেব পরং তপঃ।
সত্যমেব পরোযজ্ঞঃ সত্যমেব পরং শ্রুতম্॥
সত্যং বেদেষু জাগর্ত্তি সত্যঞ্চ পরমং পদম্।
কীর্ত্তির্যশশ্চ পুণ্যঞ্চ পিতৃদেবর্ষি পূজনম্॥
আপো বিধিশ্চ বিদ্যাচ সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্।'

ধর্ম্মেতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাহা সত্যনিষ্ঠার জ্বলন্ত মহিমায় পরিপূর্ণ। বৈদিকযুগে সত্যকাম, পৌরাণিক যুগে যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম প্রভৃতির কথা আমরা পড়িয়া আসিতেছি এবং আধুনিক যুগে—আধুনিক যুগ বলি কেন, এই সেদিন বঙ্গদেশে—এই কলিকাতা নগরীর সন্নিকটে যে অশ্রুতপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত সত্যসূর্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহার কথা কি আর স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে? আমরা দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা বলিতেছি। কি অমানুষিক অনুরাগের সহিত তিনি আজীবন সত্য পালন করিয়াছিলেন! যখন যাহা করিব বলিয়াছেন তখনই তাহা করিয়াছেন, যখন যেখানে যাইব বলিয়াছেন তখনই সেখানে গিয়াছেন; যাহার নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করিব বলিয়াছেন, তাহারই নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন; যাহা একবার করিব না বলিয়াছেন তাহা জীবনে কখনও করেন নাই। ছোট বড় সকল বিষয়েই তাঁহার সত্যের উপর সমান আঁট ছিল। আজীবন এইরূপে সত্য পালন করায় শেষে তাঁহার স্বভাব এইরূপ হইয়া গিয়াছিল যে তাঁহার মুখ দিয়া একবার যাহা বাহির হইয়াছে, ভুলক্রমেও তিনি তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিতেন না—তাহার স্নায়ুমণ্ডলী তাহা

করিতে পারিত না। জানিনা, আধুনিক শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন কিনা, কিন্তু ইহা ঘটিয়াছিল। আজীবন একভাবে চিন্তা করিলে যে কি অদ্ভুত ফল প্রসব করে তাহা আমরা এই সকল মহাপুরুষের জীবনেই দেখিতে পাই। বিজ্ঞান এখনও ইঁহাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ইহাদের জীবনই নূতন বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিবে। আমরা এই মহাপুরুষের জীবনের প্রথমাবস্থার ইচ্ছাকৃত এবং শেষাবস্থার স্বতঃপ্রণোদিত কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর পার্শ্বেই শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের বাগান বাটী। ঠাকুর সেখানে মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাইতেন। একদিন তিনি যদু মল্লিককে বলিয়াছেন যে তাঁহার বাগানে যাইবেন কিন্তু কোন কারণে সে কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার হঠাৎ সেই কথা মনে পড়িল। তখন তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া সেই বাগানের দিকে চলিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া দেখেন যে বাগানের ফটক বন্ধ। কি করেন, কথা ত রাখিতেই হইবে। ফটকের দ্বারে ফাক ছিল, তিনি সেই ফাঁক দিয়া পা গলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওগো, আমি এসেছি।" পরে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নিদ্রা গেলেন।

পূর্ব্বের ঘটনাটা তাঁহার ইচ্ছাকৃত সত্যনিষ্ঠার উদাহরণ, কিন্তু নিম্নের ঘটনা দুইটী তাঁহার সিদ্ধাবস্থার কথা—যখন সত্যই তাঁহাকে চালিত করিত—যখন তিনি চেষ্টা করিয়াও অসত্য আচরণ করিতে পারিতেন না। ঠাকুর বলিতেন, "যার সত্যে আঁট আছে, মা তার কথা মিথ্যা হতে দেন না।" বাস্তবিক নিম্নোক্ত ঘটনা দুইটী হইতে আমরা তাহাই দেখিতে পাই।

একদিন জনৈকা বৃদ্ধা ভক্ত (গোপালের মা) ভাত রাঁধিয়া ঠাকুরকে খাইতে দিয়াছেন। কিন্তু ভাতগুলি শক্ত ছিল। ঠাকুরের শক্ত ভাত সহ্য হইত না। তিনি উহা না খাইয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন "ওর হাতে আর কখনও ভাত খাব না।" বাস্তবিকই

ইহার অল্পকাল পরে ঠাকুরের গলায় ঘা হইয়া ভাত খাওয়া বন্ধ হইল এবং আর গোপালের মার হাতে খাওয়া হইল না।

আর একবার ঠাকুরের পেটের অসুখ করিয়াছিল। ঠাকুর শম্ভুবাবুর নিকট এই কথা বলিলে তিনি ঠাকুরকে তাঁহার নিকট হইতে একটু আফিম লইয়া গিয়া খাইতে বলিলেন। পরে দুই জনেই ঐ কথা ভুলিয়া গেলেন। ঘরে ফিরিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুরের আফিমের কথা মনে পড়ায় তিনি ফিরিয়া গেলেন কিন্তু শম্ভুবাবুকে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহার এক কর্ম্মচারীর নিকট হইতে একটু আফিম লইয়া কাপড়ের খুঁটে বাধিয়া চলিয়া আসিলেন। কিন্তু কিছুদূর আসিতে না আসিতে তিনি আর পথ দেখিতে পাইলেন না। কে যেন জোর করিয়া পাশের নালার দিকে তাঁহার পা টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। রাস্তা ভুল হইয়াছে মনে করিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন; তখন বেশ রাস্তা দেখিতে পাইলেন। আবার ফিরিলেন, আবার সেইরূপ পথ দেখিতে পাইলেন না। তখন হঠাৎ তাঁহার আফিমের কথা মনে হইল। তিনি উহা শম্ভুবাবুর নিকট হইতে লইব বলিয়া তাঁহার এক কর্ম্মচারীর নিকট হইতে লইয়াছেন! তৎক্ষণাৎ তিনি শম্ভুবাবুর বাসায় ফিরিয়া গেলেন কিন্তু সেখানে কাহাকেও দেখিতে না পাওয়ায় আফিমের মোড়াটী খুলিয়া জানালা দিয়া ঘরের ভিতর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ওগো, এই তোমাদের আফিম রহিল।" এই বলিয়া তিনি শুধু হাতে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং এবার বেশ পরিষ্কার পথ দেখিতে পাইলেন।

আমরা কি এই মহাপুরুষের জীবনী শুধু পাঠই করিব, না তাঁহার উজ্জ্বল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিজেদের জীবন গঠন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব?

আমাদিগের আদর্শ।

(শ্রীনীলকণ্ঠ চৌধুরী, বি এ)

আদর্শ জানা না থাকিলে আমরা পদে পদে বিপন্ন হইয়া পড়ি। উদ্দেশ্যবিহীন মানুষ বাতুলের ন্যায় ঘুরিয়া সমাজশরীরে ক্ষত উৎপাদন করে এবং নিজেও অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করে।

কোন একটি প্রাণিশরীর যেমন জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্য ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে, সেইরূপ মানবজীবন সার্থক করিবার জন্য আমাদিগকে এক পূর্ণ আদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। তাহা না হইলে আমরা ক্রমে ক্রমে নিম্নাভিমুখী হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইব। আমাদিগের এই পূর্ণ আদর্শটি কি?

আমরাই আমাদিগের আদর্শ। যীশু কিম্বা বুদ্ধের যতই সাধ্য সাধনা করি না কেন আমরা আমাদিগকে ছাড়াইয়া কখনই উঠিতে পারিব না। বুদ্ধকে বুঝিতে হইলে বুদ্ধের মত হইতে হয়। বুদ্ধের পরে অনেক ছোট ছোট বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু স্বয়ং বুদ্ধও কি নিজেকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছেন? তিনিও নিজের মধ্যে নিজেই নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। আমি' না থাকিলে বাহ্যজগৎ থাকে না। আমার উপর নির্ভর করিয়াই বাহ্যজগৎ এত মহৎ দেখাই তেছে। বাহ্যজগতের প্রমাণ 'আমি'। উপাধিকে বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই প্রকৃত 'আমি'। উপাধি কি? 'যাবৎ কালমবস্থায়ী ভেদহেতুরুপাধিতা'। সাময়িক পরিবর্ত্তনশীল ভেদহেতুর নাম উপাধিতা। যে ভেদ বা বিশেষত্ব বস্তুর স্বরূপভূত (Proprium) নহে তাহাকেই উপাধি (Accident) বলা যায়। আমার দেহের জ্ঞান স্বপ্নকালে থাকে না এবং আমার মনবুদ্ধির জ্ঞান সুষুপ্তিকালে থাকে না—এ সকল আমার উপাধি মাত্র কিন্তু আমার চৈতন্য বা সাক্ষিস্বরূপত্ব যাহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন কালেই সমান-

ভাবে বর্ত্তমান (কারণ সুষুপ্তিরও স্মৃতি থাকে) তাহাই আমার আত্মস্বরূপভূত। সুতরাং আদর্শের জন্য বাহিরে যাইতে হইবে না।

"যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।

এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈতং॥

এই শান্ত, শিব, অদ্বৈতস্বরূপ 'আমিটিই' আমাদিগের আদর্শ। ইহার নিকট আর সমস্ত আদর্শ হীন। আমাদিগকে উহারা ক্ষণকাল শান্তি দিয়া স্বপ্নের ন্যায় শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। মানুষের মত মানুষ হইতে হইলে আমাদিগকে এই আদর্শই ধরিতে হইবে।

কিন্তু এই 'আমিটির' অস্তিত্বের প্রমাণ কি? অনেকে বলিয়া থাকেন, অনন্তকে কি আমরা ধরিতে পারিব? যদিও এই অনন্ত, 'আমির' অস্তিত্ব প্রমাণ হয়, তথাপি আমাদিগকে 'সান্ত' লইয়াই থাকিতে হইবে। কারণ আমরা সান্ত ইহাই অনেকের মত। এখানে ধরাধরির কথা কিছু নাই। আমরা যদি সান্ত হইতাম—তাহা হইলে এই কথা বলা যাইত—কিন্তু আমাদিগের স্বরূপই অনন্ত। "প্রত্যক্ষ অনুভূত শ্রোত্রাদিগম্য শব্দাদি দ্বারা ব্রহ্মের একত্ব কিরূপে অপ্রমাণিত হয়?" শব্দাদির ভেদ দ্বারা কি আকাশের একত্ব অপ্রমানিত হয়? না তাহা হয় না। তবে শব্দস্পর্শাদির ভেদ দ্বারা ব্রহ্মেরও একত্ব ও অনন্তত্ব অপ্রমাণিত হয় না। ব্রহ্ম সকলের আত্মা, অতএব ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্যক সিদ্ধ। কারণ, সকলেরই আপন অস্তিত্বজ্ঞান আছে। 'আমি' নাই এরূপ কেহ অনুভব করেন না। 'আত্মা নাই' এ কথা সত্য হইলে, সকলেই অনুভব করিত 'আমি নাই'। কিন্তু 'আমি' না থাকিলে 'আমি নাই, এরূপ অনুভব করিবে কে? এই 'আমির' প্রমাণ 'আমিই'। প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর সমস্ত অনুমানাদি প্রমাণ নির্ভর করে। প্রত্যক্ষের উপর প্রমাণ নাই। অন্য প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষকে কিরূপে প্রমাণ করিব? "মানং প্রবোধয়ন্তং মানং যে মানেন বুভুৎসন্তে। এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাসুধিয়ঃ।" প্রমাণক্রিয়াকে বল সঞ্চার করে যে সাক্ষাৎ জ্ঞান, সেই সাক্ষাৎ জ্ঞানকে

যাহারা প্রমাণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন, সেই সকল মহাপণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন কি? না, যে অগ্নি ইন্ধনে দাহিকা শক্তির সঞ্চার করে সেই অগ্নিকে ইন্ধন দ্বারা দগ্ধ করিতে। হাজার তর্ক করিলেও অবিকৃত সত্যটি কখনও মিথ্যা হইয়া যাইবে না। ইহা চিরদিনই সত্য থাকিবে। প্রকৃত আমিকে হারাইয়া আমরা বৃথা ক্রন্দন করিয়া পাগলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

"ত্বমেব দশম ইতি গণয়িত্বা প্রদর্শিতঃ।
অপরোক্ষতয়া জ্ঞাত্বা হৃষ্যতি এব ন রোদিতি॥"

দশজন ব্যক্তি একত্রে একটি নদী পার হইলেন। পর পারে গিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন গণনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, সকলে পার হইয়াছেন কিনা। কিন্তু তিনি নিজেকে বাদ দিয়া গণনা করাতে নয়জন মাত্র হইল। তখন একজন জলে ডুবিয়াছে ভাবিয়া তাঁহার সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেখানে আসিয়া রোদনের কারণ অবগত হইয়া গণনাকারীকে বলিলেন 'নয় জন হইবে কেন? দশ জনই ত ঠিক রহিয়াছে। তুমি নিজেকে গণনা করিতেছ না কেন? তুমিই ত দশম ব্যক্তি।' প্রকৃত-পক্ষে এই দশাই আমাদিগের হইয়াছে। নিজের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ঈশ্বরলাভের জন্য ছুটাছুটি করিতেছি—আর কেবল সন্দেহের সাগরে নিমগ্ন হইতেছি।

বেদান্তের কথা শুনিলে অনেকে উহাকে শুষ্ক তর্ক বলিয়া উপহাস করেন। বেদান্তের ব্রহ্মে যেন আনন্দ নাই—উহা নীরস! কিন্তু বেদান্তের ব্রহ্ম আর এই 'আমি'তে কি কোন তফাৎ আছে? আমাপেক্ষা কে আমার অধিক প্রিয়তর কে অধিক আনন্দদায়ক? এই একমেবাদ্বিতীয়ম্ 'আমিই' অভয় ও অমৃতস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে "ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যং সুখং" বলিয়াছেন, তাহা কি একটা অচেতন জড়কণা চিনির দানার ন্যায়? চিনি নিজের সুখ নিজে বোঝে না বলিয়া কি চেতনাস্বরূপ আমিও আমাতে থাকিয়া সুখ পাইব না? নিজের

মধ্যে আনন্দ না থাকিলে কি অন্য কেহ আমাদিগকে আনন্দ দিতে পারে! আমিই আনন্দস্বরূপ। আমার সহিত সম্পর্কিত হইয়াই ত অপরের আনন্দ।

দ্বিতীয়তঃ, 'তর্ক করিও না – তর্ক করিও না' এই রব প্রায়ই শুনা যায়। যেন তর্কের কোন প্রয়োজন নাই—যেন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই সমস্ত সত্যটিকে বুঝিয়া ফেলিব! তর্ক করা যদি ভাল হয়, তবে তর্ক করিতেই হইবে। শাস্ত্রেও ত পুনঃ পুনঃ মননের কথা রহিয়াছে। তবে তর্ক করিতে এত ভয় কেন? যদি কোন বিশ্বাস যুক্তিতর্কের আঘাতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়, তবে যাউক—বিশ্বাস আমরা চাহি না—ইহাতে কেবল সঙ্কীর্ণতারই প্রশ্রয় এমন দেয় মাত্র।

এই বেদান্তের দেশে এত হীনতা—এত স্বার্থপরতা ঢুকিল কিরূপে? আমরা তথাকথিত ইতর লোকের সহিত মিশিতে পারি না। তাহারা হীন—অস্পর্শ! বেদান্তের দেশে ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বটে! যে দেশের লোক প্রতিদিন

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

পাঠ করিয়া থাকে সেই দেশের লোক কিনা মানুষকে ছোট জাতি বলিয়া ঘৃণা করে! আমরা শ্লোকটিই পাঠ করি, কিন্তু ইহাকে আদর্শ করিয়া কার্য্য করিতে চেষ্টা করি না। অনেকে বলিবেন—মহাশয়, এই শ্লোকটি সমাধিলাভের পরের অবস্থা বলিতেছে। ভাল যুক্তি বটে! যাহার হৃদয় অপরকে আলিঙ্গন করিতে সমাধির অপেক্ষা রাখে তাহার হৃদয় আছে বলিয় বিশ্বাস করি না। আমরা যতই ধর্ম্মের জন্য গর্ব্ব করি না কেন—আমরা আদর্শ হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। খ্রীষ্টান মিশনারী আসিয়া যখন চণ্ডালকে আলিঙ্গন করে তখন আমরা লজ্জায় মরিয়া যাই না কেন? আবার তাহাদিগের নিকটই আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি! কয় জন আমরা গরীবের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি? আমাদের দেশের লোকের

মত এত গরীব—এত মূর্খ লোক আর কোথায়! এত বড় জমী পড়িয়া রহিয়াছে—কেবল কৃষকের অভাব!

এই যথার্থ 'আমি'কেই আদর্শ করিয়া আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে—উপাধি জনিত ভেদজ্ঞান দূর করিয়া সকলের ভিতর একত্ব দর্শন করিতে হইবে সকলের ভিতরেই সেই 'আমি'কে উপলব্ধি করিতে হইবে। তবেই আমরা চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে পারিব—নিষ্কাম ভাবে কার্য্য করিতে পারিব। এই আদর্শ টিকে পূর্ণমাত্রায় ধারণা না করিতে পারিলেও আমরা অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিব—ছোট লোকের স্পর্শে আমাদের জাতি যাইবে না—আমরা যাহা তাহাই থাকিব।

আদর্শ বড় হইলে যে কাজও বড় হয় তাহার প্রমাণ Roman Law. "Law of Nature" ছিল Roman Lawএর আদর্শ। তাহার জন্যই উহা অন্যান্য দেশের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। এত বড় যে French Revolution—তাহারও গোড়া এই Law of Nature. দার্শনিক নীচের Superman প্রস্তুত করিতে হইলে এক বেদান্তেরই সাহায্যেই হইতে পারে—অন্য কিছুতে নহে। সেই অদ্ভুত বৈদান্তিক শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে হইলে গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। তিনি নীচের Supermanএর চেয়েও কত বড়!

বিদেশীরাও আমাদিগের বেদান্তে শান্তি পায়, আর আমরা পাই না! Schopenhouerএর মত, Max Mullerএর মত লোক শান্তি পায়, আর আমরা উহাকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় ভাবিয়া বসিয়া রহিয়াছি! 'আমি'টিকে ভুলিয়াই আমাদিগের এই দুর্দ্দশা।

এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য কি যাইবে না? আবার কি শ্রীকৃষ্ণের গভীর বাণী "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ" আমাদিগকে উদ্বোধিত করিবে না?

স্বামী বিবেকানন্দ।

(শ্রীভুবনমোহন হাওলাদার)

অতি প্রাচীনকাল হইতে এ দেশে বেদান্ত-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম প্রচলিত। বেদান্ত হিন্দুজাতির অস্থিমজ্জাগত। তবে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণ অনুষ্ঠান পদ্ধতি ভিন্নরূপে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের মূলে সেই একত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া ভারতে বৈষম্যের ভিতরও সাম্য আছে।

এদেশে যত প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তাহাদের সকলেরই সাধারণ লক্ষ্য "ত্যাগ"। ত্যাগী না হইলে ধর্ম্ম লাভ হয় না, ইহাই হিন্দুজাতির বিশ্বাস। শুধু হিন্দু কেন? সমগ্র পৃথিবীতেই দেখিতে পাওয়া যায়, ত্যাগীই বড়। এই ত্যাগ প্রচার করিবার জন্য বিভিন্ন যুগে, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি কত অবতার এবং মুনিঋষিগণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং এখনও হইতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে সেই প্রাচীন, অতি প্রাচীন বার্ত্তা "ত্যাগ" প্রচার করিবার জন্য আর এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল—ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। যখন ভারত তাহার সনাতন আদর্শ আত্মসাক্ষাৎকার বিস্মৃত হইয়া দেহসুখের জন্য মনপ্রাণ নিয়োজিত করিতেছিল, তখন এই কামকাঞ্চনত্যাগী মহাপুরুষ আদ্যাশক্তি জগজ্জননীর দর্শনলাভেচ্ছায় মাটীতে মুখ ঘসড়াইতে ঘসড়াইতে বলিতেছিলেন, "মা জীবনের আর একটা দিন কাটিয়া গেল, এখনও দেখা দিলি না!" এই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার জীবনব্যাপী কার্য্যাবলীর আলোচনা করিতে হইবে। আসুন, একবার এই বিবেকানন্দ স্বামী কে তাহার পরিচয় লই।

ইনি কি সেই কলিকাতা শিমলার গৌড় মুখার্জ্জির লেনস্থিত দত্ত

পরিবারের নরেন্দ্রনাথ দত্ত? ইনি কি জেনারেল এসেম্ব্লি ইনিষ্টিটিউসনের ছাত্র, কলিকাতা বিশ্ববিস্থালয়ের বি, এ, উপাধিধারী নরেন্দ্রনাথ দত্ত? ইনি কি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতকারী, বিস্ফারিত নেত্র, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, সুগায়ক নরেন্দ্রনাথ দত্ত? ইনি কি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে ঈশ্বরদর্শনবিষয়ে প্রশ্নকারী নরেন্দ্রনাথ দত্ত? ইনি কি সেই গাজিপুরের গঙ্গাতীরবাসী তত্ত্বদর্শী পওহারা-বাবা দর্শনতৃপ্ত নরেন্দ্র নাথ দত্ত? ইনি কি সেই দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াতকারী যুবক? ইনি কি সেই যুবক যিনি একদা বাগবাজারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া সংজ্ঞা-হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার অঙ্গুলীস্পর্শে ও হরিনাম শুনিতে শুনিতে সংজ্ঞালাভ করিয়া "দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ" গাহিতে গাহিতে বাড়ী ফিরিয়াছিলেন? ইনি কি সেই যুবক, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে বসিয়া ধর্ম্মশিক্ষা করিতেন? ইনি কি সেই যুবক, শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগের পূর্ব্বে যাঁহার ভিতর আপনার সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়া স্বীয় কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন? ইনি কি সেই যুবক, যিনি সন্ন্যাস গ্রহণান্তর কৌপীনমাত্র অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়া বিভিন্ন দেহসমূহের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মকর্ম্ম, আহার-বিহার সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া অবগত হইয়াছিলেন?—হাঁ, ইনিই সেই স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন লোক ছিলেন। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই যে তিনি উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দর্শনে বুঝা যায়। কি বীর্য্যে, কি তেজস্বিতায়, কি পাণ্ডিত্যে, কি সঙ্গীতাদিতে, কি বাগ্মিতায়, কি আমোদপ্রমোদে, কি ত্যাগবৈরাগ্যে, কি তত্ত্বজ্ঞানে তাঁহার সমকক্ষ জগতে অতি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বামীজি যে সকল গুণের সমষ্টি ছিলেন সেই সকল গুণ তাঁহার এক একখানা ফটো দেখিয়া চিন্তা করিলেই বিশেষরূপে বুঝা যায়।

যষ্টি-হস্তে মুণ্ডিতমস্তক পরিব্রাজকবেশের ফটোটি দেখিলেই কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী সংসারাসক্তি-বিরহিত যতি বলিয়া বোধ হয়। বাবরী-চুলবিশিষ্ট, চোগা-চাপকান-পরিহিত, চেয়ারে উপবিষ্ট বিবেকানন্দকে দেখিলে বোধ হয়, ব্রহ্মচর্য্যে লোককে যে সৌন্দর্য্যে ভূষিত করে, স্বামীজি সেই সৌন্দর্য্যের অধিকারী। তাঁহার চিকাগোর সেই উষ্ণীষ-শোভিত, বাহু-বিজড়িত-বক্ষ বীরমূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয়, যেন সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে। আবার তাঁহার ধ্যান-মূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয়, তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন থাকিয়া, ইহ জগৎ হইতে ঊর্দ্ধে, অতি ঊর্দ্ধে কোন্ এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। নিম্নে কয়েকটি ঘটনায় উল্লেখ করা যাইতেছে।

একদা স্বামীজি ট্রেণে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যাইতেছিলেন। সেই গাড়ীতে মহামতি তিলক ও একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্যারিষ্টার ছিলেন। ব্যারিষ্টার ও তিলকের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু তর্কবিতর্ক হইতেছিল। ব্যারিষ্টার হিন্দুধর্ম্ম, বেদবেদান্ত অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছিলেন। তিলকও যথাসাধ্য স্বীয় মত সমর্থন করিতেছিলেন। স্বামীজি নাকে মুখে একখানা কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া তাঁহাদের তর্ক বিতর্ক শুনিতেছিলেন। যখন দেখিলেন, তিলক আর ব্যবহারজীবীর সহিত পারিয়া উঠিতেছেন না, তখন মুখের কম্বল ফেলিয়া সিংহবিক্রমে উঠিয়া বসিয়া ব্যারিষ্টারের সহিত হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার গভীর তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া ব্যারিষ্টার অবাক্ হইয়া রহিলেন। পরে তিলক চিকাগোর মহাসম্মেলনে হিন্দু সন্ন্যাসীর বক্তৃতা পাঠ করিয়া ঐ ব্যারিষ্টারকে বলিয়াছিলেন, "এই সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন, গাড়ীতে যে মহাপুরুষকে দেখিয়াছিলাম, তিনিই এই ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এরূপ লোক ভারতে ইদানিং জন্মায় নাই।"

স্বামীজি অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। ইউরোপ হইতে

প্রত্যাগত হইলে, কোন একটী লোক তাঁহাকে ঐ দেশের তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন যে, "ইউরোপ জড়বিজ্ঞান বলে পার্থিব উন্নতি এত করিয়াছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহ উহার তুলনায় নগণ্য।" প্রশ্নকর্ত্তা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ উন্নতির পরিণাম কি?" তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "ঐ উন্নতির পরিণাম এই যে, হঠাৎ কোন সামান্য কারণে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমগ্র ইউরোপকে ধ্বংসপ্রায় করিবে।" বর্ত্তমান মহাসমরের প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে স্বামীজি এই কথা বলিয়াছেন।

বর্ত্তমানে ভারতবাসী নিতান্ত হীনাবস্থায় পতিত। তমোগুণ ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিযাছে। কর্ম্ম করিতে হইলে রজোগুণের প্রয়োজন এবং রজোগুণসম্পন্ন লোকেরাই শীঘ্র সত্বগুণে পঁহুছিতে সমর্থ। তাই তিনি যুবকগণকে কর্ম্মোপদেশ দিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী ঘটনার কথা বলিতেছি :— ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগ। ঠন্ঠনিয়ার কালীমন্দিরের সংলগ্ন যে দ্বিতল গৃহটী বর্ত্তমান, ঐ গৃহে রামমোহন লাইব্রেরী ছিল। দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের পূর্ব্ব দিবস ঐ লাইব্রেরীতে আমার একটী ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত দেখা করিতে যাই। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবের কথা আমি উত্থাপন করিয়া বন্ধুটীকে উৎসব দেখিবার জন্য অনুরোধ করি। আমার কথা শুনিয়া বন্ধুটী তথায় যাইতে সম্মত হইলেন এবং বলিলেন, "আচ্ছা আমি যাব এবং বিবেকানন্দকে কয়েকটী কথা শুনাইয়া আসিব।" আমি বলিলাম, "কিছু বল্‌তে হবে না। দেখ, যেন তোমার ব্রাহ্মগিরি ছুটে না যায়।"

অতঃপর বন্ধুটী শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবান্তে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন সন্ধ্যাকালে সেই স্থানে তাঁহার সহিত দেখা হইল। আমাকে দেখিয়া বন্ধুটী বলিতে লাগিল, "ভাই, চারি পাঁচ হাজার লোককে লুচি, পায়স, খিচুরী আকণ্ঠ খাওয়াইল!" আমি বলিলাম, "যাহা দেখিতে গিয়াছিলে তাহার কি হইল?" বন্ধুটী বলিল,

"বিবেকানন্দ স্বামীকে বলিলাম, "মহাশয়! আমাদিগকে কিছু ধর্ম্মোপদেশ দিন।" তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" আমি আমার নাম বলিলাম। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পড়?" আমি বলিলাম, "সিটি কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি।" স্বামিজী বলিলেন, "ফিলজফী পড় কি?" আমি—আজ্ঞে হাঁ। স্বামিজী—Define Philosophy.

আমি Stephenএর নোট পড়িয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা বলিলাম।

স্বামিজী ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মাছ মাংস খাও?"

আমি—না, আমি নিরামিষ খাই।

স্বামিজী—তোমার এরূপ দুর্দ্দশা কেন? তুমি মাছ খাও মাংস খাও, নাগরি জুতা পর, মাথায় পাগরী পর, ছুটাছুটী কর, নড় চর, কাজ কর। Look at the sky and think over that piece of cloud and you will know what Philosophy is. তুমি তরুণবয়স্ক যুবক, তোমার চক্ষু কোটরগত, তোমার মুখমণ্ডল মলিন! তোমায় দেখিয়া সুখী হইলাম না।

ভাই, এই কথাগুলি যখন স্বামিজী বলিতেছিলেন তখন তাঁহার চক্ষু দুইটা দেখিয়া বাস্তবিক আমার ভয় হইয়াছিল। আমি আর তাঁহার সহিত কথা না বলিয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম।

স্বামিজী অশেষ গুণসম্পন্ন হইয়াও নিরভিমান ছিলেন, তাহা নিম্নের ঘটনাটী হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

সম্ভবতঃ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর কি নবেম্বর মাসে অর্থাৎ পূজার ছুটীতে স্বামিজী কিছু দিনের জন্য দেওঘরে বাস করিতেছিলেন। একদিন তিনি কোট প্যাণ্ট পরিয়া রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার সহিত দেওঘর স্কুলের একটী ছাত্রের সাক্ষাৎ হইল। ছাত্রটীর জুতার ফিতা আল্‌গা ছিল। তাহা দেখিবামাত্র তিনি স্বয়ং সেই বালকের জুতার ফিতা আঁটিয়া বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহার

পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "Be active my dear boy." সেই বালকই এখন হাজারিবাগ Dublin Mission Collegeএ দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। ইনি স্বামিজীকে চিনিতে না পারায় কখন আলাপ করিতে পারেন নাই বলিয়া চিরদুঃখিত। রাস্তা দিয়া কত লোক যাতায়াত করে, কে কাহার দিকে তাকায়? কিন্তু লোকশিক্ষকেরা কিছুই উপেক্ষা করেন না। তাঁহারা ছোট বড় সকল বিষয়ে সমান দৃষ্টি রাখেন।

আমেরিকাতে কত প্রলোভন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু গুরুকৃপাপ্রাপ্ত, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, ইন্দ্রিয়বিজয়ী বিবেকানন্দ ভোগ-বিলাসের লীলানিকেতন আমেরিকা ও ইউরোপে মহাবীরের ন্যায় দিগ্বিজয় করিয়া পূতভূমি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যিনি হৃদয়-মন্দিরে ভগবানকে স্থাপন করিয়াছেন এবং কাম-*ক্রোধাদি ছয়টী পশুকে বলিদান করিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে পার্থিব* প্রলোভন দাঁড়াইতে পারিবে কেন?

লোকে বলে, ঈশ্বরকে দেখা যায় না—বিশেষতঃ কলিযুগে। তাঁহাকে দেখিবে কিরূপে? যে শক্তিসঞ্চয় হইলে আত্মদর্শন হয়, সেই শক্তির অভাব হইলে তাহা কিরূপে সম্ভবে? স্বামিজী অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ও সত্যবাক্ ছিলেন বলিয়া সেই শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়।" আমরাও যদি ভগবান্ লাভ করিতে চাই, তবে আমাদিগকে একটু সরল পথে চলিতে হইবে—পাটোয়ারী বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যপথ অবলম্বন করিতে হইবে। মন পরিষ্কার হইলে ত সেই পথের পথিক হইতে পারিব। তাহা না হইলে আসা যাওয়া সকলই বৃথা।

স্বামীজি আমাদিগকে কি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন? তিনি পাশ্চাত্য-দেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া কলম্বোয় অবতরণ করেন এবং সেখান হইতে আলমোড়া পর্য্যন্ত ভারতের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া

তাঁহার স্বদেশবাসীকে তাঁহার প্রাণের কথা বলিয়া বেড়ান। তিনি বলিতেছেন :—

"তোমরা যদি ধর্ম্ম ছাড়িয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্ব্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। এই কারণেই আমি বলিতেছি, এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্ম্মকে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিবার তাহা শিক্ষা কর—কিন্তু মনে রাখিও যে, সেইগুলিকে হিন্দুজীবনের সেই মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে—তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইবে।

"আমরা অলস, আমরা কার্য্য করিতে পারি না, আমরা একসঙ্গে মিলিতে পারি না, আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি না, আমরা ঘোর স্বার্থপর, আমরা তিন জন একসঙ্গে মিলিলেই পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকি। পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া থাকি। আমরা ভাবি অনেক জিনিষ, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করি না। এইরূপ তোতাপাখীর মত চিন্তা আমাদের অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে—আচরণে আমরা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ কি? শারীরিক দুর্ব্বলতাই ইহার কারণ। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না। আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে। ধর্ম্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ।

"এই বীর্য্যলাভের প্রথম উপায়—উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া ও বিশ্বাস করা যে 'আমি আত্মা'। আমরা সব করিতে পারি। আমরা কি না করিতে পারি। আমাদের প্রত্যেকের ভিতর সেই মহিমময় আত্মা রহিয়াছেন। উহাতে বিশ্বাসী হইতে হইবে।

"বেদান্তের এই সকল মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না—বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটীরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে সর্ব্বত্র এই সকল তত্ত্ব

আলোচিত ও কার্য্যে পরিণত হইবে। মৎস্যজীবী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হইতে পারিবে। বিদার্থী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী হইবে। উকিল যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল উকিল হইবে।

"সকল ব্যক্তিকেই তাহার অভ্যন্তরীণ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দাও। প্রত্যেকে নিজেই নিজের মুক্তিসাধন করিবে। জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার কর; প্রত্যেক ব্যক্তি জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হউক।

"প্রত্যেক নরনারীকে, সকলকেই ঈশ্বরদৃষ্টিতে দেখিতে থাক। তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না—তুমি কেবল সেবা করিতে পার। কতকগুলি ব্যক্তি যে দুঃখ ভুগিতেছে, সে তোমার আমার মুক্তির জন্য—যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠ, পাপী প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পূজা করিতে পারি। কাহারও উপর প্রভুত্ব করিয়া কাহারও কল্যাণ করিতে পার, এ ধারণা ছাড়িয়া দাও।"

আমরা যদি এই সকল অমূল্য উপদেশ অনুসরণ করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হই, তাহা হইলে অচিরেই যে আমরা অমৃতের সন্ধান পাইব তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সামাজিক সম্মেলন অভিভাষণ। *

(স্বামী বিবেকানন্দ)

আমরা একবার এক ঘোর ঈশ্বরনিন্দুক ইংরেজের মুখে শুনেছিলাম সাহেবদের সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর, নেটিভদের সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর—কিন্তু দো-আঁশলা জাতের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর নন, অন্য কেউ।

---

* স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক 'প্রবুদ্ধভারত' নামক ইংরাজী মাসিক-পত্রের ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধরূপে লিখিত।

আজ হঠাৎ একটা জিনিষ পড়ে আমাদের ঐ ভাবের একটা কথা মনে পড়ছে। কথাটা কি, খুলে বলি।

ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনের সংস্কারোৎসাহের জীবন্ত বাণীস্বরূপ মিঃ জষ্টিস র‍্যাণাডের প্রারম্ভিক অভিভাষণ কিছু দিন হল আমাদের কাছে এসে সমালোচনার জন্য পড়ে রয়েছে। পাঠ করে দেখা গেল, উহাতে প্রাচীনকালের অসবর্ণ বিবাহের দৃষ্টান্তের একটা লম্বা তালিকা রয়েছে, প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের উদার ভাবের বিষয়ে অনেক আলোচনা রয়েছে, ছাত্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করেও সুন্দর খাঁটি উপদেশ সব দেওয়া হয়েছে—আর এগুলি এত ভাবের সহিত এবং এমন মোলায়েম ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে যে, পড়লেই বক্তাকে বাস্তবিকই প্রশংসা কর্‌তে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু বক্তৃতাটীর শেষ ভাগটায় একটা প্রসঙ্গ রয়েছে—তাতে পঞ্জাব প্রদেশে প্রবল নূতন সম্প্রদায়টীর জন্য একদল আচার্য্য গঠন কর্‌বার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে দেখা গেল—বক্তা যদিও স্পষ্টতঃ ঐ সম্প্রদায়টীর নাম করেন নি, কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি—তিনি আর্য্যসমাজকে লক্ষ্য করেই কথাটা বলেছেন—যে সমাজটী, স্মরণ রাখবেন, জনৈক সন্ন্যাসীদ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ঐ অংশটা পাঠ করে আমাদের একটু বিস্ময় বোধ হল, আমাদের মনে স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন উঠ্‌ল যে,—

ঈশ্বর ত দেখ্‌ছি ব্রাহ্মণদেরও সৃষ্টি করেছেন, ক্ষত্রিয়দেরও সৃষ্টি করেছেন—কিন্তু সন্ন্যাসীদের সৃষ্টি কর্‌লে কে?

আমাদের পরিজ্ঞাত সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েই সন্ন্যাসী ছিল ও আছে। হিন্দু সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, খ্রীষ্টিয়ান সন্ন্যাসী—এমন কি, ইস্‌লামধর্ম্মে যে সন্ন্যাসকে অস্বীকার কর্‌বার একটা উৎকট ভাব আছে, তা থেকে একটু নরমসুরে নেমে তাঁদেরও দলকে দল ভিক্ষু-সন্ন্যাসীকে নিতে হয়েছে। সন্ন্যাসী আবার হরেক রকমের কেউ পুরা মাথা-কামান, কেউ খানিকটা কামান, দীর্ঘকেশ, হ্রস্বকেশ, জটাজূটধারী এবং অন্যান্য নানাবিধ ঢঙ্গের কেশবিশিষ্ট সন্ন্যাসী আছে।

আবার এঁদের পোষাকের তারতম্যও অনেক—কেউ দিগম্বর,

কেউ চীরাম্বর, কেহ কাষায়ধারী, কেহ পীতাম্বর—আবার কৃষ্ণাম্বর খ্রীষ্টিয়ান ও নীলাম্বর মুসলমান রয়েছেন। আবার ঐ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল নানারূপে দেহকে কষ্ট দিয়ে তপস্যার পক্ষপাতী, অপর একদল বলেন- 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং'—'ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণা-মারোগ্যং মূলমুত্তমম্।' প্রাচীনকালে প্রত্যেক দেশেই সন্ন্যাসীর ভিতর একদল যুদ্ধবিগ্রহপ্রিয় ছিল—নাগা সন্ন্যাসীর দল চিরকালই ছিল। পুরুষজাতির ন্যায় নারীজাতির ভিতরও তথাবিধ সেই ত্যাগের ভাব এবং উহার বিভিন্ন প্রকাশসমূহ ঠিক যেন সমান্তরাল রেখায় চলে আস্‌ছে। সন্ন্যাসীর ন্যায় সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়ও বরাবর ছিল, এখনও আছে। মিঃ র‍্যাণাডে শুধু যে ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনের সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করেছেন, তা নয়, তিনি একজন নারীজাতির মর্য্যাদা ও সম্মান রক্ষা কর্‌তে সদা বদ্ধপরিকর মহাশয় ব্যক্তিও দেখ্‌ছি। শ্রুতি ও স্মৃতিতে যে সন্ন্যাসিনীবৃন্দের উল্লেখ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তাতে তাঁর সম্পূর্ণ সম্মতি আছে বলে বোধ হচ্ছে। প্রাচীন কালের অববাহিতা ব্রহ্মবাদিনীরা—যাঁরা বড় বড় দার্শনিকগণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করে এক রাজসভা থেকে আর এক রাজসভায় ঘুরে বেড়াতেন, তাঁরা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের মুখ্য উদ্দেশ্য যে বংশবৃদ্ধি—তাতে বাধা দিয়েছেন বলে তাঁর আশঙ্কা নেই বলে বোধ হয়—আর মিঃ র‍্যাণাডের মতে পুরুষজাতি সন্ন্যাসী হয়ে যেমন মানবজাতির অভিজ্ঞতার পূর্ণমাত্রা ও রকম থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, স্ত্রীজাতি সেই একই প্রকার কার্য্য-প্রণালীর অনুসরণ করে ঐরূপ বঞ্চিত হয়েছেন—তা বোধ হয় না।

সুতরাং আমরা প্রাচীন সন্ন্যাসিনীকুল ও তাঁহাদের আধুনিক আধ্যাত্মিক বংশধরগণকে মিঃ র‍্যাণাডের সমালোচনা-পরীক্ষোত্তীর্ণ বলে ছেড়ে দিলাম।

চূড়ান্ত দোষী পুরুষকেই কেবল তা হ'লে মিঃ র‍্যাণাডের সমালোচনার সব চোটটা সহ্য কর্‌তে হচ্ছে—এখন দেখা যাক্—এই চোটটা খেয়েও সে সাম্‌লে উঠ্‌তে পারে কি না।

আধুনিক পাশ্চাত্য বড় বড় পণ্ডিতদের এই বিষয়ে যেন একমত

বলে বোধ হয় যে, এই যে জগদ্ব্যাপী সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের প্রথা, তার প্রথম উৎপত্তি আমাদের এই অদ্ভুত দেশটাতে—যে দেশটাতেই এত 'সমাজসংস্কারের' দরকার বলে বোধ হচ্ছে।

সন্ন্যাসীগুরু ও গৃহস্থগুরু—কুমার ব্রহ্মচারী ও বিবাহিত ধর্ম্মাচার্য্য উভয় প্রকার আচার্য্যই—বেদ যত প্রাচীন তত প্রাচীন।

'সকল বিষয়ে চৌকস—সব বিষয়ের ভুক্তভোগী সোমপায়ী বিবাহিত গৃহস্থ ঋষিরই প্রথম অভ্যুদয় অথবা মানবোচিত অভিজ্ঞতা-হীন সন্ন্যাসী ঋষিই সৃষ্টির প্রথমে হয়েছিলেন,—এখন অবশ্য এ সমস্যার একটা মীমাংসা করা কঠিন। সম্ভবতঃ মিঃ র‍্যাণাডে তথাকথিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের উড়ো কথার উপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে আমাদের জন্য এই সমস্যার মীমাংসা করে দেবেন। যতদিন না এ মীমাংসা হচ্ছে ততদিন প্রাচীনকালের বীজবৃক্ষন্যায়ের মত ইহা একটা সমস্যাই থেকে যাবে।

কিন্তু উৎপত্তির ক্রম যাই হক, শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত সন্ন্যাসী আচার্য্যগণ গৃহস্থ আচার্য্যগণ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়েছিলেন —উহা হচ্ছে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য।

যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান যদি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ভিত্তি হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্য যে জ্ঞানকাণ্ডের ভিত্তি তাতে কোন সন্দেহ নাই।

জীবহত্যাকারী যাজ্ঞিকগণ উপনিষদ্বক্তা হতে পার্‌লেন না কেন?—জিজ্ঞাসা করি কেন?

এক দিকে বিবাহিত গৃহস্থঋষি—কতকগুলি অর্থহীন কিম্ভূত-কিমাকার—শুধু তাই নয়, ভয়ানক অনুষ্ঠান নিয়ে রয়েছেন—খুব কম করে বল্‌লেও বল্‌তে হয়, তাঁদের নীতিজ্ঞানটাও একটু ঘোলাটে ধরণের; আবার অন্য দিকে অবিবাহিত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ সন্ন্যাসী ঋষি-গণ, যাঁরা মানবোচিত অভিজ্ঞতার অভাব সত্ত্বেও এমন উচ্চ ধর্ম্মনীতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রস্রবণ খুলে দিয়ে গেছেন—যার অমৃতবারি সন্ন্যাসের বিশেষ পক্ষপাতী জৈন ও বৌদ্ধেরা এবং পরে পরে শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, চৈতন্য পর্য্যন্ত প্রাণভরে পান করে তাঁদের অদ্ভুত

আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংস্কারসমূহ চালাবার শক্তিলাভ করেছিলেন, এবং যা পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে তিন চার হাত ঘুরে এসে আমাদের সমাজসংস্কারকগণকে সন্ন্যাসীদের সমালোচনা কর্‌বার শক্তি পর্য্যন্ত দান কর্‌ছে।

বর্ত্তমানকালে আমাদের সমাজসংস্কারকগণের বেতন ও সুবিধা-গুলির তুলনায় ভিক্ষুসন্ন্যাসীরা সমাজ থেকে কি সাহায্য, কি প্রতিদান পেয়ে থাকেন? আর সন্ন্যাসীর নীরব নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কার্য্যের তুলনায় সমাজসংস্কারকগণ কি কাযই বা করে থাকেন?

কিন্তু সন্ন্যাসীরা ত আর আধুনিকদের মত নিজের বিজ্ঞাপন নিজে প্রচার কর্‌বার—নিজের ঢাক নিজে বাজাবার উপায়টা শেখেন নি।

হিন্দু মাতৃস্তন্য পানের সঙ্গে সঙ্গেই 'এ জগৎটা যেন কিছুই নয়, একটা স্বপ্নমাত্র'—এই ভাব আয়ত্ত করে। এ বিষয়ে সে পাশ্চাত্যদের সঙ্গে একমত—কিন্তু পাশ্চাত্যগণ ইহার উপরে আর কিছু দেখে না, সুতরাং সে চার্ব্বাকের মত সিদ্ধান্ত করে বসে যে, 'হেঁসে খেলে নাওরে যাদু মনের সুখে - কবে যাবে শিঙ্গে ফুঁকে।'—'এই পৃথিবীটা একটা দুঃখপূর্ণ গহ্বর মাত্র—এখানে যতটুকু সুখ পাওয়া যায় ভোগ করে নেওয়া যাক্।' হিন্দুদের দৃষ্টিতে কিন্তু ঈশ্বর ও আত্মাই একমাত্র সত্য পদার্থ—এই জগৎ যতদূর সত্য, তার চেয়েও অনন্তগুণে সত্য—সুতরাং তাঁরা উহাদের জন্য জগৎটাকে ত্যাগ কর্‌তে সদাসর্ব্বদা প্রস্তুত।

যতদিন সমগ্র হিন্দু জাতির মনের ভাব এইরূপ চল্‌বে—আর আমরা ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি, চিরকালের জন্য এই ভাব চলুক—ততদিন আমাদের পাশ্চাত্যভাবাপন্ন স্বদেশবাসিবৃন্দ ভারতীয় নরনারীর 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সর্ব্বত্যাগ কর্‌বার প্রবৃত্তিকে বাধা দেবার কি আশা কর্‌তে পারেন?

আর সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে সেই মান্ধাতার আমলের পচা মড়ার মত আপত্তিটা ইউরোপে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রথম ব্যবহৃত, পরে বাঙ্গালী সংস্কারকগণ তাঁদের কাছ থেকে ঐটী ধার করে নিয়েছেন—আর এখন আবার আমাদের বোম্বাইবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ উহা আঁক্‌ড়ে

ধরেছেন—অবিবাহিত থাকার দরুণ সন্ন্যাসীরা জীবনটাকে পূর্ণভাবে ও উহার নানারকমের সমুদয় অভিজ্ঞতার সহিত সম্ভোগ করতে বঞ্চিত। আশা করি, এইবার ঐ মড়াটা চিরদিনের জন্য আরবসাগরে ডুবে যাবে—বিশেষতঃ এই প্লেগের দিনে—আর হয়ত ঐ স্থানের উচ্চ-বংশীয় ব্রাহ্মণদের তাঁদের পূর্ব্বপুরুষদের পরম সৌরভময় শবদেহের প্রতি প্রবল ভক্তি থাকতে পারে, (তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ নির্ণয় করতে যদি পৌরাণিক কাহিনীর কিছু মূল্য আছে স্বীকার করা যায়) তা সত্ত্বেও।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা মনে পড়ছে বলি—ইউরোপের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা এমন অধিকাংশ ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছে ও শিক্ষা দিয়েছে—যাদের পিতামাতা বিবাহিত হলেও এই 'জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতার' রসাস্বাদ করতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন।

তারপর অবশ্য সন্ন্যাসাশ্রমের বিরুদ্ধবাদীদের মুখে একথা ত লেগেই আছে যে, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেক বৃত্তি দিয়েছেন—কোন না কোন ব্যবহারের জন্য। সুতরাং সন্ন্যাসী যখন বংশবৃদ্ধি করছেন না, তিনি অন্যায় কায করছেন—তিনি পাপী। বেশ, তা হলে ত কাম ক্রোধ চুরি, ডাকাতি, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সকল বৃত্তিই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন —আর ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটিই সংস্কৃত বা অসংস্কৃত সামাজিক জীবনরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। এগুলির বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের কি বক্তব্য? জীবনে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা চাই, এই মত অবলম্বন করে কি ঐগুলিও পূরা দমে চালাতে হবে নাকি? অবশ্য সমাজ-সংস্কারক দলের সঙ্গে যখন সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁরা যখন তাঁর কি কি ইচ্ছা, তাও ভালরকম অবগত আছেন, তখন তাঁদের এই প্রশ্নের হাঁ জবাবই দিতে হবে। আমাদের কি উগ্র-স্বভাব বিশ্বামিত্র, অত্রি প্রভৃতি ঋষিদের বিশেষতঃ নারীজাতির সহিত মিশে 'পূরামাত্রায় নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনকারী' বশিষ্ঠ-বংশের অনুসরণ করতে হবে? কারণ, অধিকাংশ গৃহস্থঋষিই বৈদিক সূক্ত পাঠ ও সোমপানের জন্য যেরূপ প্রসিদ্ধ, যখন যেখানে পেরেছেন তখন

সেখানেই পুত্রোৎপাদনের বিষয়ে উদারতার জন্যও তদ্রূপ প্রসিদ্ধ। অথবা যে সকল অবিবাহিত সন্ন্যাসীঋষি ব্রহ্মচর্য্যকেই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র বলে প্রচার করে গেছেন, আমরা তাহাদের অনুসরণ করব?

তারপর অবশ্য ভ্রষ্টের দল ত রয়েছেই, তাদের মাথায় ত গালাগালের বোঝা পড়াই উচিত—যে সকল সন্ন্যাসী তাঁদের আদর্শ ঠিক ধরে রাখ্‌তে পারেন নি—দুর্ব্বল, অসৎপ্রকৃতি সন্ন্যাসীর দল।

কিন্তু আদর্শটী যদি খাঁটি ও সিধে হয়, তবে আমাদের একজন ভ্রষ্ট সন্ন্যাসীও যে কোন গৃহস্থ অপেক্ষা শতগুণে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ—কারণ, চলিত কথাই আছে যে—"ভালবেসে না পাওয়া বরং ভাল।"

যে কখন উন্নত জীবন লাভের চেষ্টাই করে নি, সে কাপুরুষের সঙ্গে তুলনায় সে ত বীর।

আমাদের সমাজসংস্কারকদলের ভিতরের ব্যাপারের যদি ভাল করে খবর নেওয়া যায়, তবে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের ভিতর ভ্রষ্টের সংখ্যা শতকরা কত তা দেবতাদের ভাল করে গুণ্‌তে হয়; আর আমাদের সমুদয় কাযকর্ম্মের এ রকম সম্পূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর যে দেবতা রাখ্‌ছেন তিনি ত আমাদের নিজেদের হৃদয়মধ্যেই।

কিন্তু এদিকে দেখ—এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা—একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে—কারো কিছু সাহায্য চাচ্ছে না—জীবনে যত ঝড়ঝাপ্‌টা আস্‌ছে, বুক পেতে সব নিচ্ছে—কায কচ্ছে, কোন পুরস্কারের আশা নেই—এমন কি, কর্ত্তব্য বলে লম্বানামে সাধারণে পরিচিত সেই পচা বিটকেল ভাবটাও নেই। সারা জীবন কায চল্‌ছে—আনন্দের সহিত স্বাধীনভাবে কায চল্‌ছে—কারণ, ক্রীতদাসের মত জুতোর ঠোক্কর মেরে কায করাতে হচ্ছে না—অথবা মিছে মানবীয় প্রেম বা উচ্চ-আকাঙ্খাও সে কার্য্যের মূলে নেই।

এ কেবল সন্ন্যাসীতেই পারে। ধর্ম্মের কথা কি বল?—উহা থাকা উচিত, না, একেবারে অন্তর্হিত হবে? ধর্ম্ম যদি থাকে, তবে ধর্ম্মসাধনে বিশেষাভিজ্ঞ একদল লোকের আবশ্যক—ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য যোদ্ধার প্রয়োজন। সন্ন্যাসীই ধর্ম্মের বিশেষাভিজ্ঞ ব্যক্তি, কারণ,

তিনি ধর্ম্মকেই তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য করেছেন। তিনিই ঈশ্বরের সৈনিকস্বরূপ। যতদিন একদল একনিষ্ঠ সন্ন্যাসিসম্প্রদায় থাকে, ততদিন কোন্ ধর্ম্মের বিনাশাশঙ্কা?

প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের প্রবল প্লাবনে কম্পিত হচ্ছেন কেন?

বেঁচে থাকুন র‍্যাণাডে ও সমাজসংস্কারকদল! কিন্তু হে ভারত—হে পাশ্চাত্য-ভাবে অনুপ্রাণিত ভারত, ভুলিও না বৎস, যে এই সমাজে এমন সব সমস্যা রয়েছে, এখনও তুমি বা তোমার পাশ্চাত্য গুরু যার মানেই বুঝ্‌তে পারছ না, মীমাংসা করা ত দূরের কথা।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজী হইতে অনুদিত)

দার্জ্জিলিং।
২৮শে এপ্রিল ১৮৯৭।

প্রিয় ম—

কয়েক দিন পূর্ব্বে আমি তোমার সুন্দর পত্রখানি পেয়েছি। গতকল্য হ্যারিয়েটের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র এসেছে। প্রভু নব-দম্পতীকে সুখে রাখুন।

* * * এখানে সমস্ত দেশবাসী যেন একপ্রাণ হয়ে আমাকে সম্মান কর্‌বার জন্য উৎসুক। শত সহস্র লোক, যেখানে যাই সেখানেই উৎসাহসূচক আনন্দধ্বনি কর্‌ছে, রাজা রাজড়ারা আমার গাড়ি টান্‌ছে, বড় বড় সহরের সদর রাস্তার উপর খিলেন করা হয়েছে

এবং তাতে নানারকম "সংক্ষিপ্ত উপদেশ-বাক্য" (motto) জ্বল্ জ্বল্ করছে ইত্যাদি ইত্যাদি !!! এই সকল বিষয়ের বর্ণনা শীঘ্রই পুস্তকাকারে বেরুবে এবং তুমিও শীঘ্র একখান পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ইতিপূর্ব্বেই ইংলণ্ডে কঠোর পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়েছিলাম আবার এখানে দাক্ষিণাত্যের ভীষণ গরমে অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় আমি একেবারে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছি। কাজেই আমাকে ভারতের অন্যান্য স্থান পরিদর্শনের আশা পরিত্যাগ করে নিকটতম শৈলনিবাস দার্জ্জিলিঙ্গে চোঁচা দৌড় দিতে হবে। সম্প্রতি আমি অনেকটা ভাল আছি এবং আর মাসখানেক আলমোড়ায় থাক্‌লেই সম্পূর্ণ সেরে যাব। এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল, আমার ইউরোপে যাবার একটা সুবিধা চলে গেল। রাজা অজিৎ সিং এবং আরও কয়েকজন রাজা আগামী রবিবার ইংলণ্ড যাত্রা কর্‌ছেন। তাঁরা আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ পেড়াপীড়ি করেছিলেন। কিন্তু আমি এখন কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করি, দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তারেরা সে কথা মোটেই শুন্‌ছে না। সুতরাং অত্যন্ত বিরক্তির সহিত আমাকে এই সুযোগ ছেড়ে দিতে হচ্ছে ; তবে যত শীঘ্র পারি যাবার চেষ্টা কর্‌ব।

আশা করি ব— এত দিনে আমেরিকা পৌঁছেছেন। আহা বেচারি! তিনি এখানে খৃষ্টান ধর্ম্মের অত্যন্ত গোঁড়ামির ভাবটা প্রচার কর্‌তে এসেছিলেন ; সুতরাং যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে—কেউ তাঁর কথা শুন্‌ল না। অবশ্য তারা তাঁকে খুব যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করেছিল কিন্তু এও আমি চিঠি লিখেছিলাম বলেই। কিন্তু আমি তাঁকে কিছুতেই আক্কেল দিতে পার্‌লাম না! তিনি যেন এক কি-এক-ধরণের লোক। শুন্‌লাম, আমি দেশে ফিরে আসাতে সমগ্র জাতিটা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত আনন্দ প্রকাশ করেছিল, তাই শুনে তিনি মহা খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন। যা করেই হক, তোমাদের একজন মাথাওয়ালা লোক পাঠান উচিত ছিল, কারণ, ব— ধর্ম্মমহাসভাটীকে হিন্দুদের চক্ষে একটা হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার (farce) করে

গেছেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে জগতের কোন জাতই হিন্দুদের পথ-প্রদর্শক হতে পার্‌বে না। আর একটা বড় মজার কথা এই যে, খৃষ্টান দেশ থেকে যতগুলো লোক এদেশে এসেছে, তাদের সকলেরই সেই এক মান্ধাতার আমলের হাবাতে যুক্তি আছে যে, যেহেতু খৃষ্টানেরা শক্তিশালী ও ধনবান্ এবং হিন্দুরা তা নয় সেই হেতুই খৃষ্টধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইহার উত্তরে হিন্দুরা ঠিকই জবাব দেয় যে, সেই জন্যই ত হিন্দুধর্ম্ম হচ্ছে ধর্ম্ম আর খৃষ্টানধর্ম্ম ধর্ম্ম নয়। কারণ, এই পশুত্বপূর্ণ জগতে পাপের কেবল জয়জয়কার, আর পুণ্যের সর্ব্বদা নির্য্যাতন। এটা দেখা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য জাতি জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চায় যতই উন্নত হক না কেন, তত্ত্ববিজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তারা ক্ষুদ্র শিশুমাত্র। জড়বিজ্ঞান মাত্র ঐহিক উন্নতি বিধান করে। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান অনন্ত জীবনের সাথী। যদি অনন্ত জীবন নাও থাকে, তাহলেও আদর্শহিসাবে আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রসূত আনন্দ অধিক তীব্র এবং ইহা মানুষকে অধিকতর সুখী করে, আর জড়বাদপ্রসূত নির্ব্বুদ্ধিতা প্রতিযোগিতা, অযথা উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অবশেষে ব্যক্তিগত ও জাতিগত মৃত্যু আনয়ন করে।

এই দার্জ্জিলিং অতি সুন্দর জায়গা। এখান থেকে মাঝে মাঝে যখন মেঘ সরে যায়, তখন ২৭৫৭৯ ফিট উচ্চ মহিমামণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় এবং নিকটের একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে মাঝে মাঝে ২৯০০০ ফিট উচ্চ গৌরীশঙ্করের চকিত দর্শন পাওয়া যায়। আর এখানকার অধিবাসীরা যেন ছবিটীর মত—তিব্বতীরা, নেপালীরা এবং সর্ব্বোপরি সুন্দরী লেপচা স্ত্রীলোকেরা। তুমি চিকাগোর কল্‌ষ্টন্ টারন্‌বুল নামে কাউকে চেন কি? আমি ভারতবর্ষ পৌঁছিবার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি এখানে ছিলেন। তিনি দেখ্‌ছি আমাকে খুব পছন্দ কর্‌তেন, আর তার ফলে হিন্দুরা সকলেই তাঁকে অত্যন্ত পছন্দ করত। জে—, মিসেস এ—, সিষ্টার জে—এবং আমাদের আর আর বন্ধুদের খবর কি? আমাদের প্রিয় 'Mill'রা কোথায়?

(ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে গুঁড়ো করে যাচ্ছে বোধ হয়?) আমি হ—কে তার বিবাহে কয়েকটী প্রীতিউপহার পাঠাব মনে করেছিলাম কিন্তু তোমাদের যে ভীষণ জাহাজের মাশুল—তাই এখন রেখে দিতে হচ্ছে। হয়ত, তাদের সঙ্গে আমার শীঘ্রই ইউরোপে দেখা হবে। এই চিঠিতে যদি তোমারও বিবাহের কথাবার্ত্তা চল্‌ছে লিখ্‌তে তাহলে আমি, অবশ্য, অত্যন্ত আহ্লাদিত হতাম এবং আধ ডজন কাগজের একখানি চিঠি লিখে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্‌তাম।

*　　*　　*　　*

আমার চুল গোছায় গোছায় পাক্‌তে আরম্ভ করেছে এবং আমার মুখের চামড়া সমস্ত জড় হয়ে আস্‌ছে, এই মাংস শিথিল হয়ে যাওয়াতে আমার বয়স যেন আরও কুড়ি বছর বেড়ে গিয়েছে। এখন আমি দিন দিন ভয়ঙ্কর রোগা হয়ে যাচ্ছি, তার কারণ, আমাকে শুদ্ধ মাংস খেয়ে থাক্‌তে হচ্ছে—রুটী নেই, ভাত নেই, আলু নেই এমন কি আমার কফিতে একটু চিনিও নেই!! আমি এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে বাস কর্‌ছি—তারা সকলেই নিকারবোকার পরে, অবশ্য স্ত্রীলোকেরা নয়। আমিও নিকারবোকার পরে আছি। তুমি যদি আমাকে পাহাড়ে-হরিণের মত পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়াতে দেখ্‌তে অথবা চার প' তুলে উর্দ্ধশ্বাসে পাহাড়ে-রাস্তায় গুৎরাই চড়াই কর্‌তে দেখ্‌তে, তাহলে খুব আশ্চর্য্য হয়ে যেতে।

আমি এখানে বেশ ভাল আছি। কারণ, সমতল ভূমিতে বাস আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে, সেখানে আমার রাস্তায় পা-টী বাড়াবার যো নেই, অমনি একদল লোক আমায় দেখ্‌বে বলে ভীড় করেছে!! নামযশটা সব সময়েই বড় সুখের নয়!! আমি একটা মস্ত দাড়ি রাখ্‌ছি, এখন সেটা পাক্‌ছে। এতে বেশ গণ্যমান্য দেখায় এবং লোককে আমেরিকাবাসী কুৎসারটনাকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে। হে শ্বেতশ্মশ্রু, তুমি কত জিনিষই না ঢেকে রাখ্‌তে পার, তোমার জয়জয়কার, হাঃ হাঃ!

ডাক যাবার সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তাই শেষ করলাম। তোমার দেহ মন ভাল থাক ও অশেষ কল্যাণ হক।

বাবা, মা, ও তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানবে। ইতি—

তোমাদের

বিবেকানন্দ।

কালিয়-দমন। *

(শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত)

যমুনা হ্রদ—কালিন্দীর বিষধর কালিয়ের কালকূটে কালিন্দীর তীরভূমি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্যাম তরুলতা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কেবল কদম্বতরু শ্যামল পত্রপল্লবে শোভিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। কালিন্দীর তীরে—এই মৃত্যুর রাজ্যে—একমাত্র সজীব কদম্বতরু মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের নিদর্শনস্বরূপ বিদ্যমান।

কালিন্দীর অভ্যন্তরে সহস্রফণা বিষধর কালিয়ের বিষাগ্নিতে জল রাশি অবিরত বিষের তরঙ্গ তুলিত। হ্রদের বক্ষে সেই বিষতরঙ্গ-সংস্পর্শে বায়ু বিষকণা বহন করিয়া তীরভূমির দিকে প্রবাহিত হইত। সেই বিষবায়ুর স্পর্শে কালিন্দীতীরে আগত প্রাণিগণ প্রাণ হারাইত।

"খলসংযমনাবতারঃ"—গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ খলদমনার্থ অবতীর্ণ। বিষহ্রদ কালিন্দী পূতপুণ্য অমৃতধারা যমুনায় প্রবাহিত হইবে। বিষতরঙ্গ অমৃত তরঙ্গে নৃত্য করিবে। কালিন্দীর বিদগ্ধ তটভূমি যমুনার ফুলফলশোভিত শ্যামল কুঞ্জে মুঞ্জরিয়া উঠিবে। বিষকণা-বাহী বিষবায়ু অমৃতানিলে প্রবাহিত হইবে। মন্দ মন্দ ধীরসমীরে যমুনার শ্যামকুঞ্জ শিহরিয়া উঠিবে। মৃত্যুর জ্বালাময় অস্ফুট রব

* শ্রীমদ্ভাগবত—১০ম স্কন্ধ—১৬শ অধ্যায়।

কোকিলকূজনে ভ্রমরগুঞ্জনে শিখীনর্ত্তনে কুলু কুলু যমুনাকল্লোলের ছন্দে অপূর্ব্ব সঙ্গীতে ধ্বনিয়া উঠিবে। কালিন্দীর কালিয়ের বিষে মৃত অচেতন চৈতন্তে অমৃতত্বে সঞ্জীবিয়া উঠিবে। অতঃপর সেই পুণ্য যমুনাতীর্থে প্রণতি—"সাত্বতাং পতয়ে নমঃ।"—তুমি উপাসক-দিগের পতি, তোমায় নমস্কার!

নিদাঘ কাল, প্রখর আতপতাপ। একদা কালিন্দীতীরে গোকু-লের গোপগণ গোচারণ করিতে গিয়াছিল। গোচারণ করিতে করিতে গোপ এবং গোগণ আর্ত্ত হইল—পিপাসায় আকুল হইল। গো এবং গোপগণের প্রভু পরমাত্মীয় শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সঙ্গে বিচরণ করিতে-ছিলেন। তবু তাহারা পিপাসায় আকুল হইল। এ পিপাসা নিদাঘের পিপাসা আতপক্লেশের পিপাসা। গোগণ গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন না হইয়া দূরে কালিন্দীর তরল কালকূটের আস্বাদনে ধাবিত হইল। পিপাসার ক্লান্তি, নিদাঘের শ্রান্তি দূরীকরণ-মানসে প্রমত্ত গোগণ গোপগণ কালিন্দীর জল অঞ্জলি পুরিয়া পান করিল। অমৃতের সাক্ষী—কদম্বতরু সে দৃশ্য দর্শন করিল। গোকুলের স্বামী শ্রীহরি কদম্বমূলে দাড়াইয়া তাহাদের অবস্থা অব-লোকন করিলেন। শ্রীহরির পদপ্রান্তে পতিত গোগণ গোপগণের প্রতি শ্রীহরির অমৃতবর্ষিণী কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল। অমৃতের স্পর্শে তাহারা পুনর্জীবিত হইল। মৃত্যু হইতে জাগিয়া যমুনার তীরে কদম্বমূলে তাহাদের নাথ শ্রীহরিকে দর্শন করিল।

এই কালিন্দীকুল গোগণ এবং গোপগণের বিচরণভূমি। কৃপাময় শ্রীহরি কালিন্দীদূষিতকারী বিষধর শত্রু কালিয়কে নিগ্রহ করিয়া কালিন্দী হইতে বিদূরিত করিবার মানস করিলেন। বহুযুগ ধরিয়া সহস্রফণা বিষধর কালিয় হ্রদমধ্যে বাস করিয়া আসিতেছে। কালিন্দী বিশুদ্ধ হইয়া শ্রীহরির ক্রীড়াভূমি হইবে।

সেই অত্যুচ্চ অমৃততরু কদম্বশিরে শ্রীহরি আরোহণ করিলেন। বাহু আস্ফোটনপূর্ব্বক কালিন্দীর জলে ঝাঁপ দিলেন। শ্রীহরির পতনবেগে সর্পগণ সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল। তাহাদের উদ্গীরিত

বিষতেজে হ্রদস্থ জলরাশি স্ফীত হইয়া উঠিল। উগ্রতর অহিবিষে তরঙ্গসমূহ কাষায়ীকৃত হইল। শ্রীহরি সেই বিষতরঙ্গ স্বীয় বাহুদ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। শব্দ শ্রবণে কালিয় রোষগর্জ্জন করতঃ সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া হ্রদের তলদেশ হইতে উত্থিত হইল।

কালিন্দীতীরে গোপগণ শ্রীহরিকে দর্শন করিতেছিল। বিষতরঙ্গ-মধ্যে সুকুমার, মেঘোজ্জ্বলশ্যাম, পীতবসনাধরী, শ্রীবৎসশোভিত, সস্মিতানন, লাক্ষারসারুণ-চরণযুগল শ্রীহরি নির্ভযে বিহার করিতেছেন। কালিয় হ্রদতল হইতে উত্থিত হইল। হ্রদোপরি শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া রোষে সহস্র ফণা তুলিয়া শ্রীহরির মর্ম্মস্থলে দংশন করিল। দংশনান্তর স্বীয় শরীরাভোগে বেষ্টন করিল। সর্পশরীরাভোগে পরিবেষ্টিত শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া তীরস্থ গোপগণ ভীত এবং ম্রিয়মান হইল। তাহারা শ্রীহরির মুখের দিকে চাহিযা রোদন করিতে লাগিল।

শ্রীহরিপ্রিয় গোকুলের নরনারীর প্রাণ সহসা ভযে দুঃখে আচ্ছন্ন হইল। তাঁহাদের মনপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তাঁহারা দর্শনলালসায় গোকুল হইতে বহির্গত হইলেন। অপ্রমত্ত যোগিগণ শ্রুতিবর্ত্ম যোগে গমনকবতঃ অন্যান্য পদের মধ্যে তৎ তৎ উপাধির অপবাদপূর্ব্বক পরমতত্ত্ব অন্বেষণ করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণমতি গোকুল নরনারী তেমনি গাভীগণের বর্ত্মে গমন করতঃ অন্যান্য পদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, পদ্ম ও যবযুক্ত পদচিহ্ন নিরীক্ষণ করতঃ ত্বরায় যমুনাতীরে গমন করিলেন। যমুনাতীরে উপনীত হইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীমধ্যে সর্পশরীরে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন, তীরে গোপগণ নির্ব্বাক মুগ্ধ, গোগণ চতুর্দ্দিকে রোদন করিতে করিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এই দৃশ্যে গোকুলনরনারী অতিশয় আর্ত্ত হইলেন—দশদিক শূন্য দেখিতে লাগি-লেন; শ্রীকৃষ্ণের জন্য কালিন্দীর জলে প্রবেশ করিতে উন্মুখ হইলেন।

শ্রীহরি কালিন্দীর আবেষ্টন হইতে উত্থিত হইলেন। কালিন্দী-

প্রবেশোন্মুখ বিষাদিত গোকুল নরনারী শ্রীহরিকে উরঙ্গবন্ধ হইতে মুক্ত দেখিয়া নিরস্ত হইলেন। বিষাদ অপনোদিত হইল।

শ্রীহরির বাহুর আঘাতে ভূজঙ্গের কলেবর ব্যথিত হইল। শ্রীহরিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কুপিত ফণা উন্নত করিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। নাসারন্ধ্র বিষ উদ্গীরণ করিতে লাগিল। নয়নদ্বয় পাবকভাণ্ডবৎ সন্তপ্ত এবং স্তব্ধ হইল, বদন উল্মুকবৎ কালিমা প্রাপ্ত হইল। শ্রীহরি ক্রীড়াকরতঃ কালিয়ের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দংশনপ্রতীক্ষায় কালিযও ভ্রমণ করিতে লাগিল।

এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে কালিয়ের সামর্থ্য বিনষ্ট হইলে, শ্রীহরি সেই হৃততেজ ভুজঙ্গের উন্নত স্কন্ধ অবনত করিয়া মস্তকে আরোহণ করিলেন। কালিয়ের মস্তকস্থ রত্ননিকরের স্পর্শে শ্রীহরির পাদপদ্ম অপূর্ব্ব তাম্রজ্যোতি মণ্ডিত হইল। নৃত্যগুরু শ্রীহরি কালিয়ের চঞ্চল মস্তকে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। নৃত্যচ্ছলে শ্রীহরির চরণাঘাতে কালিয়ের প্রধান শত শীর্ষ বিমর্দ্দিত হইয়া শোণিত উদ্গীরণ করতঃ মোহপ্রাপ্ত হইল। সহস্র ফণা শ্রীহরির আশ্চর্য্য নৃত্যে বিক্ষত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল।

এইরূপে হৃততেজ কালিয দমিত হইয়া চরাচর পুরাণপুরুষ শ্রীহরির শরণাপন্ন হইল। কালিয়কে শরণাপন্ন হইতে দেখিযা কালিয়ের পত্নীগণও তাঁহার শরণাপন্ন হইল। শিশুসন্তানসহ কালিয়ের পত্নীগণ কালিয়ের মস্তকে দণ্ডায়মান শ্রীহরির নিকটবর্ত্তিনী হইয়া প্রণাম করতঃ স্তব করিতে লাগিল। এইরূপে বহু স্তুতি করিলে ভগবান প্রসন্ন হইয়া কালিয়কে স্ত্রীপুত্রবন্ধু-সমভিব্যাহারে কালিন্দী ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন। কালিয অন্তর্হিত হইল। শ্রীহরির অনুগ্রহে যমুনা বিষহীন হইল। যমুনার জল অমৃতবৎ সুস্বাদু হইল।

চিত্ত-কালিন্দী বাসনার সহস্রফণা তমোরূপ কালিয়ের দমনে পূত পুণ্য চিত্তযমুনায় পরিণত হয়। তখন উপাসকের পতি শ্রীহরি উপাসকের চিত্তযমুনায় তাহার সঙ্গে লীলা করেন।

সৎকথা।

ভগবানের নাম যত কর্‌তে পারা যায় ততই ভাল। বেশী না কর্‌তে পার্‌লে, অন্ততঃ সকালে সন্ধ্যায় হাততালি দিয়ে ভগবানের যে কোন নাম, যা ভাল লাগে, করা উচিত।

* * *

ভগবানের নাম যেখানে হয়, সেখানে ভগবান্ আবির্ভূত হন।

* * *

ভোগেচ্ছা সহজে যায় না, সেইজন্য ছোটখাট দুচারটে বাসনা মিটিয়ে নিতে হয়। বড় বড় বাসনাগুলো বিচার করে ছাড়্‌তে হয়।

* * *

ত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া কি মুখের কথা। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী হতে গেলে অনেক হাজার জন্মের সাধনার দরকার। তারা কত জন্ম রাজত্ব করেছে, রাজসুখ ভোগ করেছে, তবে বিতৃষ্ণা এসেছে—তারপর না সন্ন্যাসী হয়েছে?

* *

ধর্ম্ম কি ইন্দ্রিয়সুখ যে হাতে হাতে ফললাভ হবে? ধর্ম্মলাভ সময়-সাপেক্ষ, সৎপথে থেকে, ধৈর্য্যধরে থাক্‌তে হয়।

* * *

মানুষ ধর্ম্ম বুঝ্‌বে কি করে, রাত দিন কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে ব্যস্ত।

তবে যারা ঐ সংসারে থেকে মেহনৎ করে, টাকা উপার্জ্জন করে, দান ধ্যান করে, ভগবানের পূজা অর্চ্চনা করে, তাঁর বিষয়ে চর্চ্চা করে, তারা খুব বাহাদুর। এরা ভগবানের সন্তান।

* * *

সংসারে গিয়ে ভগবানের স্মরণ মনন করে জীবন কাটান খুব বাহাদুরি! তবে ভগবানেরই সংসার মনে করে সংসার কর্‌লে খুব সুবিধা হয়।

সামান্য সুখ ভোগ, মান যশ, টাকা কড়ির জন্য লোক পাগল হয়, ঐ সকল লাভ কর্‌বার জন্য কত কুমতলবই না করে। বুদ্ধদেব সম্রাটের ছেলে, তিনি কিন্তু জ্ঞানলাভের জন্য রাজত্ব পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলেন। আবার তপস্যা কর্‌তে কর্‌তে যখন সিদ্ধাই আস্‌তে লাগ্‌ল, তখন তিনি বল্লেন, "তপস্যা না করেই রাজত্ব পেয়েছিলাম, এখন কি আবার তপস্যা করে ঐ সকল লাভ কর্‌তে হবে?" - এই বলে তিনি সিদ্ধাই টিদ্ধাই তাড়িয়ে দিলেন।

বুদ্ধদেবের মত ত্যাগী হতে পার্‌লে তবে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। ভগবানলাভের জন্য সমস্ত ত্যাগ কর্‌তে হয়। মুক্তি কটা লোকের হয়! রামপ্রসাদ বলেছেন, "ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাতচাপড়ি।" অর্থাৎ ভগবান্ নিজেই মুক্ত করে দেন, আবার নিজেই মুক্ত পুরুষকে আদর করেন এবং বাহবা দেন।

* * *

সকলকেই কাঁদ্‌তে হবে—না কেঁদে উপায় নেই। কেউ ভাইয়ের জন্য, ছেলের জন্য কাঁদছে। যারা ভাই, ছেলের জন্য কাঁদে তারা জীব, আর যারা ভগবানের জন্য কাঁদে তারা যথার্থ ভাগ্যবান্ পুরুষ।

ভগবানকে ঠিক ঠিক ডাক্‌লে তিনি বাধা বিঘ্ন সব কাটিয়ে দেন—কর্ম্মফল কাটিয়ে দেন। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা; তিনি ইচ্ছা কর্‌লে কি না কর্‌তে পারেন?

* * *

রোজকারী বাপ মলে ছেলে দুঃখ করে আমার কি হবে? স্ত্রী দুঃখ করে আমার কি হবে? একবারও ভাবে না, যে গেল তার কি গতি হইবে? কয়জন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, "হে ভগবন্, ইনি যদি কোনও অন্যায় করে থাকেন, তবে ক্ষমা করিও?"

এই হল সংসার!

* *

খিদে হলে সব জিনিষ মিষ্টি লাগে—তখন যা জুটল সব ভোর-পেট খেলে; ক্ষুধাই হল প্রধান। তেমনি, যার ভগবানের উপর অনুরাগ হয়েছে সে আর মত-পথ, তর্ক-যুক্তি অত বিচার করে না। যে কোন পথ অবলম্বন করে তাঁকে লাভ কর্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়।

ভগবানে অনুরাগ, বিশ্বাসই হল তাঁকে লাভ কর্‌বার প্রধান অবলম্বন।

* * *

ঋষিরা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব স্তুতি কর্‌তেন, তাই তিনি তাদের জানিয়ে দিলেন 'আমি ভগবান্'। কিন্তু রাখালরা তাঁর সঙ্গে কত খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ কর্‌লে, তবুও তাঁকে জান্‌তে পার্‌লে না।

তাঁকে জান্‌তে হলে সাধনভজন, স্তবস্তুতি কর্‌তে হয়। এইরূপে লেগে পড়ে থাক্‌লে তিনি দেখা দেন, সব বুঝিয়ে দেন।

* * *

যতই ঘোর ফের না, দেখ্‌বে কোথাও কিছুই নেই, বরং মহা কর্ম্ম। এক জায়গায় বসে মন স্থির করে ডাক্‌লেই হয়ে যাবে।

* * *

ভগবান্ কি গাছের ফল? তাঁর কৃপা চাই, দয়া চাই। তাঁর কৃপা লাভ কর্‌তে হলে, সাধুদের ভালবাসা আশীর্ব্বাদ পেতে হয়। ভগবান্ আছেন বলে বিশ্বাস কর। বিশ্বাস করে যেখানে বসে ডাক্‌বে সেইখানেই পাবে। ভগবান্ চিরকালই আছেন। জীব এল আর গেল, এই আছে এই নেই। কিন্তু ইহাও সত্য যে জীবই আবার ভগবান্ লাভ করে।

* * *

যে ভগবান্‌কে মান্‌বে সেই বেঁচে যাবে, আনন্দ পাবে, সুখী হবে। আর যে না মান্‌বে, সে দুঃখভোগ কর্‌বে।

সমালোচনা।

চিত্রপট—'নিবেদিতা'-প্রণেত্রী শ্রীমতী সরলাবালা দাসী রচিত; এণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা ও কাপড়ে বাঁধান, বন্ধু বান্ধবকে উপহার দিবার উপযুক্ত, মনোজ্ঞদর্শন, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স, ৯০ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পুস্তকখানি বারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের সংগ্রহ। তন্মধ্যে চারিটি, আমাদের সমাজের বর্ত্তমান বিবাহপদ্ধতির দোষগুণ লইয়া। দুইটি, ভগিনী ও স্ত্রীর নিঃস্বার্থ প্রেম লইয়া। একটী, প্রেমের প্রেরণায় উচ্চ স্বার্থত্যাগ লইয়া। একটি, আসন্ন বিপৎপাতের ছায়া ধরিবার মানবমনের স্বাভাবিক শক্তি লইয়া। একটি, সেকেলে বাপ ও একেলে ছেলের ভিতর প্রাচীন ও নবীন শিক্ষাপদ্ধতি যে সকল বিরুদ্ধ সংস্কারসমূহের ব্যবধান আনয়নপূর্ব্বক দিন দিন তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেয়, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসাই কেবল মাত্র উহার হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা ও পুনরায় মিলিত করিতে সক্ষম, ইহা লইয়া। একটি, পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের বিচারপূর্ব্বক সমাজ ও নীতি-বিগর্হিত অপরাধসকলের দণ্ড প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য, ইহা লইয়া। একটি, অহঙ্কার ও অভিমানের প্রেরণায় বৈরাগ্যাবলম্বনের হাস্যাস্পদ পরিণাম লইয়া। এবং একটি ডিটেক্‌টিভদিগের প্রখর দৃষ্টি ও প্রবল অনুমানশক্তি লইয়া বিরচিত।

গ্রন্থকর্ত্রীর গল্পগুলি বলিবার বাঁধনি চমৎকার এবং ভাষা প্রাঞ্জল, ওজস্বী ও ভাবপ্রকাশের বিশেষ অনুরূপ। স্বল্পকথায় চরিত্র অঙ্কনে তাঁহার দক্ষতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না, বিশেষতঃ আবার স্ত্রীচরিত্র সকলের। 'চিত্র' গল্পের 'পার্ব্বতী' 'স্মৃতি'র 'স্মৃতি,' 'পথের দেখা'র 'উমা', 'স্মৃতিচিহ্নে'র 'হেমাঙ্গিনী', 'নিশি'র 'নিশি'

প্রভৃতি স্ত্রীচরিত্রগুলি বিশেষ জীবন্ত ও পরিস্ফুট। উঁহাদিগের করুণ কাহিনী পাঠে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া রাখা যায় না। করুণ রসের অবতারণায় গ্রন্থকর্ত্রী এক প্রকার সিদ্ধহস্ত। উদ্বোধনের পাঠকবর্গের সহিত শ্রীমতী সরলাবালার নূতন পরিচয় নহে। তাঁহার চিন্তাশীল দার্শনিক প্রবন্ধসকল ইতিপূর্ব্বে পাঠ করিয়া তাঁহারা মোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে তাঁহাদিগকে অবসর কালে ছোট ছোট গল্প বলিয়া এরূপে মুগ্ধ করিতে পারেন, তাহা বোধ হয় অনেকেরই ধারণা নাই। আশা করি, সুখপাঠ্য পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা যেরূপ আনন্দে কয়েক ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিয়াছি, তাঁহারাও ঐরূপে সেই বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিতে বিলম্ব করিবেন না।

নচিকেতা—(উপনিষদের উপাখ্যান) শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত: মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত ভূমিকাসম্বলিত এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সুন্দর কাগজে সুন্দর ছাপা ও দুইখানি সুন্দর চিত্র সংযুক্ত—মূল্য বার আনা মাত্র।

উদ্দালক মুনির পুত্র নচিকেতা যমরাজের ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রসন্নতায় বিশেষ ফলোপধায়ক অগ্নির উপাসনা-প্রণালী ও আত্মবিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, একথা সরল ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে। উহার রসগ্রহণ করিতে হইলে উপনিষদের ভাষা ভিন্ন ঐ প্রাচীন যুগের আচার, ব্যবহার, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করা প্রয়োজন। বঙ্গের সাধারণ পাঠকবর্গ ঐ কারণে কঠপ্রমুখ উপনিষৎ-নিবদ্ধ সরল মধুর অথচ গম্ভীর অধ্যাত্মবিদ্যাসম্বলিত উপাখ্যানসকলের মর্ম্মগ্রহণপূর্ব্বক আনন্দলাভে এতকাল এক প্রকার বঞ্চিত। উপনিষৎ সকলের বঙ্গানুবাদ প্রচলিত থাকিলেও উহাতে বৈদিক-যুগের সামাজিক আচারব্যবহারাদির কথা সরলভাবে বিবৃত না থাকায় অনভিজ্ঞ পাঠকগণ উহার সহায়ে উক্ত উপাখ্যানসকলের যথাযথ ভাব গ্রহণ

করিতে পারেন না। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি ঐ অভাব পূর্ণ করিয়া কঠোপনিষদের রসগ্রহণে পাঠককে নিঃসংশয় বিশেষ সহায়তা করিবে। গ্রন্থকার উক্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য বস্তুগুলি বলিবার কালে তৎকালীন আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়াকর্ম্মাদির এমন সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন যে, উহা পড়িতে পড়িতে ঐ যুগের একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ চিত্র মানসপটে স্বতঃ অঙ্কিত হইয়া উঠে। গ্রন্থকারের ভাষাও বিশেষ সুললিত ও সুখপাঠ্য। পাঠকবর্গ গ্রন্থকারের বর্ত্তমান গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক উপনিষৎ-নিবদ্ধ অন্য উপাখ্যানসকলের এইরূপ হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা প্রকাশ করিতে তাঁহাকে উৎসাহিত করিবেন, ইহাই তাঁহাদের প্রতি আমাদিগের সানুনয় অনুরোধ।

সপ্তস্বর (সচিত্র)—শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট্ দ্বারা মুদ্রিত—মূল্য দেড় টাকা।

সুন্দর কাগজে, মনোজ্ঞ মলাট ও বাঁধাইয়ে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার পঞ্চদশ হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে সকল কবিতা ভারতী, সাধনা, সাহিত্য প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশ করিয়াছিলেন, পুস্তকখানি তাহারই সংগ্রহ। অধিকন্তু, গ্রন্থকার ও তাঁহার পিতার চিত্র ভিন্ন একুশ খানি রঙ্গিন চিত্রসম্বলিত হইয়া ইহা প্রতিপাদ্য বিষয়সকলকে অধিকতর মনোরম করিয়াছে। ভূমিকার উপসংহারে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "সপ্তস্বর সেই (বিশ্ব) বীণানিক্কণেরই তরঙ্গাঘাতে সমুত্থিত"—এবং প্রার্থনা করিয়াছেন, "হৃদয়ের শিখরে সঙ্গীতের যে ক্ষুদ্র নির্ঝর ছুটিয়াছে, তাহা সুবিশাল ভাবনদীতে পরিণত হইয়া জীবনের উপকূল প্লাবিত করুক!"—স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক আমরাও উহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করি। লেখকের যৌবনপ্রারম্ভের প্রথম উদ্যমের সাফল্যস্বরূপ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

সংবাদ ও মন্তব্য।

গত ১৩ই ফাল্গুন, রবিবার ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্ব্যশীতিতম জন্মোৎসব ও তদুপলক্ষ্যে ১১ই ফাল্গুন ২৩শে ফেব্রুয়ারী জন্মতিথিপূজা মহাসমারোহে হইয়া গিয়াছে। জন্মতিথিপূজার দিন প্রায় ৫০০।৬০০ ভক্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উপস্থিতিতেই সেই দিন আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল।

মহোৎসবের দিন মঠের বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উত্তরধারে একটী মণ্ডপ বিশেষভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। তথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি প্রতিমূর্ত্তি লতা পুষ্পাদি দ্বারা মণ্ডিত করিয়া স্থাপিত হইয়াছিল। প্রায় ৫০।৬০ হাজার নরনারী উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সকাল হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টীমারের বন্দোবস্ত ছিল। এতদ্ভিন্ন নৌকাযোগে, রেলে ও পদব্রজে বহুসংখ্যক লোক আগমন করিয়াছিলেন। প্রায় ১০ হাজার লোক পংক্তিতে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আঁন্দুলের কালীকীর্ত্তন সম্প্রদায়, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বাবুর কনসার্ট পার্টি এবং নানাস্থান হইতে আগত ক্ষুদ্র বৃহৎ সঙ্কীর্ত্তণের দল ভগবানের নামগানে মঠটী সদ্ভাবে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর অলোকসামান্য সাধনা দ্বারা যে সত্য লাভ করিয়া গিয়াছেন তাহা উপলব্ধি করাই যে ভারতবাসীর প্রাণের কথা, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব দিনে বিনা আহ্বানে এই বিপুল জনসঙ্ঘের সমাগমই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

কাশী, শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে জন্মতিথিপূজা ও মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। মহোৎসবের দিন ঠাকুরের ছবি লতাপুষ্পাদির দ্বারা সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছিল। প্রায়

১০০ শত সাধু ও দরিদ্র নারায়ণ প্রসাদ পাইয়াছিলেন। বৈকালে চণ্ডীর গান হইবার পর ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখার্জ্জি এম্‌.এ, পি এইচ ডি, পি আর এস, মহোদয় ইংরাজীতে এবং শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন চ্যাটার্জ্জি মহাশয় হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের "জীবনী ও শিক্ষা" সম্বন্ধে সুললিত ও মনোজ্ঞ ভাষায় বক্তৃতা করেন। তৎপরে ভজন ও প্রসাদ বিতরণান্তর উৎসব সমাপ্ত হয়। প্রায় ৮০০ ভক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

কনখল, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত দিবস ভজনাদির পর পণ্ডিত যোগেন্দ্র নাথ শর্ম্মা সাংখ্য-কাব্য-তর্ক-বেদান্ততীর্থ মহোদয় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তৎপরে সাধুসেবা ও প্রসাদ বিতরণ হয়।

বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী, কুচবেহারে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব মহাসমারোহে হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় এবং দূরদেশ হইতে আগত বহুসংখ্যক লোক উহাতে যোগদান করেন। উক্ত দিবস বিশেষভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা এবং ভজনাদি হয়। দরিদ্রনারায়ণগণের সেবাই উক্ত উৎসবের প্রধান অঙ্গস্বরূপ ছিল।

গত ২০শে ফাল্গুন ৪ঠা মার্চ্চ, রবিবার ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। বিশেষভাবে পূজা ও ভোগরাগাদি হইয়াছিল।

উক্ত দিবসই অপরাহ্নে মিশনগৃহে মিশনের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঢাকার মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস, জি, হার্ট মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী নাগপুর গীতাবলদিতে শ্রীমুরলিধরের মন্দির-প্রাঙ্গণে, ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সঙ্কীর্ত্তনান্তর প্রফেসার শ্রীযুক্ত রামপ্রতাপ শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রি ঘূলে ও প্রফেসার শ্রীযুক্ত কালীচরণ চ্যাটার্জ্জি এম, এ মহাশয়দ্বয় "শ্রীরামকৃষ্ণ ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের আদর্শ" সম্বন্ধে আলোচনা করেন। উক্তদিবস দরিদ্রনারায়ণ-সেবাও হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত বৃন্দাবন, কিষণপুর, মান্দ্রাজ, মায়াবতী, বাঙ্গালোর প্রভৃতি মিশন ও মঠের কেন্দ্রসমূহে এবং অন্যান্য স্থানে ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

সিষ্টার নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়।

(কার্য্যবিবরণী—১৯১৪-১৫ খৃঃ

১৯০১ (খৃঃ) সালে প্রতিষ্ঠিত সিষ্টার নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয় এবং ১৯০৪ সালে প্রারব্ধ অন্তঃপুরচারিণীদের শিক্ষাকার্য্য—আপাততঃ এই দ্বিবিধ অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথে স্ত্রীজাতির কল্যাণকর যে সংস্থানের প্রবর্ত্তনা করা হইয়াছে, তাহার ১৯১৪ ও ১৯১৫ সালের কার্য্যবিবরণী (রিপোর্ট) সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করা হইতেছে।

এই বিবরণী পাঠে আমাদের সহৃদয় বন্ধুবান্ধবগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সমস্ত অভাব বিঘ্নসত্ত্বেও আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে বিদ্যালয়াদির কার্য্যে পূর্ব্ববৎ উন্নতিশীলতা ও ফলোৎকর্ষ দেখা যাইতেছে। সিষ্টার নিবেদিতার মহান্ আত্মত্যাগ কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়া আপনার চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি আত্মত্যাগিনী শিক্ষয়িত্রীর সমাবেশ ঘটাইয়াছে ; এই সমাবেশই যেন অনুষ্ঠানটীর স্থায়ী মূলধন,—

ইহার বিস্তার ও উন্নতির অব্যর্থ প্রতিভূস্বরূপ। এবং এই মহৎ কার্য্য যে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া বৃক্ষলতাদির মত চারিদিকে মুঞ্জরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, ১৭নং বোসপাড়া লেনস্থ বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা যেমন বাড়িয়া যাইতেছে, বালির শাখা বিদ্যালয়েরও সন্তোষজনক কার্য্যবিবরণ পাওয়া যাইতেছে এবং বেলুড় মঠের ট্রষ্টিগণকর্ত্তৃক ৬৮।২।বি নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে একটা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে মাতৃমন্দির নামে একটা আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে (যাহার সবিশেষ বিবরণ বর্ত্তমান রিপোর্টের শেষভাগে সংলগ্ন করা হইল)। মনে হইতেছে, কালে সম্মুখের পথ ক্রমশঃই পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতর হইয়া আসিয়াছে এবং এখন আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য—সমগ্র অনুষ্ঠানটীকে স্থায়িত্বের সোপানে প্রতিষ্ঠিত করা।

বলা বাহুল্য, এই স্থায়িত্বের মূল ব্যবস্থা করিতে গেলেই, প্রথমেই উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত পরিমাণ কতকটা জমি ক্রয় করা আবশ্যক। জমি পাওয়া গেলেই সদাশয় "বন্দেমাতরম্" সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থে বাটীনির্ম্মাণ কার্য্য সুরু করা যাইতে পারে। অতএব, এই জমির অভাব দূর করিবার জন্য আমাদের আবেদনে স্বদেশবাসিগণ কি আজ কর্ণপাত করিবেন না? যে অত্যুজ্জ্বল আত্মোৎসর্গ সমগ্র অনুষ্ঠানটীকে বিশিষ্ট পুণ্যে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে, তাহারই স্মৃতিতে প্রণোদিত হইয়া তৎসৃষ্ট এই অনুষ্ঠানটীর জন্য একটা স্থায়ী আবাস-স্থানের ব্যবস্থা করিতে আজ আমরা কি সকলেই যথাসাধ্য উদ্যম প্রকাশ করিব না? এমন একটা পবিত্র আহ্বানের প্রতি ভারতবাসীর মন অতীতে ত কখনও উদাসীন হয় নাই, এবং ভবিষ্যতে কখনও যেন সেরূপ না হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। সেই জন্য আজ আমাদের স্বদেশবাসীদের দ্বারা এই শুভকার্য্যের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনটীর পূরণ যে হইবেই হইবে, সে আশায় আমরা আশান্বিত রহিলাম।

আবশ্যকমত বেলুড়স্থ রামকৃষ্ণমঠের ট্রষ্টিদের সহযোগে সিষ্টার ক্রিশ্চিন ১৭নং বোসপাড়া লেন হইতে উল্লিখিত স্ত্রীজাতির কল্যাণকর সংস্থানের উন্নতিকল্পে যে কার্য্য করিয়াছেন নিম্নে তাহারই একটী

সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে আমরা যে রিপোর্ট প্রকাশ করি, বর্ত্তমান রিপোর্ট তাহারই পরবর্ত্তী।

সিষ্টার ক্রিশ্চিন ও তাঁহার কার্য্য।

প্রথমেই বলা দরকার যে, ১৯১৪ সালের এপ্রেল মাসে সংস্থানটীর প্রাণকল্পা সিষ্টার ক্রিশ্চিন ভগ্ন স্বাস্থ্যের প্রতিবিধানার্থ ভারত ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় চলিয়া যান। তখন তাঁহারই স্বহস্তগঠিত কতকগুলি শিক্ষয়িত্রীর উপর সমস্ত কার্য্যভার অর্পিত হয়। প্রথমে কথা ছিল যে, এক বৎসরের মধ্যেই তিনি ফিরিয়া আসিয়া সে ভার আবার গ্রহণ করিবেন, কিন্তু ইউরোপের বর্ত্তমান ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ায় এবং আইনতঃ আমেরিকা যুক্তরাজ্যের অধিবাসিনী হইলেও জার্ম্মান বংশে তাঁহার পিতৃপিতামহের জন্ম হওয়ায়, এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা সে সময় তাঁহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে। যাহা হউক, আমরা খুবই আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, তিনি এখন আপনার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছেন এবং যুদ্ধাবসানে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন ও স্বীয় কার্য্যভার পুনগ্রহণের প্রতীক্ষায় সাগ্রহে দিন যাপন করিতেছেন। সুতরাং ১৯১৪ সাল এপ্রেল মাস হইতে তাঁহার অনুপস্থিতিসত্ত্বেও সমভাবে কার্য্য চালাইয়া দেওয়া হইতেছে এবং এই দীর্ঘকাল যে কার্য্যভারপ্রাপ্তা কুমারী সুধীরা প্রভৃতি শিক্ষয়িত্রীগণ এই বিষয়ে এতটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহাতে ইঁহাদের কর্ম্মকুশলতা ও শিক্ষকতা বিশেষ প্রশংসার্হ বলিতে হইবে।

একই অনুষ্ঠানের দ্বিবিধ অঙ্গ।

এখন আমরা বিভিন্ন কার্য্যবিভাগের ও তৎপরিচালনার বিবিধ উপায় ও প্রণালীর কথা কিছু বলিব। আমরা পূর্ব্ব রিপোর্টে বলিয়াছি যে, বালিকা বিদ্যালয় ও অন্তঃপুরচারিণীদের বিভাগ বিভিন্ন সময়ে সিষ্টার নিবেদিতা ও সিষ্টার ক্রিশ্চিনের দ্বারা পৃথক্‌ভাবে স্থাপিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে কার্য্যের এই দুইটী অঙ্গ সম্মিলিতভাবে পরিচালিত হইতেছে; সেই জন্য উহাদের বিবরণ পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হইল না।

ছাত্রীসংখ্যা ও অন্তঃপুরচারিণীদের সংখ্যা।

বালিকাবিদ্যালয়ে সর্ব্বসমেত ১৫০ জন ছাত্রী বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষা লাভ করিতেছে এবং গড়পড়তায় তাহাদের দৈনন্দিন উপস্থিতির হিসাব ১২৫। অন্তঃপুরচারিণীদের বিভাগে ৩৭ জন শিক্ষালাভ করিতেছেন।

অন্তঃপুরচারিণীদের শিক্ষাদানে দুইটী প্রধান বিভাগ।

অন্তঃপুরচারিণীদের বিভাগে দুইটী প্রধান শ্রেণীভাগ রহিয়াছে। প্রথম একটী শ্রেণীতে বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকদিগের বিশেষভাবে শিক্ষণীয় সকল বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং দ্বিতীয় অংশে ঐ সমস্ত বিষয় ব্যতীত যাঁহারা শিক্ষাদানকার্য্যে নিপুণতা লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের সে কার্য্যেরও শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শেষোক্ত বিভাগে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র, সীবনবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিক্ষাদান কার্য্যও প্রতি শনিবার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থিনাকে প্রতিদিন দুই ঘণ্টা বা ততোধিককাল বালিকাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষকতা করাইয়া শিক্ষাদানকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে দেওয়া হয়। অন্তঃপুরচারিণীদের শিক্ষাকার্য্যের প্রথম বিভাগে ১১ জন বিধবা ও ৯ জন সধবা স্ত্রীলোক আছেন; ইঁহাদের অভিভাবকগণ সকলেই ইঁহাদের শিক্ষালাভে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় বিভাগে ১৭ জন মহিলা শিক্ষকতা ও বিদ্যালয় পরিচালন কার্য্যে যোগ্যতা লাভ করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে ১৩ জন সিষ্টার ক্রিশ্চিনের প্রধান সহকারিণী শ্রীমতী সুধারার নেতৃত্বে সমগ্র বালিকাবিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্য্য চালাইয়া দিতেছেন। প্রসঙ্গতঃ আমরা জ্ঞাপন করিতে চাহি যে, উক্ত ১৭ জন শিক্ষার্থিনীর মধ্যে সপ্তদশবর্ষীয়া একটী কুমারীকে তাঁহার অতি দরিদ্র পিতামাতা ইচ্ছানুরূপ পাত্রস্থা করিতে না পারায় গত দুই বৎসর

হইল শ্রীমতী সুধীরা তাঁহাকে শিক্ষাদানরূপ মহৎ ব্রতে দীক্ষিত করিয়া লইয়াছেন। এই বিভাগের সেলাই-কার্য্যে তিনটী বর্ষীয়সী মহিলা শিক্ষার্থিনী হইয়া যোগদান করিয়াছেন।

বালিকাবিদ্যালয়ের শ্রেণীভাগ।

বালিকাবিদ্যালয়ে পাঁচটী শ্রেণী বিদ্যমান। তন্মধ্যে প্রথমবার্ষিক (শিশুদের) শ্রেণীতে তিনটী বিভাগ (সেক্‌শন) করিতে হইয়াছে; বাকি চারটী শ্রেণীর প্রত্যেকটীতে দুইটী করিয়া বিভাগ আছে। প্রত্যেক শ্রেণীতে কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় এবং কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিলে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্য্যসম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে।

সমগ্র শিক্ষাকার্য্যের সাধারণ লক্ষ্য।

প্রায়ই বিদ্যালয়ের বালিকাদিগকে পাঁচ বৎসর বিদ্যালয়ে পড়িতে দেওয়া হয়, কারণ, তাহার পরই সাধারণতঃ তাহাদের বিবাহ-নিবন্ধন বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হয়। অতএব প্রথম হইতে তাহাদিগকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা করা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদানে আবশ্যক বলিয়া নির্দ্ধারিত, ঐ পাঁচ বৎসরের মধ্যে সেই সমস্ত বিষয়ের মোটামুটি অথচ কালোপযোগী জ্ঞান তাহারা লাভ করে এবং সেই সকল বিষয়ের যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে বিচার ও প্রয়োগে অভ্যস্তা হয়। কাজে কাজেই প্রত্যেক শ্রেণীর নানাবিধ পাঠ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়াও একটী প্রধান অঙ্গ।

শিশু-শ্রেণীতে শিক্ষাকার্য্যের প্রণালী।

শিশুদের শ্রেণীতে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর অনুসরণ করা হয় এবং তাহাদিগকে প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের সব পাঠই মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া হয়। ১ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত সংখ্যার গণন, যোগ, বিয়োগ প্রভৃতি অঙ্ক, পুত্তলিকা প্রভৃতি ও বোর্ডের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত, পদার্থবিষয়ে সাধারণ জ্ঞান,

মৃত্তিকাশিল্প, তুলির কাজ, কার্ডসেলাই ড্রিল (drill) প্রভৃতি সামান্য সামান্য ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। এ সমস্তই চক্ষুকর্ণাদি প্রয়োগেই বেশীর ভাগ তাহারা শিক্ষা করে, কেতাবের সাহায্য অতি সামান্য লওয়া হয়। যেমন বাঙ্গালা শিক্ষার সময় তাহারা নানা শব্দ লিখিয়া লয় বটে, কিন্তু সে গুলির বানান করা বা ভিন্ন প্রকারের ই, উ, জ, শ, প্রভেদ করা প্রথম হইতেই শিক্ষা করে না। প্রায় ৬ মাস এই ভাবে শিখাইবার পর যে সুফল দেখা যায়, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। কারণ সে সময় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সমস্ত শব্দ তাহারা বোর্ডে দেখিবামাত্র পড়িতে পারে, অথবা উচ্চারণ শুনিয়া লিখিয়া দিতে পারে। ইহার পরই তাহাদিগকে বর্ণপরিচয়াদি পুস্তক পড়িতে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শিক্ষাকার্য্য।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে সরলপাঠ, হিতোপদেশ প্রভৃতি সোজা সোজা বই পড়িতে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়ের মর্ম্মগ্রহণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, ১০০ পর্য্যন্ত সংখ্যা, যোগবিয়োগ প্রভৃতি মুখে মুখে শিখান হয়, তৃতীয়তঃ, শ্রুতি সাহায্যে নানা ইংরাজী শব্দ শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তারপর আজকালকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইংরাজী বর্ণপরিচয় করান হয়। চতুর্থতঃ পুরাণ ও ইতিহাসের নানা গল্পের সাহায্যে ভূগোলের জ্ঞান অল্প অল্প দেওয়া হয়। এই শ্রেণীতে কার্ড-সেলাই, তুলির কাজ প্রভৃতির শিক্ষা আরও অগ্রসর হয়।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শিক্ষাকার্য্য।

(ক) কথামালা, শিশু রামায়ণ প্রভৃতি বইয়ের সাহায্যে বাঙ্গালা শব্দসমূহ ও তাহাদের পর্য্যায়ের শিক্ষা দেওয়া এবং বানান শিখাইবার জন্য শব্দের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ।

(খ) সংস্কৃত বর্ণপরিচয়, সন্ধি প্রভৃতির শিক্ষা—"সংস্কৃত প্রবেশের" সাহায্যে।

(গ) পাটীগণিত।

(ঘ ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে শিখা, এবং "কিং প্রাইমারের" সাহায্যে ইংরাজী পাঠ করিতে শিখা।

(ঙ) মানচিত্রের সাহায্যে ভূগোলশিক্ষা। রামায়ণ ও মহাভারত সাহায্যে প্রাচীন ভারতের কথা-কাহিনী এবং আধুনিক ইতিহাসের নানা গল্প।

(চ) সেলাই শিক্ষা এবং রুমাল, সেমিজ প্রভৃতির সোজা সোজা কাট শিক্ষা।

(ছ) তুলির কাজ।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর শিক্ষাকার্য্য।

(ক) "পৌরাণিকী কাহিনী" "শিশু মহাভারত" এবং অন্যান্য পুস্তকের সাহায্যে গল্প ও প্রবন্ধরচনা।

(খ) সংস্কৃত ব্যাকরণ, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সংস্কৃত প্রবেশ।

(গ) পাটীগণিত।

(ঘ) ইংরাজী—MacMillan's Readers, Tippings Third and Fourth Standard, Steps to Learning English (Parts I and II). Translation.

(ঙ) এশিয়ার ভূগোল।

(চ) শ্রীমতী হেমলতা দেবীর ও অন্যান্য গ্রন্থকারের রচিত ভারতেতিহাস।

(ছ) সেলাই ও কাট শিক্ষা।

(জ) তুলির কাজ।

পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর শিক্ষাকার্য্য।

(ক) বাঙ্গালা—"সীতার বনবাস," "অলর্ক চরিত" "রাজপুত কাহিনী" ও অন্যান্য পুস্তক। বাঙ্গালা রচনাশিক্ষা।

(খ) "সংস্কৃত পরিচয়ম্" ও "ঋজুপাঠ" সহকারে সমগ্র সংস্কৃত ব্যাকরণ।

(গ) সমগ্র পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির সামান্য সামান্য অংশ।

(ঘ) ইংরাজী—MacMillan's Readers (Parts III and IV); Tipping's Fourth and Fifth Standard; Translation by Benimadhab Ganguli.

(ঙ) সমগ্র ভূগোল।

(চ) সমগ্র ভারতের ইতিহাস।

(ছ) সেলাই ও সাধারণ সাজসজ্জার আবশ্যক জামা প্রভৃতির কাটছাট শিক্ষা; সূক্ষ্ম সূচীশিল্প।

(জ) সূক্ষ্ম তুলির কাজ।

মাতৃমন্দির।

পূর্ব্বের রিপোর্টে আমরা জানাইযাছি যে, নারীদিগের জন্য একটী আশ্রমস্থাপনা কার্য্যতঃ কিরূপ দাঁড়ায় দেখিবার অভিপ্রায়ে আমরা ১৯১৪ সালে ঐরূপ একটী সামান্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করি। একটী আশ্রম স্থাপন করা যে নিতান্তই প্রযোজন, তাহা নানা সময়ে নানা সমস্যা উপস্থিত হইয়া আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইত। প্রথম যখন একটী বাটীতে ঐরূপ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইল, তখন কি ভাবে উহা চালাইতে হইবে তাহার বাঁধাধরা নিযমকানুন গড়িয়া দেওয়া হয় নাই; বরং নিজেব পরিচালনা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য যাহা আবশ্যক তাহা আশ্রমটিকে নিজের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা দ্বারা গডিয়া লইতে দেওয়া হইয়াছিল। আনন্দের বিষয়, এই আশ্রমটী ইতিমধ্যে যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা আমাদের আশাতীত, এবং যে সমস্ত উদ্দেশ্য লইয়া এখন ইহা দণ্ডায়মান, তাহা নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে :—

(ক) যে সকল হিন্দুরমণী আজীবন ঐকান্তিকভাবে শিক্ষাপ্রচার ও সেবারূপ মহৎ ব্রত পালন করিবেন, আশ্রমটী তাঁহাদের বাসস্থানস্বরূপ।

(খ) এইরূপ হিন্দুরমণীর জীবনে যে উন্নত আদর্শের বিকাশ চাই, আশ্রমটী তাহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও তৎসাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র হইবে এবং চরিত্রগঠনের প্রকৃষ্ট প্রণালীর শিক্ষা ও অনুশীলনে সুবিধা বিধান করিবে।

(গ) নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকিবার সুবিধা না থাকায় যে সকল বালিকা সিষ্টার ক্রিশ্চিন পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইবার অভিলাষ পূরণ করিতে পারিতেছে না, তাহাদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ধার্য্য মাসিক অর্থ পাইলে এই আশ্রমে যথাসম্ভব তাহাদের জন্য থাকিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

(ঘ) যাহারা লোকসেবাকার্য্যে নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে চাহে, এই আশ্রম হইতে তাহাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকাধীনে আধুনিক উৎকৃষ্ট প্রণালীতে চিকিৎসা, শুশ্রূষা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবার ব্যবস্থাদি করা হইবে এবং এখানে তাহারা নিজেদের উচ্চ আদর্শানুযায়ী জীবন গঠন করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইবে।

(ঙ) দরিদ্র অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ যাহাতে নানা প্রকার সেলাই-কার্য্য, চাটনি তৈয়ারী করা ও অন্যান্য শিল্পকার্য্যের দ্বারা অথবা ভদ্রপরিবারে পড়াইবার কার্য্য পাইয়া আত্মনির্ভরের উপর আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সে বিষয় শিক্ষা দেওয়া ও সর্ব্ববিধ সুযোগ ও সুবিধা বিধান করা এই আশ্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অর্থাৎ যিনি যেরূপ সৎশিক্ষালাভ করিবার উদ্দেশ্যে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, আশ্রম সেইরূপ শিক্ষারই যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিবে এবং যাহাতে যথার্থ আত্মনির্ভরের ভাব আশ্রমবাসিনীদের জীবনে পরিস্ফুট হয় তাহার জন্য যথাসম্ভব সাহায্য করিবে। আশ্রমটী প্রথমে বিদ্যালয় বাটীতেই খোলা হয়, কিন্তু অল্পদিনেই নানাকারণে দেখা গেল যে একটী পৃথক বাটী নিতান্তই আবশ্যক। সুতরাং ১৯১১ সালের নবেম্বর মাস হইতে কোন সহৃদয় বন্ধুর অর্থসাহায্যে মাসিক ৩০ ৲ টাকা ভাড়ায় বর্ত্তমান বাড়ীতে আশ্রম স্থানান্তরিত হয়।

বর্ত্তমানে আশ্রমে ১১ জন বাস করেন; তন্মধ্যে একটী পিতৃ-মাতৃহীনা নিরাশ্রয়া সাত বৎসরের বালিকা আছে; ইহাকে এক বৎসর হইল উড়িষ্যা হইতে ভদ্রকের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় হাঁসপাতালে তাহার মাতার মৃত্যুর পর শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ ১১ জনের

মধ্যে ৪ জনের অভিভাবকগণ মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে তাহাদের আশ্রমে থাকিবার খরচ দিয়া থাকেন; আর এক জন মহিলা নিজ খরচ মাসিক ৭৲ টাকা শিক্ষকতার দ্বারা অর্জ্জন করিয়া দেন ও আমাদের কোন বন্ধু তাঁহার জন্য বাকি ৩৲ টাকা দিয়া থাকেন। যাঁহার উপর আশ্রমের ভার সংন্যস্ত তিনি নিজের ১০৲ টাকা নিজেই দিয়া থাকেন এবং বাকি ৪ জন আশ্রমবাসিনী ও পিতৃমাতৃহীন বালিকাটীর খরচপত্র সকলের দ্বারাই নির্ব্বাহিত সেলাই বিভাগের আয় হইতে এবং ভদ্রপরিবারে শিক্ষকতা দ্বারা অর্জ্জিত কাহারও কাহারও অর্থ হইতে চালাইয়া দেওয়া হইতেছে।

এই ১১ জন আশ্রমবাসিনী ছাড়া বাহিরের দুইজন অন্তঃপুরচারিণী মহিলা মাঝে মাঝে আংশিকভাবে স্ব স্ব জীবিকা অর্জ্জন করিবার জন্য আশ্রমের সেলাইবিভাগে যোগদান করেন। আশ্রম হইতে একটী নিতান্ত দুস্থা ভদ্রস্ত্রীলোককে মাসিক দুই টাকা সাহায্য করা হয়, দুইটী দরিদ্র বালকের স্কুলের বেতনস্বরূপে মাসিক দুইটী টাকা দেওয়া হয় এবং গরীব বালিকাদিগকে জামা প্রভৃতি মাঝে মাঝে দেওয়া হয়।

বিদ্যালয়ের আয়ের কথা।

বিদ্যালয়ের আয় প্রধানতঃ এই কয়েকটী উপায়ে অর্থাগমের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।—(১) আমেরিকা হইতে অর্থসাহায্য প্রাপ্তি; (২) স্থানীয় হিতৈষীদের নিকট চাঁদা সংগ্রহ; (৩) উদ্বোধন আফিস হইতে প্রকাশিত সিষ্টার নিবেদিতার পুস্তক বিক্রয়ের আয়; (৪) সর্ব্বসাধারণের অর্থদান।

দানের প্রাপ্তিস্বীকার।

কলিকাতা 'বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়' বিদ্যালয়ের একটী পৃথক বাটী নির্ম্মাণার্থ মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার ৮০০০৲ টাকা, নগদ ১১০৷৵০ আনা, ডিবেঞ্চারের সুদ ৪২৪৵৮ পাই মধ্যে ঐ দানকার্য্য রেজেষ্টারী করিবার ও ষ্টাম্প ইত্যাদি খরচ বাবদ ৫৲৬ পাই বাদে মোট ৮৫২৯৮২ টাকা দান করায় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

বালিকাবিদ্যালয়ের ১৯১৪—১৫ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা—

১৯১৩ সালের মজুদ	৪৯৲
১৯১৪-১৫ সালে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে প্রাপ্ত	৪৯০৩।৶০
ডাক্তার এ, ব্যানার্জ্জি, শিলচর	৪৲
ই, এ C/o ভি, কে, এস, আয়ার	৪৬৲
বাবু নলিনীকান্ত ঘোষ, আটআনি বাজ ষ্টেট, মুক্তাগাছা, মৈমনসিং	৭৲
" রাধারমণ সেন, গোবর্থপুর	২৲
" যোগেশচন্দ্র রায়	।০
মিঃ পি, চৌধুরী, বার এট ল, কলিকাতা	১১০৲
বাবু কান্তিচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা	২৫৲
" শ্রীশপদ নিয়োগী এ ভি স্কুল স্যাণ্ডোওয়ে, লোয়ার বর্ম্মা	৬৫৲
" কেদারনাথ দত্ত	১৲
মিঃ পি, রায়	২৲
বাবু প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲
'উদ্বোধন' আফিস হইতে সিষ্টার নিবেদিতার পুস্তক বিক্রয় বাবদ	৬
বাবু কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত	২
মিঃ পি, সি, সেন, সাকচি	২৲
" ভাগু ওয়াস্তা, C/o মি. এম, মিত্র, বি, এন রেলওয়ে ওয়ার্কস	৩৫৲
ডাঃ এম, এল, বসু, চিযান্টি টি ষ্টেট	৫
বাবু তারাপ্রসন্ন বিশ্বাস	৫
" সুধীরচন্দ্র সরকার, কলিকাতা	১০
জনৈক মাড়োয়ারী বন্ধু, কলিকাতা	১০৲
শ্রীমতী মৃণালিনী চৌধুরাণী, ঢাকা	৫
বাবু সুরেশচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা	২
শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী বিদ্যান্ত, C/o শ্রীযুক্ত এইচ, পি, বিদ্যান্ত, আলিগড়	২০০
জনৈক বন্ধু, মাতৃমন্দিরের বাটীভাড়া বাবদ	৪২০৲
মোট	৬০২৭৶০

খরচ—

বাটীভাড়া খাতে	১১৩৪।৶১৫
গাড়ী খাতে	১২৩২।।০
চাকর ও ঝির বেতন খাতে	৪৩০।৶১০
কাগজ ও পুস্তক খাতে	৪৪৸৫
আসবাব খাতে	৭১৶১০
শিক্ষয়িত্রী খাতে	১৯৭০৸৶০
সূচীশিল্পকার্য্য খাতে	৫২৬৶০
বালি শাখা বিদ্যালয় খাতে	২৪৫
মাতৃমন্দিরের বাটীভাড়া খাতে	৩৫
	৫২১৯।৶০
নগদ মজুদ	৮০৭।।৶০
	৬০২৭৶০

(স্বাঃ) সারদানন্দ,
সেক্রেটারী ট্রাষ্ট কমিটি, বেলুড় মঠ।

জমি ক্রয় ও বাটীনির্ম্মাণ কল্পে যিনি যাহা দান করিতে চান, তাহা যতই সামান্য হউক না কেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে ও প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।

(১) প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, মঠ বেলুড়, হাওড়া (২) ম্যানেজার, উদ্বোধন আফিস, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মাইতি, বি, এল।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, জগতে প্রত্যেক জাতিরই একটা বিশেষত্ব আছে—সেই বিশেষত্বটুকু যতদিন সেই জাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে পারিবে ততদিন সেই জাতি জীবিত থাকিবে। তিনি আরও বলেন যে, হিন্দু অথবা আর্য্যজাতির বিশেষত্ব ধর্ম্মে। এই ধর্ম্মরূপ প্রাণশক্তি ভারতীয় আর্য্যজাতির জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ধর্ম্ম যতদিন অবিকৃতভাবে হিন্দুগণ রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবেন ততদিন তাহাদের জাতীয় জীবনের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না।

ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্বামিজীর কথা সত্য বলিয়াই মনে হয়। বৈদিকযুগের প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যতপ্রকার ধর্ম্মমত ভারতে হিন্দুসমাজ মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, প্রাচীন ঋষিদিগের সময় হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল মহাপুরুষ ও অবতার এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুগণের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, এত অধিক ধর্ম্মমত, এত অধিকসংখ্যক মহাপুরুষ বা অবতার অন্য কোন দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। বৈদিকধর্ম্ম—সনাতনধর্ম্ম মূলতঃ এক হইলেও কালক্রমে তাহা বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন ঋষিসম্প্রদায়ের মধ্যে এই সকল শাখাপ্রশাখা অধীত, অধ্যাপিত ও অনুষ্ঠিত হইত। এক বেদ চারিভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগ পুনরায় শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। সমগ্রবেদ কোন মহাপুরুষ সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত ছিলেন কি না তাহার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ষড়ঙ্গ চারিবেদ কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক কণ্ঠস্থ হওয়ার বিষয় শাস্ত্রে আছে সত্য, কিন্তু বেদোক্ত

সাধনপ্রণালী সমূহ অবলম্বন করিয়া বেদোক্ত সমুদয় তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন, এরূপ কোন মহাপুরুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না।

বেদে কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রধানতঃ এই দুই বিষয়ের উপদেশ পাওয়া যায়। কর্ম্ম দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভ এবং জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। কর্ম্ম ও জ্ঞানের এই বিরোধ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। গীতায় এই বিরোধ মীমাংসিত হইয়াছে। গীতা বলেন, "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥" (৪র্থ অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক) কর্ম্মের জ্ঞানপরত্ব দেখাইয়া গীতাকার এই বিরোধের মীমাংসা করিলেন।

গীতায় বহুবিধ মতবিরোধের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই মহাগ্রন্থ সর্ব্বোপনিষদের সারস্বরূপ। কিন্তু ইহাতে সকল মত সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি দার্শনিক মতসকল গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই সকল মতের বীজ গীতায় আছে সত্য, কিন্তু এই সকল মত আপাতপ্রতীয়মান বিরোধ সত্ত্বেও কিরূপে ক্রমবিকাশরূপ একটী সূত্রে নির্ব্বিরোধে অবস্থান করিতে পারে তাহা গীতায় প্রদর্শিত হয় নাই। অধিকন্তু শিব, কালী, বিষ্ণু, সূর্য্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বরীয় মূর্ত্তি ও ভাবের নিষ্কাম উপাসনাদ্বারা কিরূপে মোক্ষলাভ হয় তাহাও গীতা উপদেশ দেন নাই। যাগযজ্ঞাদি সকাম ক্রিয়ার দ্বারা দেবতাগণের উপাসনা করিলে অনিত্য স্বর্গাদি সুখমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, গীতাকার এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। গীতায় যে ভক্তির বিষয় বলা হইয়াছে তাহা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা অনাবৃতা শুদ্ধাভক্তি গীতার রাজ্যের বাহিরে—এ বিষয়ে গীতা নীরব। গীতোক্ত ভক্তি জ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ, স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নহে।

গীতার যুগের পরেই বৌদ্ধযুগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাস, অর্জ্জুন, উদ্ধবাদি ব্রহ্মজ্ঞগণ যে মত প্রচার ও

অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহা যে নিশ্চয়ই কালক্রমে অবনতি প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধাবতার ও বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের আবশ্যকতা আনয়ন করিয়াছিল তাহা ঐতিহাসিকগণ সকলেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন। বুদ্ধদেব সমসাময়িক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ দেখিতে পান নাই, তাই তিনি বেদোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান ও যাগযজ্ঞ প্রভৃতির সত্যে ও ফলদাতৃত্বে সন্দিহান হইয়া ধ্যানবলে চতুরার্য্যসত্য আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছিলেন। বুদ্ধের জীবনী পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম উপনিষদের অংশবিশেষ ব্যতীত কিছুই নহে। অবাঙ্‌মনসোগোচর ব্রহ্মসম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া বুদ্ধদেব কেবলমাত্র দুঃখ পরিহার উদ্দেশ্যে নির্ব্বাণবাদের প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের মায়াবাদও বেদান্তেই প্রথম প্রচারিত হয়। যে সকাম যাগযজ্ঞ ও দেবোপাসনার নিকৃষ্টত্ব গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে, যে ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া বেদান্তে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, সেই যাগযজ্ঞ, দেবতা ও ব্রহ্মকে বাদ দিয়া বৈরাগ্য, শান্তি, পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা, ও পরার্থপরতামূলক মত প্রচার করিয়া বুদ্ধ বেদান্তের সারোপদেশসমূহই ভারতীয় ও ভারতবহির্ভূত নরনারীর দৈনন্দিন জীবনে অভিনূত হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেরণাবলে বৌদ্ধভিক্ষুগণ কিরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়া স্বজাতীয় ও ও বিজাতীয় ব্যক্তিগণকে শান্তিপ্রাণ ও বৈরাগ্যপ্রবণ করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। ত্যাগ, শান্তি ও পরার্থপরতা যদি মানবজীবনের আদর্শ হয় তাহা হইলে বৌদ্ধভিক্ষুগণ যে তাহার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা সকলেই অবনতমস্তকে স্বীকার করিবেন।

দেশপ্রচলিত সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি আস্থা ছিল না বলিয়া বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণগণের প্রতি অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন না। বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বাংশে না হইলেও কতকাংশে উপনিষদ্‌মূলক হওয়াই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের উদারতা আকাশের ন্যায় বিস্তৃত হইলেও বুদ্ধের ন্যায়

অতি তীব্র পুরুষকারসম্পন্ন সাধকগণই ঐ ধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে সক্ষম। দুর্ব্বলতা, অপূর্ণতা, পরমুখাপেক্ষিতাই মানবমনের সাধারণ ধর্ম্ম। সামান্য মানব আশ্রয়বিহীন হইয়া কেবলমাত্র পুরুষকারসহায়ে বাসনাসমূহ ও তাহাদের কেন্দ্রস্বরূপ অহংভাবকে ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ পদবীর অধিকারী হইতে পারে না। ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা দুর্ব্বল মনে যে বলসঞ্চার হয়, চিত্তের যে প্রসন্নতা ও বিশুদ্ধিলাভ হয় তাহা বুদ্ধদেব বোধ হয় উপলব্ধি করেন নাই। অপিচ শ্রীগৌরাঙ্গ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, নানক, কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যে নিষ্কাম প্রেমের আস্বাদ লাভ করিয়া জগৎকে মাতাইয়া গিয়াছেন—সর্ব্বোপরি যে উন্নত উজ্জ্বল মধুর রস বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল, যে নিষ্কামপ্রেমের তরঙ্গরঙ্গে ব্রজগোপগোপীগণ কুলশীলমান বিসর্জ্জন দিয়া আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন, সেই নিধান ঈশ্বরপ্রেম বুদ্ধদেব আদৌ প্রচার করিলেন না। আমাদের বিশ্বাস এইটী বৌদ্ধধর্ম্মের অপূর্ণতা। বুদ্ধদেবের প্রেম জীবজগতে প্রাণিমাত্রে অপ্রতিহতপ্রভাবে প্রবাহিত কিন্তু জীবজগতের আত্মারূপী প্রেমস্বরূপ শ্রীভগবানে পৌঁছিয়া পূর্ণতালাভ করে নাই। শ্রীচৈতন্যের প্রেম ঈশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া জীবজগৎরূপ পরিধি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল; বুদ্ধদেবের প্রেম জীবজগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু প্রেমের মহাসমুদ্রে আপনাকে মিশাইতে পারে নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্ময় জগৎ হইতে স্থূলাতিস্থূল জড়জগৎ পর্য্যন্ত প্রেমবলে অধিকার করিয়াছিলেন; বুদ্ধদেবের প্রেম কেবলমাত্র স্থূল জগতে আবদ্ধ থাকিয়া কার্য্যক্ষেত্রে সামাজিক পরার্থপরতার আদর্শ স্থাপন করিয়া ক্ষান্ত ছিল। শাস্ত্র বলেন, "এতাবানস্য মহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ" "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"—জীবজগৎ ভগবানের এক অংশে নির্ম্মিত, পরন্তু ঈশ্বর জীবজগৎ হইতে অধিক। যাঁহারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন তাঁহারা জীবজগতের প্রেমকেই সম্পূর্ণ মনে করেন, কিন্তু যাঁহারা বৈদান্তিক তাঁহারা জীবজগতের নিয়ন্ত-

রূপী শ্রীভগবানকে প্রেমস্বরূপ মনে করিয়া তদাশ্রিত প্রেমকেই চরম উদ্দেশ্য বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। বৌদ্ধধর্ম্মের এই অপূর্ণতা দূর করিবার জন্যই শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব ও চৈতন্যদেবাদির আবির্ভাব।

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িতেছিল। কুমারিল আবির্ভূত হইয়া অনেকটা বৈদিকধর্ম্মের প্রভাব পুনঃস্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ কর্ম্মকাণ্ড লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়া একদিকে কুমারিলের প্রচারিত কর্ম্মবাদ, অপরদিকে দুর্ব্বল বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। কয়েকজন ক্ষত্রিয় নরপতি এই বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। শঙ্করের যুক্তিবলে এবং তাঁহার শিষ্য ও ঐ সকল নরপতির অস্ত্রবলে ভারতের চতুঃসীমা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও কুমারিল-প্রচারিত নিরীশ্বর-কর্ম্মবাদ বিতাড়িত হইল বেদোক্ত জ্ঞান ভারতে একাধিপত্য লাভ করিল। শঙ্করাচার্য্য বত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাবলে বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ প্রচার করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

শঙ্করাচার্য্য প্রধানতঃ জগতের ঈশ্বরাধিষ্ঠিতত্ব প্রমাণ করিতেই স্বকৃত ভাষ্যে সমধিক প্রয়াস পাইয়াছেন। নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত নাস্তিক মতসকল তৎকালে ভারতে অত্যন্ত চলিত ছিল বলিয়া ইহা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মবাদী ছিলেন বটে কিন্তু তিনি বৌদ্ধ মায়াবাদ অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন—নামরূপ একবারে মিথ্যা ইহা বৌদ্ধমত। শঙ্করাচার্য্য বুদ্ধদেবের ন্যায় মহা ত্যাগী পুরুষ ছিলেন, তাই তিনি এই মায়াবাদ স্বীকার করিলেন। কিন্তু এই মিথ্যা নামরূপ যাহা হইতে সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে সেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। অহংভাবাশ্রিত চিত্তবৃত্তিসকল সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করিলে নির্ব্বাণলাভ হইবে ইহাই বুদ্ধের মত। নির্ব্বাণ যে কি তাহা বুদ্ধ কখনও বর্ণনা করেন নাই; এই বিষয়ে

তাঁহার নীরবতাই পরবর্ত্তী শূন্যবাদের উৎপত্তির গৌণ কারণ। অহং-ভাবের লোপ হইলে বাকী কি থাকে তাহা যদি বুদ্ধ বলিয়া যাইতেন তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের বোধ হয় প্রয়োজন হইত না। অবশ্য যাহা বাক্য ও মনের অতীত তাহা বাক্যে প্রকাশ না করিয়া বুদ্ধদেব ঠিকই করিয়াছিলেন কিন্তু যখন তাঁহার নীরবতার গূঢ় মর্ম্ম না বুঝিযা পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ অসার অযৌক্তিক শূন্যবাদের সৃষ্টি করিল তখনই আবার ধর্ম্মজগতে বিপ্লব উপস্থিত হইল। শূন্য হইতে শূন্যের উৎপত্তিই সম্ভব—শূন্যাতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করা যায় না সুতরাং জগৎ বলিয়া কোন পদার্থই নাই, সমস্তই মিথ্যা। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শঙ্কর বলিলেন, "জগৎ যে মিথ্যা, ইহা তুমি কখন জানিলে? যখন তোমার সত্যবস্তুর জ্ঞান হইল; সত্যবস্তু না জানিতে পারিলে মিথ্যার মিথ্যাত্ব জানিবে কিরূপে? সেই সত্য বস্তুই ব্রহ্ম। যদি শূন্যকেই সত্যবস্তু বল তাহা হইলে তাহাকে শূন্য আখ্যায় অভিহিত করা অন্যায়।" এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া শঙ্করাচার্য্য শূন্যবাদ খণ্ডন করিলেন।

বৌদ্ধদিগের সহিত তর্ক করিবার সময় তিনি বেদের সাহায্য লইতে পারেন নাই, কারণ, উভয় পক্ষে তাহার প্রামাণিকতা স্বীকৃত নহে। সেইজন্য উভয় পক্ষের স্বীকৃত জগতের মিথ্যাত্ব অবলম্বনে যুক্তিতর্কের সাহায্যে তিনি সত্যবস্তুর অস্তিত্বমাত্র স্থাপন করিতে সক্ষম হইযাছিলেন। সাংখ্য ও কর্ম্মবাদিগণের সহিত বিচারে তাঁহার আরও সুবিধা হইযাছিল, কারণ, এস্থলে বেদের প্রামাণিকতা উভয়েরই স্বীকৃত সুতরাং তিনি জগতের কারণ এবং কর্ম্মের ফলদাতাস্বরূপ ঈশ্বর অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম সহজেই বেদান্তসাহায্যে প্রমাণ করিতে পারিয়াছিলেন। সাংখ্যবাদী ও কর্ম্মবাদিগণ জগতের একটা মূলকারণ অবশ্যই স্বীকার করেন—সাংখ্যমতে তাহা প্রকৃতি, কর্ম্মবাদীর মতে তাহা কর্ম্মফলরূপ অদৃষ্ট। শূন্যবাদীদিগের এইরূপ একটা কারণস্বীকারের কোন আবশ্যকতা নাই, কারণ, যাহা একেবারে অস্তিত্বহীন সেই জগতের আবার কারণ কিরূপে থাকিতে পারে? যাহা নাই তাহার

কারণ অনুসন্ধান করা অযৌক্তিক। সুতরাং শূন্যবাদীদিগকে বিচারে পরাস্ত করিতে যাইয়া স্বাধীন যুক্তিসহায়ে কেবলমাত্র সত্তাবশেষ নির্গুণ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্য্য স্থাপন করিলেন। সেই নির্গুণ ব্রহ্মই যে আবার সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, আনন্দময় ঈশ্বররূপে জগতের সৃষ্টাদির নিয়ন্তা হইতেছেন তাহা প্রমাণ করিতে স্বাধীন যুক্তি সক্ষম হয় নাই—বেদের আবশ্যকতা হইয়াছিল

এইরূপে বেদ ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া শঙ্করাচার্য্য সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদ প্রচারকরতঃ বৈদিকধর্ম্মকে ভারতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী বৈদান্তিকগণ উপাসনা ও ভক্তির আশ্রয়স্বরূপ সগুণ ব্রহ্মকে নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও অতি নিকৃষ্টাবস্থা বিবেচনা করিয়া নির্গুণব্রহ্ম প্রাপ্তির আশায় সাধনচতুষ্টয় ও 'নেতি নেতি' বিচার-পথ আশ্রয় করিলেন। বৌদ্ধগণের ন্যায় তাঁহারাও ঈশ্বরোপাসনা এবং ভগবৎপ্রেমকে অতি নিকৃষ্ট ও নিম্নাধিকারিগণের উপযোগী মনে করিয়া ভক্তিবিহীন শুষ্ক বিচার ও কঠোরতা আশ্রয় করিলেন। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তে অধিকারলাভের পূর্ব্বে কোন কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করায় কর্ম্মে ঔদাসীন্য ভাব তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়মধ্যে প্রবেশ করিল। এই ভক্তি-বিহীন জ্ঞানপক্ষপাতিত্ব ও কর্ম্মশৈথিল্য শঙ্কর-মতানুযায়ী বৈদান্তিক-গণের প্রধান দোষ। এই দোষ দূর করিবার জন্যই রামানুজের আবির্ভাব। রামানুজ বলিলেন, বেদান্তে অধিকার লাভের পূর্ব্বে কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিতেই হইবে এবং উপাসনা ব্যতীত মুক্তি নাই। এই মত প্রচার জন্য তাঁহাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে হইযাছে ব্রহ্মসূত্রের এরূপ ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা বোধ হয় আর কখনও কেহ করিতে পারেন নাই।

রামানুজ এইরূপে ভক্তি প্রচার করিয়া অদ্বৈতবাদের শুষ্কতা দূর করিলেন ; কিন্তু যে নিষ্কাম ভগবৎপ্রেমের চরম মাধুরী বৃন্দাবনলীলায় প্রকটিত, তাহা পূর্ব্বের ন্যায় জনসমাজে অপ্রকাশিত রহিল। এই প্রেমপ্রচারের জন্য মধ্ব ও চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। শঙ্কর যাহার

বিরোধী নাস্তিকভাবসকল উন্মূলিত করিয়া গিয়াছিলেন, রামানুজ যাহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, মধ্ব কর্তৃক যাহার বীজ রোপিত হইয়াছিল সেই বীজসম্ভূত মহাপ্রেম বঙ্গদেশে বিগ্রহবান্ হইয়া আবির্ভূত হইল—শ্রীগৌরাঙ্গ অনন্যভূতপূর্ব্ব উজ্জ্বল মধুর রসের বিগ্রহ ধারণ করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে উদিত হইলেন।

প্রাচীনতম বৈদিকগণ যাজ্ঞযজ্ঞ দ্বারা স্বর্গাদি লোকসকল লাভ করিয়া যে আনন্দের ছায়ামাত্র সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী জ্ঞানবাদী বৈদান্তিকগণ ব্রহ্মানন্দে যে আনন্দের কণামাত্র উপভোগ করিতেন, অর্জ্জুন, উদ্ধব প্রভৃতি গীতাকারের শিষ্যপ্রশিষ্যগণ যে নিষ্কাম প্রেমের জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত ভাব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই শ্রীমদ্ভাগবতে যে প্রেম অপরিস্ফুটভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল, বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বজীবহিতচিকীর্ষা যে প্রেমের অবান্তর ফলস্বরূপ, শঙ্কর রামানুজ মধ্ব প্রভৃতি দার্শনিকগণ যে প্রেম আস্বাদন করিতে সমর্থ হন নাই, সেই চরম প্রেম শ্রীগৌরাঙ্গে মূর্ত্তিমান হইয়া ভারতে এক অভিনব যুগের অবতারণা করিল।

কিন্তু বাল্যকাল হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গ শঙ্করাচারিত সোঽহং-ভাবের বিরোধী ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য, মুরারিগুপ্ত, প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রভৃতি অদ্বৈতবাদিগণকে স্বমত ত্যাগ করাইয়া নিজমতে অর্থাৎ দ্বৈত ভাবের উপাসনায় প্রবর্ত্তিত করিতে তিনি বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং তাহারাও তাঁহার ভক্তির প্রভাবে অভিভূত হইয়া স্বমত ত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গচরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি দ্বৈতভাবপ্রচারকগণ সকলেই শঙ্করের সোঽহংভাবের বিরোধী ছিলেন—আচার্য্যপ্রবরের মহান্ ভাব তাঁহারা কেহই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই। শ্রীচৈতন্য সময়ে সময়ে সোঽহংভাব প্রাপ্ত হইতেন সত্য, কিন্তু তিনি উহাকে ভাবাধিক্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতেন,—জীবন্ত দার্শনিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। প্রেমের পরিপক্কাবস্থায় যে অদ্বৈতভাব স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয় গোপিনীগণের ও চৈতন্যদেবের আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান তাহারই উদাহরণ। কিন্তু বৈষ্ণবা-

চার্য্যগণ এই অভেদের মধ্যেও একটা ভেদ দেখিতে পান, তাই তাঁহারা নিজ মতকে ভক্তি স্তু ভেদাভেদ বাদ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম সমুদ্রের ন্যায় গভীর হইলেও উহা কেবলমাত্র কৃষ্ণাশ্রিত; অনন্তভাবময় ঈশ্বরের শিব, কালী, দুর্গা প্রভৃতি অন্য যে সকল রূপ ও ভাব প্রকাশিত রহিয়াছে তাহা ঐ প্রেমের সীমার বাহিরে অবস্থিত। বিশেষতঃ মাতৃভাবে ভগবদুপাসনা তাঁহার ধর্ম্মে একেবারেই নাই এবং শঙ্করপ্রচারিত নির্গুণ ব্রহ্মবাদও তিনি স্বীকার করেন নাই। এইটী বৈষ্ণব ধর্ম্মের অপূর্ণতা।

বুদ্ধের পর শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত সকল মহাপুরুষই যীশুখ্রীষ্টের ও মহম্মদের পর আবির্ভূত হন, কিন্তু তাঁহারা কেহ খৃষ্টীয় বা মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতি আদৌ আস্থাবান ছিলেন না। তাহা হইলে তাঁহারা এই সকল ধর্ম্মমতকে উপেক্ষা করিতেন না। নানক মুসলমান ও হিন্দুধর্ম্ম মিশ্রিত করিয়া শিখ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন; কিন্তু তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া তত্তৎ-ধর্ম্মাবলম্বিগণকে নিজ নিজ ধর্ম্মানুযায়ী সাধনপথে অগ্রসর হইতে উপদেশ দেন নাই। তাঁহার ধর্ম্ম হিন্দু ও মুসলমানধর্ম্মের সমন্বয় সাধন না করিয়া উভয় ধর্ম্মকে সংমিশ্রিত করিয়া এক নূতন আকার ধারণ করিয়াছিল। শিখনীতি ও শিখধর্ম্ম এক বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য গঠিত হইয়াছিল বলিয়াই এই সংমিশ্রণের বোধ হয় প্রয়োজন হইয়াছিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে ধর্ম্মকে উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিলে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রীচৈতন্য ও রামানুজ যখন আবির্ভূত হন তখন ভারতে মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং এই ধর্ম্ম তাঁহাদের দ্বারা উপেক্ষিত হইবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধেও শঙ্করাদি সকল আচার্য্যগণই বিরুদ্ধভাব অবলম্বন করিয়াছেন। বিশেষতঃ শঙ্করের বৌদ্ধবিদ্বেষ লোকবিশ্রুত। এই সকল আচার্য্য-গণের এই বিদ্বেষভাব ও অন্য ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা ইঁহাদিগকে চিরকাল সাম্প্রদায়িক আচার্য্যরূপে পরিগণিত করিয়া রাখিবে।

বেদে যে সকল ভাব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল তাহা গীতাকার সংগ্রহ করিয়া একটী মালা গাঁথিয়াছেন। এই মহাগ্রন্থে নানা ভাবের সমন্বয় দৃষ্ট হইলেও কতকগুলি ভাব অস্ফুট রহিয়া গিয়াছে এবং কোন কোন ভাব একেবারে প্রকাশ হয় নাই। গীতাকার এই উদার ধর্ম্মমতের উপদেষ্টা ও মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। তিনি যে ধর্ম্মশক্তি ভারতে সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছিলেন তাহা লুপ্তপ্রায় হইলে ক্রমান্বয়ে বুদ্ধ, কুমারিল ও রামানুজ গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির প্রচার করিয়া যান। শ্রীচৈতন্য ভক্তিপ্রেমের চরমাদর্শ প্রকটিত করিয়া অন্তর্হিত হইলে তাঁহার ধর্ম্মমত বিকৃত হইয়া পড়ে এবং ভারতে মুসলমানাধিকার লোপ হইয়া ইংরাজাধিকার প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী হিন্দু ও অন্যান্য জাতির শরীর ও মনের উপর ইংরাজের পাশ্চাত্য ভাবের একাধিপত্য স্থাপিত হইল। বৈদিকযুগের সময় হইতে ভারতীয় আর্য্যগণ গৃহ, সমাজ ও রাজ্যশাসনে যে সকল নীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলেন তাহাদের সম্পূর্ণ বিরোধী নীতিসকল ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভিতর প্রবেশ লাভ করিল। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের স্থলে স্বাধীন প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তিসাম্য (free competition) প্রাচীন গুরুর পরিবর্ত্তে বেতনভোগী হ্যাট-কোট-চসমাধারী মাষ্টার মহাশয়, পঞ্চায়েতী বিচারের স্থলে আইন আদালত প্রভৃতি নানাপ্রকার নূতন নূতন পরিবর্ত্তন হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হইল। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তন ঘটিল হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসে। ঠাকুরদেবতার পূজায় অশ্রদ্ধা, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপে অবিশ্বাস, 'ইয়ং বেঙ্গলগণের' বিশেষ লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল। যাঁহারা এই সময়ে প্রাচীন মত মানিয়া চলিতেন তাঁহারাও ভিতরে ভিতরে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেন। একদিকে সকল বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা, অপরদিকে ভণ্ডামী সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস ছাড়িতে পারেন নাই তাঁহারা হিন্দুগণের পুতুলপূজা ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইয়া যাইতে লাগিলেন। এমন বিপ্লব হিন্দুধর্ম্মে পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। এমন ধর্ম্মের গ্লানি পূর্ব্বে কখনও হিন্দুসমাজে দেখা যায় নাই—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপ্লবের তুলনায়

এই বিপ্লব সহস্রগুণ অধিক। এই বিপ্লবের সময় মহাত্মা রামমোহন রায় নিরাকার একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া শিক্ষিত হিন্দুর খ্রীষ্টান হইবার ঝোঁক অনেকটা কমাইয়া দিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে সকল হিন্দুর স্থান হইল না। যে সকল নব্যশিক্ষিত হিন্দুসন্তান নিরাকার একেশ্বর উপাসনাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া এবং হিন্দুদেবদেবীর পূজার ভিতর সেই একেশ্বরবাদের বিরোধী ভাব দেখিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম আশ্রয় করিতেছিলেন তাঁহারাই ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ডিরোজিওর শিষ্য নব্যশিক্ষিত নাস্তিকগণ, এবং প্রাচীন মতাবলম্বী নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ যেমন ছিলেন তেমনই রহিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ইঁহাদের মতের বিরোধী সুতরাং ইঁহারা লক্ষ্যহীন অবস্থায় যাহা যাহার অভিরুচি তাহাই করিতে লাগিলেন।

প্রাচীন মতাবলম্বী হিন্দুগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপদগ্রস্ত হইলেন—তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা, আচার ব্যবহার সকলই নবাগত বৈদেশিক ভাবের বিরোধী—তাঁহাদের আশা ভরসা সমস্তই অতীন্দ্রিয় অপ্রত্যক্ষ রাজ্যে নিবদ্ধ। সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কোন বিষয়ই প্রত্যক্ষ ও যুক্তিসাহায্যে প্রমাণ করা যায় না, অথচ সেই সকল অতীন্দ্রিয় সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন এরূপ ব্যক্তিও তৎকালে অত্যন্ত দুর্লভ, একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে একজন সাধু মহাত্মা তৎকালে প্রকটিত ছিলেন তাঁহারাও যেন ভয়ে ভয়ে আপনাদের অন্তরে শাস্ত্রলিখিত সত্যগুলি লুক্কায়িত রাখিয়া কোন রকমে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা এতাদৃশ শক্তিশালী নহেন যে, ঐ সকল সত্য বিশ্বাসসংস্কারে অন্যের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠ করাইয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের অনুগত ও আস্তিক্যবুদ্ধিশালী অতি অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত সর্ব্বসাধারণ তাঁহাদের দ্বারা কোন উপকার লাভ করিতে পারেন নাই। এইরূপ অবস্থায় প্রাচীন মতাবলম্বিগণ নিজ নিজ মতের অনুকূলে যুক্তি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা আদর্শ না পাইয়া অন্তরে অন্তরে নিজেরাই যেন প্রাচীন বিশ্বাসগুলির উপর সন্দিহান হইয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহারা কতকটা চিরাগত দৃঢ়সংস্কার

বশতঃ প্রাচীন মতের বাহ্যিক অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু ঐ সকল মতের উপর তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। এই জন্য তাঁহারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কালধর্ম্মানুসারে যেন ভণ্ড হইয়া পড়িতেছিলেন।

কেবল যে হিন্দুসমাজের এইরূপ অবস্থা তাহা নহে। খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও বহুদিন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির অনাবির্ভাব বশতঃ নাস্তিকভাব প্রসারিত হইতেছিল। তাঁহারাও নিজ নিজ ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেকে বলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জড়বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি ও প্রাচীন পুরোহিতদিগের শক্তির লোপ এই নাস্তিকতার মূলকারণ। আমাদের বিশ্বাস এই যে, পূর্ব্বকালের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের অভাবই ইহার প্রধান কারণ, কারণ যাহাই হউক, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের এই ঘনীভূত ও সমব্যাপী নাস্তিকতার তুলনায় প্রাচীনকালের ধর্ম্মবিপ্লব সূর্য্যের ক্ষণিক-আবরণ-সম্ভূত ছায়ার ন্যায় অতি তুচ্ছ।

ইতিহাসে যে সকল প্রাচীন ধর্ম্মবিপ্লবের কাহিনী পাঠ করা যায়, তাহা দেশবিশেষে অথবা জাতিবিশেষে কিম্বা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মবিপ্লব সমগ্র জগতে সকল ধর্ম্মে, সর্ব্বসম্প্রদায়ে, সকল জাতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে অচল অটল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা পাইতেছিল। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ কেহই ইহার সর্ব্বগ্রাসী শক্তির বাহিরে থাকিয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। সকলেই ইহার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া—"Eat, drink, and be merry" অর্থাৎ "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এই নীতির অনুসরণ করিতেছিলেন। এই নাস্তিকতা জড়-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কারসমূহের দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া চিরস্থায়ী হইবার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছিল। ধর্ম্ম আর বুঝি রহিল না—বেদ বেদান্ত, কোরাণ বাইবেল বুঝি চিরকালের জন্য বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবিয়া যায়—ঈশ্বর, উপাসনা, দেবতা যাগযজ্ঞ বুঝি বা একেবারে

লোপ পায়, মন্দির, গির্জ্জা, মসজিদ, মঠ হয়ত ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সকলের হৃদয়েই এই আতঙ্কের সঞ্চার হইল। তাঁহারা অন্তরের ব্যথা অন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া শ্রীভগবানের চরণে কাতরভাবে নিবেদন করিলেন, প্রভু কোথায় তুমি, যদি থাক রক্ষা কর।

হিন্দুর পরব্রহ্ম, মুসলমানের আল্লা, বৌদ্ধের বুদ্ধ খ্রীষ্টানের পরম-পিতা আবার মায়ার অন্তরালে বিভূতি গোপন করিয়া সর্ব্বধর্ম্মময় মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন -ধর্ম্মজগতে আবার বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। তিনি সাধনা দ্বারা প্রমাণ করিলেন, "সকল ধর্ম্মই সত্য—ঈশ্বরে পৌছি-বার ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র"। বেদ, কোরাণ, বাইবেল সকল শাস্ত্রই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল।

মূর্খতাদ্বারা পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার চূর্ণ হইল, অপরোক্ষ প্রত্যক্ষকে পরাস্ত করিল, বৈরাগ্য সংসারকে জয় করিল, যোগজশক্তির নিকট জড়শক্তি মস্তক অবনত করিল—সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী জগদ্‌গুরুকে বক্ষে ধারণ করিয়া পুণ্যভূমি ভারত জগতের সমক্ষে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইল; নূতন পুরাতনের দ্বারা বজিত হইয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

সার্ব্বজনীন ধর্ম্মবিপ্লবকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্‌ সার্ব্বভৌমিক-ধর্ম্ম জগতে প্রকাশ করিলেন। প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে এই প্রকার উদার ভাববোধক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মহাপুরুষ ঐ ভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন কিনা তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—গীতার এই বাক্য সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মভাবপ্রকাশক বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার ঐ বাক্যের এইরূপ অর্থ করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের মত জনসমাজে গৃহীত হইবার পর ঐরূপ অর্থ কল্পিত হইতেছে। মহিম্নস্তবকর্ত্তা "নৃণাং গম্যস্ত্বমেকঃ পয়সামর্ণব ইব" বাক্যে যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই।

শিক্ষার প্রভাবে অন্তঃকরণ প্রসারতালাভ করিলে সকলেই ঈশ্বর এক বলিয়া স্বীকার করেন। বুদ্ধি দ্বারা সত্যের উপলব্ধি এবং সাধনা দ্বারা অপরোক্ষানুভূতি এক নহে। গুরূপদেশ বা শাস্ত্রপাঠজনিত যে এক প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে শাব্দিক জ্ঞান কহে, ইহা তত্ত্বজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

কোন কোন সাধক স্বমতে সাধন করিয়া নিজ উপাস্যদেবতার দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বদেবদেবীরূপে বন্দনা করিয়া গিয়াছেন। এরূপ সাধু মহাপুরুষ অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ শাক্তমতে সাধন করিয়া জগন্মাতা কালীর সাকার নিরাকার উভয় রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "কালী-কৃষ্ণ-শিব-রাম সকল আমার এলোকেশী"। ইহাও খুব উদার ভাব সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাকে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় বলা যায় না। ইহার নাম নিজ ইষ্ট দেবতায় সকল দেবতার দর্শন ; এইরূপ দর্শনফলে নিজ ইষ্ট দেবতার পূর্ণত্বজ্ঞান মাত্র লাভ হইয়া থাকে। কালীকে কৃষ্ণরূপে দেখা, এবং কৃষ্ণকে কৃষ্ণরূপেই দেখা স্বতন্ত্র কথা। পূর্ব্বোক্ত দর্শনে সাধকের মাতৃ-ভাবের উপাসনা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ঐ ভাবের অনুগত করিয়া কৃষ্ণাশ্রিত মধুর ভাবের উপলব্ধি হয় ; শেষোক্ত ভাবে মধুর ভাবটী প্রধান হইয়া অবিমিশ্রিতরূপে অনুভূত হয়।

শ্রীরামপ্রসাদ কখনও বৈষ্ণবমতে সাধনা করিয়া রাধাকৃষ্ণের চিন্ময়মূর্ত্তির দর্শন লাভ করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই করিয়াছেন। তিনি কালীকে কৃষ্ণরূপে এবং কৃষ্ণকে কৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, এইটুকু পার্থক্য ধারণা করিতে পারিলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের অননুভূত-পূর্ব্বত্ব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ভগবান্ এক কিন্তু তাঁহার ভাব অনন্ত, নাম অনন্ত, রূপ অর্থাৎ মূর্ত্তিও অনন্ত। এক এক ধর্ম্মসম্প্রদায় এক একটী ভাব, নাম ও রূপ লইয়া গঠিত হইয়াছে এই সকল বিভিন্ন ভাব-নাম রূপের উপলব্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাধনা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই জন্য সকল মতের সাধন-প্রণালী এক হইতে পারে না। বৈষ্ণবমতের সাধনপ্রণালী অবলম্বন

করিলে কখনও কালীভাবের উপলব্ধি হইতে পারে না। শাক্তমতে সাধনা দ্বারা কালীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ঐ কালীমূর্ত্তিকে সর্ব্ব দেবদেবীময় ভাবিতে পারিলে তবেই কালীভাবে সিদ্ধ হওয়া যায়। সেইরূপ বৈষ্ণবমতে সাধনা করিয়া কৃষ্ণদর্শনের পর ঐ কৃষ্ণকেই সকল দেবদেবীর আশ্রয় বলিয়া জ্ঞান হইলে তবেই কৃষ্ণসাধন সম্পূর্ণ হইবে। কারণ, সাধক যতক্ষণ নিজ ইষ্টদেবতাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে না পারেন ততক্ষণ তাঁহার সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু ইহাকে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় বলিতে পারা যায় না। কারণ, ইহাতে প্রত্যেক ভাবের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় না—অন্য সমুদয় ভাবগুলিকে নিজ ভাবের অধীন ও তদনুগত করিয়া লওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেক ধর্ম্মমতের সাধনা অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক মতের ঈশ্বরীয় ভাব স্বতন্ত্র ও মুখ্যরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইটী ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহার উদারভাব কেবল যে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত নানাপ্রকার বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমন্বয়সাধন করিয়াছে তাহা নহে, হিন্দুধর্ম্মের সহিত যে মহম্মদীয় ধর্ম্মের বাহ্যিক আচারব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধ দৃষ্ট হয়, সেই মুসলমানধর্ম্মকেও ভ্রাতার ন্যায় আপনার করিয়া লইয়াছে। খ্রীষ্টানভাবের সকল তত্ত্বও তিনি গভীর সমাধিতে অনুভব করিয়াছিলেন—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগপথ অবলম্বনে সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনার কাহিনী অতি আশ্চর্য্য। কৌতুহলাক্রান্ত পাঠক তাহা তাঁহার জীবনচরিতে পাঠ করিতে পারেন, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা অসম্ভব। জগতে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল প্রসিদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচলিত রহিয়াছে, সকল মতের সাধনাতেই তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ নানাপ্রকার ধর্ম্মমত মিশ্রিত করিয়া কোন নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করেন নাই। এইরূপ করিলে তিনি নানকের ন্যায় একটী সঙ্কর মতের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতেন। তাঁহার মতকে Eclecticism বলা যাইতে পারে না। স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান

মতের সহিত তাঁহার মতের এই পার্থক্য। তিনি প্রত্যেক ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন।

উপনিষদাদি শাস্ত্রে সকল ধর্ম্মভাবের বীজ দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সকল ভাব সমান পরিস্ফুট নহে। কোন কোন ভাব পুরাণেতিহাসে বিকাশ লাভ করিয়াছে। বেদে আছে—"রসো বৈ সঃ" কিন্তু ভগবান্ যে রসস্বরূপ ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে পরিস্ফুট হইয়াছে; তদপেক্ষা আবার শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলায় তাহার সম্যক্ বিকাশলাভ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অন্য কেহ ঐ ভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বসাধারণকে আস্বাদন করাইতে পারেন নাই—সেইরূপ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব শাস্ত্রে থাকিতে পারে কিন্তু এই ভাবের জীবন্ত আদর্শ ইতিহাসে কোথায়?

এইটী শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষত্ব। তিনি কোন নূতন মত প্রচার করেন নাই সত্য কিন্তু তাঁহার সর্ব্বধর্ম্মমতে সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ ইতিহাসের নূতন ঘটনা।

অজ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র একমাত্র প্রমাণ হইলেও সাধারণ মানুষ কখনও কেবল কতকগুলি বাক্যের উপর জীবনের সমস্ত আশা ভরসা স্থাপন করিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারে না। সেই জন্য বলিতে হয় যে শাস্ত্র যেরূপ সর্ব্ববিধ অতীন্দ্রিয় সত্যের প্রমাণ, মহাপুরুষগণ সেইরূপ শাস্ত্রের প্রমাণ। শাস্ত্রবাক্য ধরিয়া মহাপুরুষের মহাপুরুষত্ব নিশ্চয় হয় সত্য কিন্তু যখন শাস্ত্রবাক্যে সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয় তখন যদি কোন সত্যবাদী, নিরহঙ্কার, স্বার্থশূন্য ব্যক্তি শাস্ত্রলিখিত সত্য উপলব্ধি করতঃ তাহা সত্য বলিয়া দৃঢ়তার সহিত প্রচার করেন তাহা হইলে আমাদের সন্দেহ দূর হইয়া হৃদয়ের বিশ্বাস নূতন বল প্রাপ্ত হয়। জীবন্ত আদর্শের প্রভাব শাস্ত্রবাক্য অপেক্ষা অধিক।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশংসা করিতে যাইয়া আমরা কাহারও নিন্দা করি নাই। আমরা জানি শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, খ্রীষ্ট সকলেই ভগবানের অবতার। সেই হিসাবে সকলেই এক। কিন্তু এক হইলেও ঐতিহাসিকের

দৃষ্টিতে সকলের ভাব ও কর্ম্ম সমান নহে। শ্রীকৃষ্ণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকোলাহলের মধ্যে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাকে আদর্শ গৃহী ও আদর্শ রাজারূপে আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু বুদ্ধ, শঙ্কর, যীশু বাল্যকাল হইতেই সংসারের উপর বিরক্ত এবং সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন-পূর্ব্বক সন্ন্যাসের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ইঁহারা আদর্শ সন্ন্যাসী। এই জন্য কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও শঙ্কর সাধারণ জ্ঞানে পৃথক পৃথক আদর্শরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। যতক্ষণ নামরূপ-জনিত ভেদজ্ঞান দূর হইয়া তত্ত্বজ্ঞান না হয় ততক্ষণ সকলেই পৃথক; তত্ত্বজ্ঞান হইলেই সকলের মৌলিক একত্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে। সেইজন্য তত্ত্বদৃষ্টিতে মহাপুরুষগণ এক ভগবানের পূর্ণ বা আংশিক প্রকাশ হইলেও বাহ্যদৃষ্টিতে ভাব ও কর্ম্মের ভিন্নতার জন্য তাঁহাদিগকে পৃথক পৃথক আদর্শজ্ঞানে তাঁহাদের পরস্পরের তুলনা ও দোষগুণের বিচার অনিবার্য্য। ইহাতে তাঁহাদের উপর বিশ্বাসভক্তির কোন ত্রুটি হইলে তাহা দূষণীয় সন্দেহ নাই। দোষগুণ বিচারকালে মূলগত একত্বের দিকে দৃষ্টি রাখিলে এই দোষ পরিহার করিতে পারা যায়।

এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভক্তবীর হনুমান বলিয়াছেন, "শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদে পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমল-লোচনঃ॥" ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের মধ্যে একত্ব স্বীকার করিয়া নিজ আদর্শে স্থির থাকার নাম ইষ্টনিষ্ঠা।

স্বমহত্ব স্থাপনোদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যসাধন জন্য নিজ আদর্শকে উচ্চস্থান দিয়া অনর্থক অন্য আদর্শের নিন্দা করিলে তাহাকে গোঁড়ামী বা সম্প্রদায়িকতা বলা যায়। ইষ্টনিষ্ঠা এবং গোঁড়ামী সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। যাঁহারা এই তত্ত্ব অবগত আছেন তাঁহারা কখনও শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা বা তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিলে "গোঁড়ামী, গোঁড়ামী" বলিয়া চীৎকার করেন না।

নূতন সত্যের আলোক অতি অল্প লোকেই সহ্য করিতে পারে। যাহা সত্য বলিয়া অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি তাহাই বলিয়াছি, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ইহাতে কখনও ক্ষুণ্ণ হইবেন না।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

[যেমনটী দেখিয়াছি]

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীসমূহ।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির কৈবর্ত্তকুলোদ্ভবা ধনাঢ্যা রাণী রাসমণি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজাদি কর্ম্মে নিয়ত ব্রাহ্মণগণের অন্যতমরূপে তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন।

এই ঘটনাদ্বয় স্বামী বিবেকানন্দের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—সে প্রভাবের সম্যক্ পরিচয় সম্ভবতঃ তিনি নিজেই পান নাই। তাঁহার গুরুদেবের সকল শিষ্য যে ধর্ম্মান্দোলনের অঙ্গীভূত ছিলেন, নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্য হইতে উদ্ভূতা জনৈক রমণীই এক হিসাবে সেই সমস্ত ব্যাপারটীর মূলকারণস্বরূপ ছিলেন। মানবীয় দৃষ্টিতে দেখিলে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির না থাকিলে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে পাইতাম না, শ্রীরামকৃষ্ণ না থাকিলে স্বামী বিবেকানন্দও থাকিতেন না, এবং স্বামী বিবেকানন্দ না থাকিলে পাশ্চাত্য দেশে কোন প্রচার কার্য্যও হইত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে এক কালীবাটী নির্ম্মাণের উপরই এই সমগ্র ব্যাপারটী নির্ভর করিয়াছে। উহাও

আবার নীচবংশোদ্ভবা জনৈক ধনাঢ্যা রমণীর ভক্তির ফলস্বরূপ ছিল। স্বামিজী স্বয়ংই আমাদিগের মনে পড়াইয়া দিয়াছিলেন যে, এদেশ ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-সংরক্ষণে-বদ্ধপরিকর হিন্দু রাজগণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে শাসিত হইলে এই জিনিসটী কদাপি ঘটিতে পারিত না। ইহা হইতেই তিনি ভারতে একচ্ছত্রী রাজগণের জাতিভেদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দেওয়ার গুরুত্ব অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণি তাঁহার সময়ে একজন বীরহৃদয়া রমণী ছিলেন। কিরূপে তিনি কলিকাতার ধীবরদিগকে অন্যায্য করভার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সে কথা এখনও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার স্বামীকে সরকার যে বিপুল অর্থ দাবী করিয়াছিলেন তাহা দিতে সম্মত করাইয়া, তৎপরে নদীতে যাহাতে বিদেশীয়দিগের জাহাজ চলাচল একেবারে বন্ধ হয়, তজ্জন্য জেদ করিয়া বসিলেন। সুসমৃদ্ধ গড়ের মাঠে তাঁহার যে সকল রাস্তা ছিল, সেই সকল রাস্তা দিয়া তাঁহার পরিবারস্থ লোকেরা কেন দেব প্রতিমাদি লইয়া যাইতে পারিবেন না, ইহা লইয়া তিনি ঐরূপ আর এক তুমুল যুদ্ধ বাধাইয়া দেন। তিনি এক প্রকার বলিয়াই ছিলেন যে, যদি ইংরাজেরা ভারতবাসিগণের ধর্ম্ম পছন্দ না করেন, তাহা হইলে যে রাস্তা দিয়া মিছিল বাহির হয় তাহার আপত্তিজনক অংশগুলিতে দক্ষিণে ও বামে প্রাচীর তুলিয়া দিলেই হইল—উহাতে আর বেশী হাঙ্গামা কি আছে? আর সেইরূপ করাও হইল—উহা ফল হইল এই যে, কলিকাতার "রতন রো" নামক চমৎকার রাজপথটী মাঝখানে বন্ধ হইয়া গেল। পতিবিয়োগের কিছুদিন পরেই তাঁহাকে তাহার ব্যাঙ্কারদিগের নিকট যে বিপুল অর্থ জমিয়াছিল তাহা নিজ হস্তে উঠাইয়া লইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। তিনি উহা নিজে খাটাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কার্য্যটী কঠিন হইলেও তিনি উহা অসীম বুদ্ধি ও দক্ষতাসহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন, এবং তদবধি নিজের সমস্ত কার্য্য নিজেই পরিচালনা করিতেন। অনেক দিন পরে তাঁহার একটা বড় মোকদ্দমায় তিনি কৌন্সুলীর দ্বারা যে সকল প্রত্যুৎপন্নমতিত্বপূর্ণ

উত্তর প্রদান করিয়া প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, তাহা কলিকাতার প্রত্যেক হিন্দুপরিবারে চলিত কথার ন্যায় হইয়া গিয়াছে।

রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর নাম শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। যখন আশপাশের সকল লোক এই মহা সাধককে ধর্ম্মোন্মাদ বলিয়া স্থির করিয়াছে, তখন তিনিই ইঁহাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনিই তাঁহাকে কোনরূপ কাজ কর্ম্ম না করিয়াও বরাবর বৃত্তি ও বাসস্থান ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ে মথুরবাবু তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতেন। রাণী রাসমণি প্রথম হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্ম-বিষয়িণী প্রতিভা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং আজীবন নিষ্ঠার সহিত সেই প্রথম ধারণাই বলবতী রাখিতে পারিয়াছিলেন।

তথাপি যখন শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরের ব্রাহ্মণকুমাররূপে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন করেন, তখন তিনি এত আচারনিষ্ঠ ছিলেন যে, জনৈক নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোক উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ এবং তদুদ্দেশ্যে সম্পত্তি দান করিয়াছে—একথা তাঁহার অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল। প্রধান পুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা-দিবসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পূজাদি কার্য্যে সাহায্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি তথায় প্রসাদ গ্রহণ করিতে আদৌ সম্মত হইলেন না। শুনা যায়, সকল কার্য্য চুকিয়া যাইলে এবং সমাগত লোকজন চলিয়া গেলে তিনি সেই রাত্রে বাজার হইতে একমুঠা ছোলা ভাজা কিনিয়া সমস্ত দিন উপবাসের পর তদ্দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন।

পরে তিনি কালীবাটিতে যে পদ অধিকার করিয়াছিলেন, এই ঘটনাটী নিশ্চয়ই তাহার অর্থকে গভীরতর করিয়া দিতেছে। তিনি কদাচ ভ্রমবশতঃ কৈবর্ত্তবংশীয়া রাণীর সম্মানিত অতিথি ও প্রতিপাল্য হয়েন নাই। আমাদের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, যখন তিনি জগতে তাঁহার কার্য্য কি তাহা জানিতে পারেন, তখন তিনি দেখিলেন যে, বাল্যে পল্লীগ্রামে তিনি যে কঠোর আচার-

নিষ্ঠতায় অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা ঐ কার্য্যের পোষক না হইয়া বরং প্রতিকূল ছিল। আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, তাঁহার সমগ্র জীবন, তিনি যে সকল মানবের ধর্ম্মরাজ্যে সামাজিকপদ-নির্ব্বিশেষে সমান প্রাধান্যে বিশ্বাসী ছিলেন, এই কথাই ঘোষণা করিতেছে।

আমাদের আচার্য্যদেব অন্ততঃ, তিনি যে সঙ্ঘভুক্ত ছিলেন তৎসম্বন্ধে মনে করিতেন যে, স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতিসাধনই উহার জীবনের ব্রত। খেতড়ীর রাজাকে পাঠাইবার জন্য যখন তিনি আমেরিকায় ফনোগ্রাফ সম্মুখে কয়েকটী কথা কহেন, তখন আপনা হইতে এই বিষয়টীই তাঁহার মনে আসিয়াছিল। বিদেশে যখনই তিনি আপনাকে অন্য সময় অপেক্ষা মৃত্যুর অধিকতর নিকটবর্ত্তী জ্ঞান করিতেন এবং নিকটে কোন গুরুভ্রাতা না থাকিতেন, তখনই ঐ চিন্তা তাঁহার মনকে অধিকার করিত, এবং তিনি সমীপস্থ শিষ্যকে বলিতেন, "কখনও ভুলিও না, 'স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতি-সাধন'—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র!"

একথা সত্য যে, সমাজে যখন নানা দলের সৃষ্টি হইতে থাকে, সেই সময়েই তাহার শক্তির সমধিক বিকাশ লক্ষিত হয় এবং স্বামিজী এই কথাটী খুব চিন্তা করিতেন যে, যাহা একবার কোন নির্দ্দিষ্ট গঠন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আর জীবনসঞ্চার করিতে বা অনুপ্রাণিত করিতে পারে না। তাঁহার মতে 'নির্দ্দিষ্ট আকারপ্রাপ্ত' ও 'মৃত' ইহারা—একার্থক শব্দ। যে সমাজ চিরকালের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা যেন যাহার বৃদ্ধিকাল অতীত হইয়াছে এমন একটী বৃক্ষের ন্যায়। উহা হইতে যদি আমরা কিছু প্রত্যাশা করি, সে কেবল মিথ্যা ভাবুকতামাত্র হইবে, আর স্বামিজী ভাবুকতাকে স্বার্থপরতা বলিয়া জ্ঞান করিতেন, কারণ উহা 'ইন্দ্রিয়ের অসংযমজনিত উচ্ছ্বাস মাত্র।'

স্বামিজী জাতিভেদ ব্যবস্থাটীর সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন। তিনি কদাচিৎ উহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেন, বরং সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেন। উহাকে মানবজীবনেরই একটী অনিবার্য্য

ব্যাপার বলিয়া দেখিতে পাওয়ায়, তিনি উহাকে শুধু হিন্দুধর্ম্মেরই একটী বিশেষ ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। জনৈক ইংরাজকে ভদ্রলোকদের সম্মুখে, তিনি যে এক সময়ে মহীশূরে গোবধ করিতেন একথা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়াই স্বামিজী বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "লোকের স্বজাতয় মতামতই তাহাকে ধর্ম্মপথে রাখিবার শেষ এবং শ্রেষ্ঠ উপায়।" তারপর তিনি দুই চারি কথায় এই দুই প্রকার আদর্শের পার্থক্যের বর্ণনা করিলেন:—এক প্রকার আদর্শ শিষ্ট ও দুষ্টের মধ্যে, অথবা ধাম্মিক ও নাস্তিকের মধ্যে কি প্রভেদ তাহাই নির্দ্দেশ করে, আবার অপর এক প্রকার সূক্ষ্মতর নৈতিক আদর্শ আছে, যাহা ভাঙ্গা অপেক্ষা গড়ার দিকে অধিক মন দেয়—যাহা আমাদিগের মধ্যে আমাদের সমানপদস্থ অল্পসংখ্যক মানবের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার চেষ্টা জাগাইয়া দেয়।

কিন্তু এই প্রকারের মন্তব্যগুলি পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক নহে। সন্ন্যাসী জীবনকে শুধু সাক্ষিস্বরূপে দেখিয়া যাইবেন, উহাতে কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না। অনেক সম্প্রদায় হইতে তাঁহার নিকট এমন সব প্রস্তাব আসিয়াছিল, যাহা গ্রহণ করিলে তিনি উহাদের অন্যতমের নেতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। সে সকলকে তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শুধু শিক্ষালাভ করুক—তাহাদের ভবিষ্যৎসংক্রান্ত অন্য সকল প্রশ্নের মীমাংসা তাহারা নিজেরাই করিতে সক্ষম হইবে। তিনি স্বাধীনতা বলিতে ইহাই বুঝিতেন, এবং আজীবন এই কথাই সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ শিক্ষা কিরূপ আকারের হওয়া চাই তৎসম্বন্ধে তিনি নিজ অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে, এপর্য্যন্ত উহার অতি সামান্য অংশই স্থিরীকৃত হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও, যাহাকে তিনি অসতী বিধবার পাপাচরণ বলিয়া অভিহিত করিতেন তৎপ্রতি তাঁহার দারুণ ঘৃণা ছিল। তিনি প্রাণের ভিতর অনুভব করিতেন এবং বলিতেন, "আর যাহা হয় হউক, ঐটী যেন কদাপি না হয়!" বৈধব্যের শ্বেতবাস, তাঁহার নিকট, যাহা

কিছু পবিত্র ও সত্য, তাহারই চিহ্নস্বরূপ ছিল। সুতরাং যে কোন শিক্ষাপ্রণালী এই সকল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাহাকে তিনি স্বভাবতঃ শিক্ষা বলিয়াই গণ্য করিতেন না যাহারা চঞ্চল, বিলাসী এবং জাতীয়তানষ্ট, শত বাহ্য পরিপাট্য সত্বেও তাহারা তাঁহার মতে শিক্ষিত নহে, বরং অধঃপতিত। পক্ষান্তরে, যদি তিনি দেখিতেন যে, কোন আধুনিকভাবাপন্ন স্ত্রীলোক সেই প্রাচীন কালের ন্যায় একান্ত নির্ভর ও পরম ভক্তির সহিত স্বামীর জীবনসঙ্গিনী হইয়াছেন এবং শ্বশুর-গৃহের পরিজনদিগের প্রতি প্রাচীনকালসুলভ নিষ্ঠা বজায় রাখিয়াছেন, তাহা হইলেই তিনি, তাঁহার নিকট, "আদর্শ হিন্দু পত্নী" বলিয়া বিবেচিত হইতেন। প্রকৃত সন্ন্যাসের ন্যায় যথার্থ নারীজীবনও কেবল লোক-দেখান ব্যাপার নহে। আর য স্ত্রীশিক্ষা প্রকৃত নারীজনোচিত গুণসমূহকে প্রচার ও তাহাদের বিকাশে সহায়তা না করে, তাহা স্ত্রীশিক্ষাপদবাচ্যই নহে।

ভাবী আদর্শ রমণীর গুণাবলীর সূচনা যদি দৈবাৎ কোথাও মিলিয়া যায়, তিনি সর্ব্বদাই তাহার সন্ধানে থাকিতেন। তিনি ভাবিতেন— কতকটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হইবেই, এবং তৎসঙ্গে অধিক বয়সে বিবাহ ও হয়ত কতকটা নিজের পছন্দ মত পতিনির্ব্বাচন— এ দুইটীও আসিবেই। সম্ভবতঃ ইহাই অন্য সকল উপায় অপেক্ষা বাল্যবৈধব্য-জনিত সমস্যাসমূহের প্রকৃষ্টতর সমাধান করিবে। কিন্তু ঐ সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন বাল্যবিবাহ প্রথার উৎপত্তি হয়, তখন সমাজ উহা ইচ্ছাপূর্ব্বকই করিয়াছিলেন। বিবাহ বিলম্বে হইলে অপর যে সকল দোষের প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, ঐ উপায়ে তাঁহারা সেইগুলিকে পরিহার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ভবিষ্যতের হিন্দু রমণীকে তিনি একেবারে প্রাচীনকালের ধ্যান-শক্তিবর্জ্জিত বলিয়া চিন্তা করিতে পারিতেন না। নারীগণকে আধুনিক বিজ্ঞান শিখিতেই হইবে, কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মভাব খোয়াইয়া নহে। তিনি বেশ স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, তাহাই আদর্শশিক্ষা হইবে, যাহাতে

সমগ্র সমাজশরীরে প্রত্যক্ষভাবে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবে আদর্শ শিক্ষা এরূপ হইবে যে, কালে উহা প্রত্যেক নারীকে একাধারে ভারতের অতীতকালের সমুদয় নারীর শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশ করিতে সহায়তা করিবে।

অতীতকালের প্রত্যেক জ্বলন্ত উদাহরণটী পৃথকভাবে নিজ নিজ কার্য্য করিয়াছে। রাজপুত-ইতিহাস জাতীয় আদর্শ নারীজীবনের তেজ ও সাহসে ভরপুর রহিয়াছে। কিন্তু ঐ অত্যুষ্ণ দ্রব ধাতুকে নূতন ছাঁচে ঢালিতে হইবে। ভারতে যত নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, রাণী অহল্যা বাই তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। একজন ভারতীয় সাধুর পক্ষে দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার লোকহিতকর কীর্ত্তিগুলি দেখিয়া ঐরূপ ভাবাই স্বাভাবিক। তথাপি ভাবী নারীগণের মহত্ত্ব তাঁহার মহত্ত্বের ঠিক প্রতিরূপমাত্র হইবে না, ইহা তাহাকেও ছাড়াইয়া যাইবে। আগামী যুগের স্ত্রীগণের মধ্যে বীরোচিত দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত জননীসুলভ হৃদয়ের সমাবেশ থাকিবে। পবিত্র শান্তি ও স্বাধীনতার আধারভূতা সাবিত্রী যে বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাই আদর্শ অবস্থা। কিন্তু ভবিষ্যতে নারীগণকে ইহার সহিত মলয়মারুতের ন্যায় কোমলতা ও মাধুর্য্যেরও বিকাশ দেখাইতে হইবে।

নারীগণকে অধিকতর যোগ্যতা দেখাইতে হইবে, উহার হ্রাস হইলে চলিবে না। বিধবাশ্রম, বা বালিকাবিদ্যালয় ও কলেজের তিনি যে কোন প্ল্যান বা কল্পনা করিতেন, তাহাতে বড় বড় হরিদ্বর্ণ শষ্পাচ্ছাদিত স্থানের ব্যবস্থা থাকিত। তিনি বলিতেন—যাঁহারা তথায় বাস করিবেন, তাঁহাদের শারীরিক ব্যায়াম, উদ্যান-সংরক্ষণ এবং পশুচর্য্যা—এগুলি নিত্যকর্ত্তব্যের মধ্যে হওয়া চাই। ধর্ম্ম এবং সংসার অপেক্ষা সন্ন্যাসাশ্রম মধ্যেই যাহার সমধিক বিকাশ দেখা যায়, সেই উচ্চ লক্ষ্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ—এই নূতন ধরণের ব্যাপার-গুলির অস্থিমজ্জাস্বরূপ হইবে, ইহাদিগেরই আশ্রয়ে ঐ গুলি পুষ্ট হইয়া উঠিবে। আর এবম্বিধ বিদ্যালয়সকল শীতঋতুর অবসানে তীর্থ-

যাত্রায় বাহির হইবে এবং ছয় মাসকাল হিমালয়ে থাকিয়া পাঠাদি অভ্যাস করিবে। এইরূপে এমন এক শ্রেণীর নারী সৃষ্টি হইবে, যাহারা ধর্ম্মবাক্যে "বাশি-বাজুকদিগের"* সদৃশ হইয়া দাঁড়াইবে, এবং তাহারাই নারীগণের সমস্যার সমাধান করিবে। তাহাদের অন্য কোন গৃহ থাকিবে না; যেখানে তাহারা কাজ করিবে, তাহাই তাহাদের গৃহ হইবে; ধর্ম্মের বন্ধন ব্যতীত তাহাদের অপর কোন বন্ধন থাকিবে না, এবং গুরু, স্বদেশ ও দেশের আপামর জনসাধারণ এই তিনের প্রতি ব্যতীত অপর কোন প্রীতি থাকিবে না। তাঁহার কল্পনা কতকটা এইরূপই ছিল। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, একদল শিক্ষয়িত্রীর বিশেষ প্রয়োজন, এবং তিনি এইরূপেই উঁহা-দিগকে সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কি পুরুষ, কি স্ত্রীতে, তিনি এই একমাত্র গুণের বিকাশ দেখিতে চাহিতেন—উহা বল (Strength)। কিন্তু বল কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে তিনি কি কঠোর ভাবে বিচার করিতেন। নিজেকে জাহির করা, অথবা অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস—এ দুয়ের কোনটীর তিনি প্রশংসা করিতেন না। সেই প্রাচীনকালের মৌন, মাধুর্য্য ও নিষ্ঠার আদর্শভূত চরিত্র-সমূহে তাঁহার মন এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল যে, কেবল বাহ্য আড়ম্বর দ্বারা উহা আর আকৃষ্ট হইত না। সেই সঙ্গে আবার বর্ত্তমান যুগে ভারতে চিন্তা ও জ্ঞানের যাহা কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহাতে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগেরও সমান অধিকার আছে। সত্যে লিঙ্গবিচার চলে না। যাহাতে আত্মা ও মনের উপর শরীরের

*Bashi-Bazouks—ইহারা খালিফদিগের শরীর রক্ষক ছিল। বহুকাল যাবৎ এইরূপ প্রথা ছিল যে, যে সকল সৈনককে তুর্কী গার্ডদলে ভর্ত্তি করা হইত, তাহাদিগকে শৈশবে সকল দেশ ও জাতির মধ্য হইতে চুরি করিয়া আনিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লালনপালন করা হইত। এইরূপে তাহাদের ধর্ম্মে যারপরনাই অনুরাগ ছিল, এবং দেশের ও রাজার সেবাই পরস্পরের মধ্যে একমাত্র বন্ধনস্বরূপ ছিল। সমগ্র ইউরোপে তাহারা হিংস্রপ্রকৃতি ও সাহসী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। মিশরে নেপোলিয়ন তাহাদের ক্ষমতা চূর্ণ করেন।

বন্ধনকে আরও দৃঢ় করিয়া তুলিতে চাহে, এরূপ কোন সমাজ বা রাষ্ট্রনীতিকে তিনি আদৌ সহিতে পারিতেন না। যে রমণী যত বড় হইবেন, তিনি ততই চরিত্রমনের রমণীসুলভ দুর্ব্বলতাগুলিকে অতিক্রম করিবেন ; এবং আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক স্ত্রীলোক এইরূপ উন্নতিলাভ করিয়া প্রশংসার্হ হইবেন।

তিনি স্বভাবতঃই বিধবাগণের মধ্য হইতে প্রথম শিক্ষয়িত্রী-দল সংগৃহীত হইবে, এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। ইঁহারা পাশ্চাত্য দেশের মঠাধিকারিণীদিগের অনুরূপ হইবেন। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও তিনি কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট সঙ্কল্প করেন নাই। তিনি শুধু বলিতেন, 'জাগো! জাগো!' সঙ্কল্পসকল কালে আপনা হইতেই পরিপুষ্ট এবং কার্য্যে পরিণত হয়।"—এগুলি তাঁহারই কথা। তথাপি উপকরণ উপস্থিত হইলে—উহা যেখান হইতেই আসুক না কেন—তিনি উহাকে সাদরে গ্রহণ করিতেন। কেন প্রত্যেক স্ত্রীলোক দৃঢ় ও সবল চরিত্র এবং বুদ্ধি সহায়ে সত্যপথে থাকিয়া আপনাকে উচ্চতম আদর্শের যন্ত্রস্বরূপে পরিণত করিতে পারিবেন না—এ বিষয়ে তিনি কোনই কারণ খুঁজিয়া পাইতেন না। অসৎকর্ম্ম হেতু মনের উপর বোঝা থাকিলেও তাহা অকপটতা দ্বারা দূর করা চলিবে। নারীগণের উন্নতিবিধায়ক আন্দোলন সম্বন্ধে যিনি গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন, একপ এক আধুনিক লেখক বলিয়াছেন, "সকল উচ্চ উদ্দেশ্যের স্বাধীনভাবে অনুসরণ করা চাই।" স্বামিজীও স্বাধীনতাকে ভয় পাইতেন না, এবং ভারতীয় স্ত্রীজাতিকে সন্দেহ করিতেন না। কিন্তু তিনি যে স্বাধীনতাবিকাশের কল্পনা করিতেন, তাহা আন্দোলন, হৈচৈ বা সকল প্রাচীন অনুষ্ঠানকে যথেচ্ছভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলা—এসকলের দ্বারা সাধিত হইবার নহে। উহা পরোক্ষভাবে, নীরবে এবং ভিতর হইতে আপনা আপনি সাধিত হওয়া চাই। প্রথমে নারীগণকে সমাজের আদর্শগুলি ঘাড় পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তারপর যতই তাঁহারা অধিকতর গুণশালিনী হইতে থাকিবেন, ততই তাঁহারা জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আদেশ ও সুযোগগুলি অধিক

পরিমাণে বুঝিতে থাকিবেন। ঐ সকল নিদেশ পালন করিয়া এবং ঐ সকল সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া তাহারা ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভারতীয় ভাবাপন্ন হইবেন, এবং উন্নতির একরূপ উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবেন, যাহা প্রাচীন ভারত কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই।

বৈকালী।

(শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ)

এ শীতল, এ বৈকালী—
সাঁঝের জুড়ান ফুল দিনের নির্ম্মালি,
এ পূজা তোমার লাগিবে কি ভাল, ওগো ও মা ওগো কালী?
দশনে তোমার কেবলি আলোক,
নয়নে সর্ব্ব দহনপুলক,
লেলিহ রসনা, হে দিগ্‌বসনা, আছে চিতানল জ্বালি।

তুমি জীবনের চাহ বলিদান,
বুকের শোণিত করিবারে পান
রক্ত প্রভায়, ওগো মনোজব, সাজান বরণডালি।
যত বলি আজ পড়েছে মণ্ডপতলে
বর্ণ তাহার বিস্তারে রূপ অস্তাচলে,
যত জবাফুলে নয়নের জলে দিয়েছ চরণমূলে
রাঙা আকাশের মেঘের ফেণায় চলেছে দুলে,
তারি পরপারে শর্ব্বরী আসে তিমির ঢালি,
শিশিরে ভিজান রজনীগন্ধার বহিয়া ডালি।

আমার দিনের স্বর্ণ কারণে মন্ত্র পড়িনি তোর ?
কক্ষে বক্ষে চম্পা-অশোকে গাঁথিনি কুসুমডোর ?
বুকের তপ্ত অলক্তে রাঙা করিনি চরণদ্বয় ?
পুঞ্জে পুঞ্জে মরেনি কি জবা তব মন্দিরময় ?
চিতানলে যত আছিল চেতনা ভরিয়া নিয়েছি বুক,
যে ধূমে অশ্রুসজল আজিও আশার আগন্তুক !

দিনের তপ্ত মদিরার ধারা নিঃশেষ একেবারে,
শেষ বুদ্বুদ হয়ে গেছে লয় অতলের পারাবারে,
রক্তের শোণ গুপ্ত প্রবাহ ফল্গুর মত আজ,
কঙ্কাল তনু, প্রাণ বহে তবু একথা মানিতে লাজ,
মৃৎকনে অর্ঘ্য লবে না, মা, তোমার পুরোহিত,
তার চেয়ে ভাল, মনোমন্থিত নম্র এ নবনীত,
এই পাকাফল, নারিকেল জল, শীতলের এই থালি,
সন্ধ্যা শান্তিজলেতে জায়ান বিকালের এ শেফালি।

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ।

নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত বেদান্তাম্বুজভাস্বরম্।
নমামি যুগকর্ত্তারং আর্ত্তনাথং বীরেশ্বরম্॥

যে মহাপুরুষ জন্মদ্বারা সলিলাম্বরা, শুভ্রতুষার কিরীটিনী ভারত-ভূমিকে গৌরবান্বিতা—অদৃষ্টপূর্ব্ব নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা বিশ্বকে বিস্মিত—সমাধিপূত অপূর্ব্ব জ্ঞানালোকের ভাস্বরজ্যোতিতে ঐহিকতা, সঙ্কীর্ণতা, জড়বাদ এবং তাহার ফলস্বরূপ কামকাঞ্চনের সান্দ্রতিমির অপসারিত—তপঃসম্ভূত অমিত তেজের দীপ্ত প্রভায় ধর্ম্মজগৎ উদ্ভাসিত—উন্মার্গগামী, সদাচারভ্রষ্ট, ইহলোকসর্ব্বস্ব

ভ্রান্ত, মূঢ়, বিশ্বমানবের অশেষ কল্যাণকামনায় মহান্ যুগাদর্শকে স্বীয় জীবনে প্রকটিত করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই জগৎগুরু আচার্য্য শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর আবির্ভাব ও তিরোভাব দুইই আজ অতীতের ঘটনা। কিন্তু পরবর্ত্তী বংশধরগণের আলোচনার জন্য তিনি যে অমূল্য জীবনী রাখিয়া গিয়াছেন, যদিও তাহা আলোচনা করিতে গিয়া বহু মনীষীর প্রতিভাশালী মস্তিষ্ক ভক্তি ও বিস্ময়ে স্বীয় অযোগ্যতা স্বীকার করিয়াছে তথাপি আমাদিগকে ঐ অলোকসামান্য চরিত্র আলোচনা করিতেই হইবে, কারণ উহা ব্যতীত বর্ত্তমান জাতীয় জীবনসমস্যার মীমাংসা হইবার আর অন্য উপায় নাই।

কলিকাতা উচ্চ বিচারালয়ের তদানীন্তন অন্যতম উকীল শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দত্তের ঔরসে শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীর গর্ভে বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত ভদ্রপরিবারের অন্যান্য বালকগণের মতই তিনি লালিত পালিত হইয়াছিলেন এবং উপযুক্ত সময়ে প্রচলিত রীত্যনুযায়ী বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত General Assembly Institution এ প্রেরিত হন। তাঁহার বালসুলভ চপলতার মধ্য দিয়া প্রৌঢ়ের পরিণত মনের বহুদর্শিতা এবং অলৌকিক ঘটনাবলী ফুটিয়া না উঠিলেও, সাধারণ বালকগণ অপেক্ষা তাঁহার চরিত্রে বহু স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার যুক্তিপ্রবণ মন বিনা বিচারে কিম্বা সন্তোষজনক মীমাংসা ব্যতিরেকে দেশাচার ও লোকাচারসম্মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়মগুলি কিছুতেই মানিতে চাহিত না—সময় সময় তাঁহার জননীকে ঐ সকলের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বিব্রত হইতে হইত। স্বামিজী বাল্যকালে অতি অশান্ত ছিলেন। যখন তাঁহাকে শাসনবাক্য প্রয়োগে সংযত করা অসম্ভব হইত তখন তদীয় জননী এক অদ্ভুত উপায়ে তাঁহাকে প্রশান্ত করিতেন—"শিব" "শিব" বলিয়া তাঁহার মাথায় কিছু জল ঢালিয়া দিলেই মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় এই উদ্ধত বালক শান্ত হইয়া বসিতেন। পৌত্রকামনায় স্বামিজীর পিতামহী কাশীর ৺বীরেশ্বর সমীপে

হৃদয়ের ব্যাকুল প্রার্থনা নিবেদন করেন। তাঁহার কিছুকাল পরেই স্বামিজীর জন্ম হয়। তাই তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল বীরেশ্বর। আশুতোষ বিল্বপত্র ও সলিলধারায় অভিষিক্ত হইলেই তুষ্ট হন এই বিশ্বাসেই তাঁহার জননী যে ঐ প্রকার অদ্ভুত উপায়ে সন্তানকে শান্ত করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হয় না। এমন কি সময়ে সময়ে বালকের ঔদ্ধত্যে বিচলিত হইয়া "মহাদেব নিজে না এসে কোথেকে একটা ভূত পাঠিয়েছেন"—এবম্প্রকার মন্তব্যও প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার খেলিবার সামগ্রীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ছিল একটী শিবমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটির সম্মুখে বসিয়া থাকিতে থাকিতে বালক নরেন্দ্রনাথ সময়ে সময়ে এমন গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িতেন যে, দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাকে আসন ত্যাগ করিতে বা চঞ্চল হইতে দেখা যাইত না। বাটীস্থ জনৈক বৃদ্ধা মহিলা তাঁহার অবসরকাল রামায়ণ, মহাভারতাদি পাঠে অতিবাহিত করিতেন। বালক নরেন্দ্রনাথকে অনেক সময়ে এই বৃদ্ধার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত। পুরাণোক্ত উপাখ্যানাবলী যে এই বালকের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুদূর অতীত যুগের ধর্ম্মবীরগণের পূত চরিতাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার শিশুহৃদয়ে না জানি কি ভাবতরঙ্গ উঠিত, যাহাতে তিনি স্বভাবসুলভ চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডের পর দণ্ড মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন। ইহা ছাড়াও প্রায় প্রতিদিন পিতার বৃদ্ধ শকটচালকের নিকট বসিয়া পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতি শ্রবণ করা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে এই বৃদ্ধ একদিন বিবাহিত জীবনের অশান্তিসঙ্কুলতার এমন একটী জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করে যে, বালক নরেন্দ্র তাহাতে ঐ বয়সেই বিবাহের উপর একান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া যান। সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি ভিক্ষার্থে কদাচিৎ গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে বিশেষ শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁহাদিগকে আশাতীত ভিক্ষায় পরিতুষ্ট করিতেন। দরিদ্র, অনাথ, রোগী ইত্যাদির যন্ত্রণা ও অভাবদর্শনে তিনি বড়ই

ব্যথিত হইতেন এবং তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে না পারা পর্য্যন্ত কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না।

এইরূপে কালক্রমে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলেজে প্রবিষ্ট হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি, পদক ইত্যাদি লাভ করিবার বাসনা তাঁহার মনে কদাচ স্থান পায় নাই। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থানে তাঁহার মন এতদপেক্ষা অনেক উচ্চতর চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করিত। কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার উদার ও পবিত্র চরিত্র সহাধ্যায়িগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং এই কালে তিনি তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধুগণকে নৈতিক চরিত্রগঠন ও শারীরিক বলচর্চ্চায় প্রোৎসাহিত করিতেন এবং তদুদ্দেশ্যে সমিতি ইত্যাদিরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সতর কি আঠার বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ, পড়িতে আরম্ভ করেন। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি যদিও তিনি অধ্যবসায়সহকারে পাঠ করিতেন, তথাপি তাঁহার মন উহাতে তৃপ্ত হইতে পারিত না। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মন যে সত্যলাভের আকাঙ্খায় ব্যাকুল হইয়াছিল এপর্য্যন্ত জগতের কোন গ্রন্থই সে পিপাসাকে তৃপ্ত করিতে সক্ষম হয় নাই। পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগতের অন্তরালে এমন কোন মহান্ শক্তিমান্ পুরুষ আছেন কিনা, যাঁহার ইঙ্গিতে এই জড়সমষ্টি পরিচালিত হইতেছে? এই মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি?—এবম্বিধ অতীন্দ্রিয় রাজ্যের রহস্যপূর্ণ সমস্যাসকল পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার মানস-পটে উদিত হইয়া তাঁহাকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিত। জড়বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য মনীষিগণের আলোচিত দর্শনশাস্ত্রসমূহ যুক্তি ও বিচার সহায়ে তত্ত্বনিরূপণ করিতে গিয়া অথবা সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া তাহা অধিকতর জটিল করিয়াছিল মাত্র; স্বামিজীর জন্মলব্ধ অমানব প্রতিভা অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারিল কিন্তু তথাপি উপায়ন্তর না দেখিয়া তিনি এতৎসমূহের আলোচনাতেই নিযুক্ত রহিলেন। বিভিন্ন দার্শনিক সত্যসমূহ আলোচনায় সময় সময় তাঁহার

সহপাঠী অথবা অধ্যাপকগণের সহিত তুমুল তর্ক উপস্থিত হইত। উহা ক্রমে এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইত যেখানে যুক্তিবিচার কল্পনা আর অগ্রসর হইতে পারিত না; কাজেই সেই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করা ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকিত না।

এই সময় বাগ্মীপ্রবর বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের প্রযত্নে ব্রাহ্মধর্ম্মের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। স্বামিজীও এই সময়ে কতিপয় বন্ধুর সহিত একত্রে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং দ্বৈতভাবে সগুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা আধ্যাত্মিক পিপাসা কথঞ্চিৎ তৃপ্ত করিতে সমর্থ হইলেও চরম সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। উৎকৃষ্টতর মতবাদমাত্র অথবা প্রণালীবদ্ধ উপাসনা ইত্যাদিতে তাঁহার অপরোক্ষানুভূতিলিপ্সু মন পরিতৃপ্ত হইল না। কাজেই যখনই কোন ধর্ম্মপ্রচারক ধর্ম্ম বা ঈশ্বরসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, স্বামিজী অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন?" আধ্যাত্মিক তত্ত্বব্যাখ্যাতা ধর্ম্মপ্রচারকগণ এই অদ্ভুত প্রশ্নকর্ত্তার উদ্‌গ্রীব মুখমণ্ডলের দিকে বিস্মিতনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া হাঁ কিম্বা না এতদুভয়ের কোনটীই উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। নানাপ্রকার অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি অথবা চর্ব্বিতচর্ব্বণলব্ধ সামান্য জ্ঞানে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে প্রয়াসী হইতেন। ফলে, প্রত্যক্ষদর্শী একজনও মিলিল না, কেবল পুঁথিগত বিদ্যার আবৃত্তিকারী অথবা পরধর্ম্মছিদ্রান্বেষী জনকতক ব্যক্তির দর্শনলাভ করিলেন মাত্র। ধর্ম্মজগতের এবম্প্রকার দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া তিনি প্রায় নাস্তিকবৎ হইয়া উঠিলেন। যাহা হউক, ধর্ম্মপ্রচারকগণের তাদৃশ হঠকারিতা কিম্বা পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের প্রবল স্রোত কিছুতেই তাঁহার সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষাকে উন্মূলিত করিতে পারিল না। তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন তর্ক উপস্থিত হইলে স্বামিজী পাশ্চাত্য সংশয়-বাদী দার্শনিকগণের যুক্তিসমূহকে স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে এমনভাবে প্রকাশ করিতেন যে, প্রতিপক্ষকে নিরস্ত হইতে হইত। যদিও এইকালে তিনি নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ইত্যাদিতে যোগদান করিতেন, তথাপি তাঁহার স্বাভাবিক বৈরাগ্যপ্রবণ মন ত্যাগের ও জ্বলন্ত ধর্ম্মবুদ্ধির অভাববোধে ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীবদ্ধ উপাসনায় তৃপ্তিলাভ করিত না।

এইরূপে যতই দিন যাইতে লাগিল তাঁহার সত্য জানিবার ইচ্ছা ত তৃপ্ত হইলই না বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল মাত্র। নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে বুঝিয়াছিলেন যে তর্কবিতর্ক দ্বারা এই সমস্যা কখনই মীমাংসা হইবার নহে; বুঝিয়াছিলেন যে, অতীন্দ্রিয় সত্য প্রত্যক্ষ করিতে হইলে এমন এক ব্যক্তির চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিবার প্রয়োজন যিনি ঐ সত্য সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, এই জীবনেই সত্যকে লাভ করিতে হইবে অথবা ঐ চেষ্টায় প্রাণপাত করিতে হইবে। কিন্তু কোথায় তিনি এবম্প্রকার তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইবেন—যিনি স্বীয় জীবনের ও জগতের সমস্যা মীমাংসা করিয়াছেন—যিনি জগৎকারণ সেই ভূমাকে জানিয়াছেন—যাঁহার জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত হইয়াছে এবং যিনি অপরকেও জ্ঞানামৃতে তৃপ্ত করিতে সক্ষম?

একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণগর্ব্বে গর্ব্বিত শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য মনীষিগণের পদানুগ হইয়া সনাতন ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ - অপরদিকে ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত মোহান্ধগণ লোকাচার ও দেশাচারকেই ধর্ম্মসাধনের মুখ্য উপায় ধরিয়া লইয়া তদনুষ্ঠানপরায়ণ, একদিকে বেদাদি শাস্ত্রনিচয় তথাকথিত পণ্ডিত-গণের বিকৃতব্যাখ্যাকলুষিত—অপরদিকে পাশ্চাত্য ও দেশীয় জড়-বাদিগণের স্বকপোলকল্পিত কল্পনাসমষ্টিমাত্র, একদিকে কালবশে সার্ব্বজনীন সনাতন ধর্ম্ম নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং তত্তৎ সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ পরস্পরের আদর্শে ঘৃণা পোষণ করাকেই

স্বীয় আদর্শে নিষ্ঠার পরিচায়ক মনে করিয়া সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত—অপরদিকে সুযোগ বুঝিয়া বিদেশাগত ধর্ম্মপ্রচারকগণ স্ব স্ব মত প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত, একদিকে প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্ম্মমতসমূহকে কেবলমাত্র ঈশ্বরানুমোদিত বলিয়া ঘোষণা করতঃ অপরাপর মতসমূহকে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলিয়া প্রমাণ করিতে নিরত—অপরদিকে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসুগণ সত্য কি নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। এইরূপ সময়ে নিখিল ধর্ম্মশাস্ত্রোল্লিখিত উপলব্ধিসমূহ স্বীয় জীবনে প্রকটিত করিয়া "বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়" সর্ব্বভাবসমন্বিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হইলেন। এই অলৌকিক দেবমানব যুবক নরেন্দ্রনাথকে কি প্রকারে আচার্য্য বিবেকানন্দরূপে গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন, অতঃপর আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

যাঁহার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও অলোকসামান্য চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে তদীয় মানসদুহিতা ভগিনী নিবেদিতার পুণ্য লেখনীও সময়ে সময়ে ভাবাবেগে স্তম্ভিতপ্রায় হইয়াছে, যাঁহার পূত চরিতকাহিনী-সকল তাঁহার কৃতবিদ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যমণ্ডলী সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও সম্যক্ প্রস্ফুটিত করিতে সমর্থ হন নাই—বিগত পঞ্চবিংশ বর্ষ হইতে যে মহাপুরুষের কীর্ত্তিকাহিনী সংবাদপত্রে, প্রবন্ধে, সভা সমিতিতে, পুস্তকে বহুবার আলোচিত হইয়াও চির নূতনই রহিয়াছে—যাঁহার অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বার্ত্তাসমন্বিত অপূর্ব্ব উপদেশাবলীর অধিকাংশ পুনঃ পুনঃ বিশ্লেষিত হইয়াও আজ পর্য্যন্ত জগতের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে, সেই জগদ্বরেণ্য আচার্য্যের চরিত্র ও উপদেশাবলীর সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিতে এবম্প্রকার ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করা ব্যর্থচেষ্টা মাত্র। তবে "লোকোত্তরচরিত্র মহাপুরুষগণের পবিত্র চরিত্র আলোচনা করিলে আমাদের প্রভূত কল্যাণই সাধিত হইয়া থাকে"—এই মহাপুরুষবাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

একদিন প্রসঙ্গক্রমে নরেন্দ্রনাথ শুনিতে পাইলেন যে, কলিকাতা সহরের উপকণ্ঠে রাণী রাসমণির দেবালয়ে এক অদ্ভুতচরিত্র পুরুষ বাস করেন, যিনি ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ বালকবোধ্য ভাষায় গল্পে, উপমায় সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। কেবল তাহাই নহে, এই ব্যক্তির দেবচরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া বহু ধর্ম্মপিপাসুর আধ্যাত্মিক তৃষা তৃপ্ত হইয়াছে। তখন তাঁহার আজন্ম সত্যানুসন্ধিৎসু মন এই দেবমানবের সন্দর্শনলাভে কৃতার্থ হইবার আশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একদিন সত্যসত্যই প্রাণের ব্যাকুলতায় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সামান্য ব্যক্তির মত ক্ষুদ্র একখানি বস্ত্র কটিদেশে জড়াইয়া এক সদানন্দময় পুরুষ উপস্থিত জনগণকে লক্ষ্য করিয়া অমৃত-মধুর উপদেশ প্রদান করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ ইহা দর্শন করিয়া যে প্রশ্ন তিনি বহু বার বহু ধর্ম্মাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই যে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে সক্ষম হন নাই, সেই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া এবং তাঁহার বিস্ময়কে শতগুণ বর্দ্ধিত করতঃ সস্মিতবদনে মহাপুরুষ উত্তর করিলেন, "হাঁ দেখিয়াছি; তোমায় যেমন চোখের সামনে দেখ্‌তে পাচ্ছি এর চেয়েও স্পষ্টতর ভাবে দেখিয়াছি।" নরেন্দ্রনাথকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়াই পুনরায় তিনি বালকের মত সরলভাবে বলিলেন, "আমি তোমাকেও দেখাইতে পারি যদি তুমি আমি যা বলি সেই রকম আচরণ কর।" নরেন্দ্রনাথ কি উত্তর করিবেন, কি জিজ্ঞাসা করিবেন খুঁজিয়া পাইলেন না, বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন মাত্র। অতঃপর তাঁহাকে ঠাকুর একান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে নরেন্! তুই এতদিন কোথায় ছিলি? তুই আস্‌বি বলে আমি অনেক দিন অপেক্ষা কচ্ছি, বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার মুখ পুড়ে গেছে, আজ একজন যথার্থ কামিনী-কাঞ্চনত্যাগীর দেখা পেলুম।" ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের সহিত চিরপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন;

তিনি কিন্তু ঠাকুরের এই ভাব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে উন্মাদ্ বলিয়া স্থির করিলেন। যাহা হউক, নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত ধারণা লইয়াই বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু ইহার পর হইতেই তিনি যেন কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেন, যাহা তাঁহাকে মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে এই পাগল পূজারীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইতে বাধ্য করিত। ঠাকুর পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই যুবককে কালে জগতের শত শত ধর্ম্মপিপাসু নরনারীকে পরিতৃপ্ত করিতে হইবে। নিজ জীবনে প্রকটিত 'যত মত তত পথ'রূপ সার্ব্বভৌমিক মৌলিক আদর্শপ্রচারকার্য্যে নরেন্দ্রনাথই সর্বাধিক উপযুক্ত অধিকারী, ইহা বুঝিয়া তিনি অতঃপর এই আজন্মত্যাগী বিবেকবৈরাগ্যপ্রবণ যুবককে বেদান্তোক্ত সাধনমার্গেই পরিচালিত করিতে প্রয়াসী হইলেন। নরেন্দ্রনাথ যে আধিকারিক পুরুষ এবং জগদম্বার বিশেষ কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহা নরেন্দ্রনাথ নিজে বিশ্বাস করিতেন না। একদা কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলেন, "কেশবের মধ্যে একটা শক্তি আছে ; নরেন্দ্রের মধ্যে অমন আঠারটা শক্তি রয়েছে।" ইহা শুনিয়া সাধারণ মানব স্বয়ং অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষ হইত, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "বলেন কি মহাশয়। কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন, আর কোথায় একটা স্কুলের ছোঁড়া নরেন্দ্র, লোকে শুনে আপনাকে পাগল বল্‌বে।" ঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "না কি কর্‌বো বল্, মা দেখিয়ে দিলেন, তাই বল্‌ছি।"

নরেন্দ্রনাথ চিরকাল যুক্তিবাদী, সন্তোষজনক যুক্তি ব্যতীত কিছুই মানিতে চাহিতেন না, অপরকেও মানিতে বলিতেন না—সর্ব্বোপরি, প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম্ম, তিনি এই বাক্যের জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন। ঠাকুর ভাবাবস্থায় লোকের অন্তর বাহির সমস্তই দেখিতে পাইতেন—বহুবার শুনিয়াও তিনি একথা বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু পরে বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি ইহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের স্বাধীন চিন্তার পরিপোষক মতসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা নিবন্ধন তিনি অনেক সময়ে ঠাকুরের জগন্মাতার সহিত বাক্যালাপ, ঈশ্বরীয় রূপদর্শন প্রভৃতিকে মস্তিষ্কের ভুল বলিয়া উল্লেখ করিতেন, এবং নিরাকারবাদী নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বর যে সাকারভাবে ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন, এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। একদিন ঠাকুর কামারহাটীর ব্রাহ্মণী গোপালভাবে সিদ্ধা গোপালের মার সহিত স্বামিজীর পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং স্বামিজীকে গোপালের মার সাধক-জীবনের অপূর্ব্ব ইতিহাস শুনিবার জন্য আদেশ করিলেন। ঠাকুরের সম্মতি পাইয়া গোপালের মা সাশ্রুনয়নে ভক্তিপ্লুতকণ্ঠে তাঁহার অদ্ভুত দর্শনের কথাসকল বলিতে আরম্ভ করিলেন। সেই প্রথম দিন ঠাকুরের দেহ হইতে গোপালরূপী অপূর্ব্ব বালকের নির্গমন, তাহার সহিত গমন এবং একাদিক্রমে ছয় মাস তাঁহার সহিত লীলাভিনয়, আহারের জন্য আবদার—এই সকল শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্রনাথের সমস্ত যুক্তিতর্ক ভাসিয়া গেল। কঠোর নিরাকারবাদী নরেন্দ্রনাথ এই লীলাভিনয় শুনিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গোপালের মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! আমি ত লেখাপড়া জানি না, তোমরা সব জ্ঞানী, আমার এসব কি সত্য?" নরেন্দ্রনাথের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, তাঁহার মন তখন বাক্যমনাতীত ভূমাপুরুষের অপূর্ব্বলীলায় ডুবিয়া গিয়াছিল। এমনি করিয়া কত দিনের কত প্রমাণপ্রয়োগে এবং অবশেষে প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করিয়া নরেন্দ্রনাথ সাকার ভাবের সাধনায় বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। একদিকে অসীম গুরুভক্তি এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের অহেতুক প্রেমে কৃতার্থ ও তৃপ্ত, অপরদিকে প্রবল জ্ঞানপিপাসা—একাধারে এই জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় আমরা নরেন্দ্রনাথের সাধকজীবনে দেখিতে পাই।

ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথ বি, এ পাশ করিয়া আইন পড়িতেছেন।

এই সময়ে আবার পিতৃবিয়োগনিবন্ধন সাংসারিক নানা প্রকার অভাব অসুবিধা তাঁহাকে যারপর নাই বিব্রত এবং ব্যথিত করিয়া তুলিল। নরেন্দ্রনাথ এই সাংসারিক বিপদ ও ঝঞ্ঝাটে এই সময় দক্ষিণেশ্বরে আসিতে পারেন নাই। ঠাকুর তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন—ভক্তের বেদনা ঠাকুর যেন নিজের বুকে অনুভব করিলেন। সাংসারিক অভাবপূরণের জন্য নরেন্দ্রনাথকে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইতেছে, কিন্তু কোনই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। নরেন্দ্র দুঃখকাহিনীসমূহ ঠাকুরের নিকট নিবেদনকরতঃ যাহাতে একটা উপায় হইতে পারে তজ্জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন। নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে শ্রীমন্দিরে যাইয়া জগন্মাতার নিকট তজ্জন্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, "তুই যা চাইবি মায়ের ইচ্ছায় তাহাই পাইবি।" নরেন্দ্রনাথ শ্রীগুরুর আদেশে শ্রীমন্দিরে উপনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহার আজন্ম বৈরাগ্যপ্রবণ মন, সময়ে সময়ে জাগতিক দুঃখে দৈন্যে বিচলিত হইলেও, পার্থিব সুখসাচ্ছন্দ্যের কামনা কখনও তাহাতে স্থান পায় নাই।

নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন মায়ের ভুবনমোহনরূপে শ্রীমন্দির আলোকিত। প্রস্তরমূর্ত্তি নয়—জীবন্ত প্রতিমা বরাভয়কর বিস্তার করিয়া অসীম অনুকম্পাভরে স্নেহকরুণ হাস্য করিতেছেন। মায়ের কোমলকঠোর বিরুদ্ধভাবদ্বয়সমন্বিত অপূর্ব্ব রূপমাধুরীতে তাঁহার প্রাণমন তৃপ্ত হইল। নরেন্দ্রনাথ দুঃখ দারিদ্র্যের কথা ভুলিয়া বিবেক বৈরাগ্য, জ্ঞান ভক্তি প্রার্থনা করিয়া বসিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন "কি চাইলি?" নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহাই বলিলেন। এমন কত দিনের কত ঘটনা, কোনটা ছাড়িয়া কোনটার উল্লেখ করিব! লোকলোচনের অন্তরালে কি অদৃশ্য কৌশলে যে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে গড়িতেছিলেন, তাহা বর্ণনা

করার শক্তি লেখকের নাই। অদ্ভুত ত্যাগীকুলচূড়ামণি সাধক—ততোধিক অদ্ভুত তাঁহার আচার্য্যদেব!

তখন শ্রীশ্রীঠাকুর পীড়িত,—কাশীপুরে একটী বাগানবাড়ীতে চিকিৎসার জন্য আনীত হইয়াছেন। ত্যাগী বালক ভক্তগণ সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া সেবানিরত। নিজ শক্তি শিষ্যবৃন্দের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া তিনি যে লীলা সাঙ্গ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সময় একদিন আইন পরীক্ষার নির্দ্ধারিত ফির টাকা জমা দিতে গিয়া নরেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ভাবান্তর হইল—অনিত্যের জন্য অযথা আগ্রহ ও শক্তিক্ষয় করিতেছেন বলিয়া হৃদয়ে অসীম বেদনা পাইলেন। অদ্ভুত তীব্র বৈরাগ্যের তাড়নায় উন্মত্তবৎ নরেন্দ্রনাথ একবস্ত্রে নগ্নপদে ছুটিয়া কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। সেই দিন হইতে ঠাকুরের অনন্ত করুণা নিঃশেষে অনুভব করিয়া সাধনভজন ও প্রভুর সেবা ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম্মই পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশে নরেন্দ্রনাথ প্রায়ই রজনীযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া সাধনভজন করিতেন। সে প্রবল উৎসাহ, কঠোর ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দৈহিক ভোগবিলাস বর্জ্জন করিয়া অনন্যমানসে সত্য-স্বরূপকে লাভ করিবার অপূর্ব্ব চেষ্টা বর্ণনাতীত। একদিন স্বামিজীকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। পরম্পর জানিতে পারা গেল, তিনি তপস্যা করিবার জন্য গৈরিক বস্ত্র ধারণকরতঃ বুদ্ধগয়ায় গমন করিয়াছেন। তথায় কিছুদিন কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করিয়া পুনরায় কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। ঐ যাত্রায় স্বামিজী যেন বুঝিতে পারিলেন, যে অতৃপ্ত পিপাসায় কাতর হইয়া তিনি উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছেন এই দেবমানবের অহেতুক কৃপা ব্যতীত সে পিপাসা তৃপ্ত হইতে পারে না। এইবার নরেন্দ্রনাথ শ্রীগুরুচরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন; সত্য-লাভের জন্য ব্যাকুল আগ্রহ তাঁহাকে পরিবারবর্গের অশেষ কষ্ট-সত্ত্বেও তাহাদের প্রতি উদাসীন করিয়া রাখিল। আহারনিদ্রাদি

জৈবিক ধর্ম্মবিহীন হইয়া তিনি ধ্যান, জপ ভজন ও ঈশ্বরচর্চ্চা এবং প্রভুর সেবায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন এবং অদ্ভুত দৃঢ়-নিষ্ঠার সহিত শ্রীগুরু-প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে সাধনপথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষচরিত সমূহ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা দেশ কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া মুক্তির নব নব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন; কামকাঞ্চনের প্রবল আকর্ষণে অবিচলিত থাকিয়া তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন; তাঁহাদের জপ তপ, সাধন ভজন যা কিছু সবই পরহিতায়, নিজের মুক্তি কিংবা অপর কিছুর কামনায় নহে, এবং তাঁহারা ইচ্ছামাত্রে বা স্পর্শাদি সহায়ে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন পশুতুল্য মানবহৃদয়কেও দেবভাবে পরিপূরিত করিয়া ধর্ম্মশক্তি সঞ্চার করিতে সক্ষম ছিলেন। স্বামিজীর জীবনে যে এইগুলি পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছিল, অতঃপর আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

এক দিন কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডের সম্মুখে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ধ্যানমগ্ন। এমন সময় অনুভব করিলেন যে, স্পর্শমাত্রে অপরের মনোরাজ্যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া ধর্ম্মভাববিশেষ সঞ্চার করিবার শক্তি তাঁহার প্রবুদ্ধ হইয়াছে। বালসুলভ চপলতা-বশতঃ তিনি পার্শ্বে দণ্ডায়মান জনৈক গুরুভাইয়ের উপর উহা পরীক্ষা করিতে গিয়া, তাহার ধর্ম্মজীবনে আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐ বিষয়ে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করতঃ শাসনবাক্য প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, "না জমতেই খরচ? আর ওর কি অনিষ্টটা কল্লি বল দিকি?" তৎপর তিনি সহসা কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই, এই কথা তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

এই কালে স্বামিজী যে অসাধারণ অধ্যবসায়, গভীর শ্রদ্ধা ও প্রবল সত্যানুরাগসম্পন্ন হইয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহা উপস্থিত অন্যান্য ভক্তমণ্ডলীকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বদাই অন্যান্য ভক্তগণের নিকট তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। সাধনপথে বহুদূর অগ্রসর নরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ ব্যতীত কিছুতেই তাঁহার আধ্যাত্মিক পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবে না; অথচ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও ঐ বিষয়ে সফলকাম হইতে পারিতেছিলেন না।

নীরব গভীর রাত্রি। কাশীপুরের উদ্যানবাটীকার দ্বিতল কক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর রোগশয্যায় শায়িত। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রনাথ। কক্ষে অপর কেহ নাই। আজ নরেন্দ্রনাথ সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছেন, যে কোন উপায়েই হউক নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিবেন। কারণ, তিনি জানিতেন যে ঠাকুরের কৃপায় সকলই সম্ভব হইতে পারে। সামান্যমাত্র কামনা থাকিলে নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে পারে না, তাই ভগবান আজ ভাবী জগদ্‌গুরুর অসীম ত্যাগশক্তি পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন। নরেন্দ্রনাথের দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া ঠাকুর কহিলেন, "নরেন, তুই কি চাস্?" সুযোগ বুঝিয়া নরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "সর্ব্বদা সমাধিস্থ হইয়া থাকিতে চাই।" ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "ও ত ছোট কথা, তোকে কালে সমগ্র জগতে ধর্ম্মদান কর্ত্তে হবে।" ঐ কথা স্বামিজীর মনঃপূত হইল না, তিনি পুনঃ পুনঃ ব্যাকুলভাবে সমাধি-লাভের আশায় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর সে সমস্ত কথার কোন উত্তর না দিয়া পুনরায় বলিলেন, "সাধন কর্‌বার সময় আমার অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ হয়েছিল, তা কোন দিন কোন কাজে লাগেনি, তুই নিবি? কালে তোর অনেক কাজে লাগিবে।" স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, ও:ত ভগবানলাভের কোন সুবিধা হবে কি?" ঠাকুর উত্তরে কহিলেন, "না তা হবে না বটে; কিন্তু ঐহিকের কোন বাসনাই অপূর্ণ থাক্‌বে না।" কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া ত্যাগিশ্রেষ্ঠ নরদেব উত্তর করিলেন, "তবে মশায়, ওতে আমার দরকার নাই।" পরীক্ষা শেষ হইল—নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক ত্যাগশক্তি দর্শনে আনন্দে ঠাকুর বিজয়ী বীরকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমার নির্বিকল্প সমাধি লাভ হউক।" ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ আপেক্ষিক সত্যসমূহ তাঁহার

সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইল, দেশকালনিমিত্তের পরপারে অবস্থিত নিজ বোধস্বরূপ আত্মা স্ব মহিমায় বিরাজ করিতে লাগিলেন; নামরূপের গণ্ডী ভেদ করিয়া নরেন্দ্রনাথ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আত্মহারা হইলেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া স্বামিজী নিশ্চল পাষাণবৎ হইয়া ঐ অবস্থায় যাপন করিলেন, তার পর তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি অনুভব করিলেন, তাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে কামনাশূন্য হইলেও একটা অদৃশ্য অলৌকিক শক্তি তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগতে নামাইয়া লইয়া আসিতেছে। অনুভব করিলেন, বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ সত্য প্রচার করিব।" এই মহতী কামনার সূত্র ধরিয়া তাঁহার মন নির্ব্বিকল্প অবস্থা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। অনুভব করিলেন, জগতের দুঃখদৈন্যপ্রপীড়িত মোহভ্রান্ত জীবকুলকে স্বয়ং জ্ঞানামৃতে পরিতৃপ্ত হইয়া উক্ত অমৃত পান করিবার জন্য আহ্বান করিতে এবং ভারতের অতীত যুগের ঋষিকুলের ন্যায় তাঁহাকেও জলদমন্দ্রে গাহিতে হইবে—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণম্ তমসঃ পরস্তাৎ, তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

এদিকে ঠাকুরের গলরোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভক্তগণ বুঝিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর শীঘ্রই লীলা সাঙ্গ করিবেন। ঠাকুর প্রায় প্রত্যহ নরেন্দ্রনাথের সহিত ২।৩ ঘণ্টা কাল রাত্রিতে একাকী যাপন করিতেন। কেন করিতেন, তাহা অদ্যাপি সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই, তবে আমরা শ্রুত আছি, এই সময়ে ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণসঙ্ঘ পরিচালন বিষয়ে শ্রীগুরু নরেন্দ্রনাথকে নানাপ্রকার উপদেশাদি প্রদান করিতেন।

এই কালে অন্যান্য বালক ভক্তগণকে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ও যে দিন চিন্‌তে পারবে যে আমি কে, সে দিন আর ওর দেহ থাক্‌বে না; এখন সে কথা চাবি দেওয়া রইল, ওর শরীর-মন সহায়ে জগদম্বা অনেক কাজ করিয়ে নেবেন।" নরেন্দ্রনাথ সপ্তর্ষি মণ্ডলের এক ঋষি, জীবোদ্ধারের জন্য সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া

আসিয়াছিলেন, ইহাও ঠাকুর ভক্তবৃন্দকে বলিয়াছিলেন। কখনও "শুকদেব", কখনও "শঙ্কর", কখনও বা "নারদ" বলিযাও অভিহিত করিতেন। এ সম্বন্ধে পূজনীয় শ্রীযুক্ত যোগানন্দ স্বামিজী একদা বলিয়াছিলেন, "স্বামিজীর মধ্যে ঋষির সমাধি-তৃষ্ণা, শুকের মায়া-রাহিত্য, শঙ্করের জ্ঞান ও নারদের ভক্তি একত্র মিলিত হইয়াছিল; তাই ঠাকুর তাঁহার বিভিন্ন ভাব লক্ষ্য করিয়া এক একবার এক এক নামে অভিহিত করিতেন এবং বলিতেন, 'এত বড় আধার আর আসে নাই।'

একদিন কাশীপুর বাগানের খরচপত্রাদির হিসাব লইয়া ত্যাগী বালক ভক্তগণের সহিত গৃহী ভক্তগণের মনোমালিন্যও উপস্থিত হয়। নিরন্তর সেবানিরত ভক্তগণ ঐ ঘটনায় গৃহী ভক্তগণের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সব নিবেদন করিয়া অভিমানভরে বলিয়াছিলেন, "কারও সাহায্য নেবার দরকার নেই, আমরা ভিক্ষা করে তোমার চিকিৎসা চালাব।" ঠাকুর সজলনয়নে স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন, "ওরে আমি কি ধনদৌলত চাই? তোরাই আমার সব, তুই আমাকে কাঁধে করে যেখানে নিয়ে যাবি সেইখানেই যাব।" ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইলেন যে, যেখানে ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য সেইখানেই থাকিতে তিনি ভালবাসেন! লীলাময় ঠাকুরের পূত জীবনী আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার সর্ব্ববিধ আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমূহের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী নরদেব শ্রীবিবেকানন্দের অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্যকলাপ ও উপদেশাবলী আলোচনা করিলেই ঠাকুরের লীলার কিয়দংশ হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারিবে।

যে শক্তি যুগে যুগে ধর্ম্মস্থাপনের জন্য করুণায় অবতীর্ণ হন, শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাহার সমষ্টিস্বরূপ ছিলেন, তাহার শুনিয়াও এবং বুঝিয়াও স্বামিজী তাহাতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। দেহত্যাগের দুই দিন পূর্ব্বে ঠাকুর রোগশয্যায় নিদ্রিত, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রনাথ; এমন সময়ে তাঁহার মনে হইল, এই সময়ে ঠাকুর যদি নিজে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেন, তবেই বিশ্বাস করিব,

নচেৎ নহে। অন্তর্যামী ঠাকুর চক্ষু মেলিয়া নরেন্দ্রের দিকে চাহিলেন; দৃঢ় অথচ করুণাপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "নরেন এখনও তোর বিশ্বাস হইল না! যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ, কিন্তু তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়!" এইবার স্বামিজীর সকল সন্দেহ দূর হইল। তাই তিনি উত্তরকালে জলদমন্দ্রে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধনং বেদোদধিং মথিত্বা
দত্তং যস্য প্রকরণে হরিহরব্রহ্মাদিদেবৈর্ব্বলম্।
পূর্ণং যত্তু প্রাণসারৈর্ভৌমনারায়ণানাম্,
রামকৃষ্ণস্তনুং ধত্তে তৎপূর্ণপাত্রমিদং ভোঃ॥

—পত্রাবলী, ২য় ভাগ।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

গ্রীক-দর্শন] [এরিষ্টটল।

শ্রীকানাইলাল পাল, এম, এ, বি, এল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(Logic—ন্যায় শাস্ত্র।)

দর্শন বলিতে কি বুঝায়, সে কথা এস্থলে একবার স্মরণ করা দরকার। প্রাচীন আর্য্যঋষিরা সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া সকল জিনিষের মূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রশ্নও তাই ক্ষুদ্র ছিল না। তাঁহারা এমন এক বস্তু জানিতে চাহিয়াছিলেন, যাহাকে জানিলে যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান জন্মে। প্রাচীন কালে সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা যে তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সে তত্ত্ব পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের নিকট সম্যক্ প্রতিভাত হইয়াছিল কি না নিঃসন্দেহে বলা যায় না; তবে একেবারেই যে সে তত্ত্ব তাহাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল, একথা মনে না করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। জ্ঞানবিশেষ

অপেক্ষা জ্ঞানসামান্যের যে মর্য্যাদা অধিক সে কথা সক্রেটীস প্রথম প্রচার করেন ; প্লেটো সেইটীকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ হইতে জাতি, জাতি হইতে পরতর জাতি, পরতর হইতে পরতম জাতিতে উপনীত হওয়ার প্রণালী অবলম্বনে মূলতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। কেনন', মূলতত্ত্ব তাঁর মতে জ্ঞানস্বরূপ—কল্যাণস্বরূপ। দার্শনিক পাঠকবর্গ অবশ্য বুঝিতে পারিবেন, ইহার উপর আর কোন গূঢ়তর তত্ত্বের পরিচয় দর্শন শাস্ত্রে মিলিবে না। কেহ কেহ হয় ত প্রশ্ন করিবেন, তিনি সচ্চিদানন্দ — কই প্লেটো ত আনন্দস্বরূপের বিশেষ কোন পরিচয় দেন না, তবে কি বুঝিব সেটী তাহার অনুভূতিগম্য হয় নাই ? প্রথমদৃষ্টিতে আমাদেরও তাহাই মনে হইয়াছিল কিন্তু বাস্তবিকই কি তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ? একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে, ওরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না—কারণ, সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি আনন্দস্বরূপ প্লেটোর উপলব্ধির বিষয় না হইলে তিনি কখনও সৌন্দর্য্যস্বরূপকে মূলপদার্থের সহিত একপ্রকার অভিন্ন মনে করিতেন না। অপর পক্ষে কল্যাণস্বরূপ বিচারকালে সুখদুঃখাতীত আনন্দস্বরূপের পরিচয় পাইয়াছি। সুতরাং প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যে প্লেটোর স্থান নির্দ্দেশ করিতে আমাদের স্বভাবতঃই প্রবৃত্তি হয়। পরন্তু ভিন্ন দেশে ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন চিন্তাপ্রণালী অবলম্বনে তিনি মূল সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়াই আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি না, যে তত্ত্ব আর্য্যঋষিরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সে তত্ত্ব প্লেটো বা অপর কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

সুতরাং বুঝা গেল, দর্শনের উদ্দেশ্য মূলতত্ত্ব নির্ণয়। বিশেষ পদার্থ বিজ্ঞান বা দর্শনের বিষয় নয়। ইহা প্লেটো বুঝিয়াছিলেন এবং প্লেটো-শিষ্য (কোন কোন ঐতিহাসিক এই বাক্যে দোষ দেখিলেও আমরা তবু বলিব) এরিষ্টটলও তাহাই বুঝিয়াছিলেন—Science could be only of generals.

কোন কোন পাঠক হয়ত মনে করিবেন, এরিষ্টটলের দর্শন আলোচনায় এসকল অবান্তর কথার প্রয়োজন কি? প্রাচীন ঋষিরা কি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন—প্লেটোই বা কি বুঝিয়াছিলেন সে সকল কথার অবতারণার কি প্রয়োজন? প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে, একটু প্রণিধান করিলেই বোধগম্য হইবে।

পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রের সহিত যাঁহাদের সামান্যমাত্র পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন, এরিষ্টটলই ন্যায়ের স্থাপনকর্ত্তা। ন্যায় শাস্ত্রের কার্য্য কি?—প্রতিপাদন করা। কি প্রতিপাদন করা? —সত্যাসত্য নির্ণয় করা। এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইলে একটী প্রণালী-বিশেষ অবলম্বন করিতে হয়—তাহাকে ইংরাজি ভাষায় Syllogism বা নিগমনমূলক যুক্তির প্রয়োগপ্রণালী বলে। এই প্রণালী কিরূপ, একটী উদাহরণ সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করা যাউক।

Major premise (সাধ্যাবয়ব)—মানুষমাত্রেই চেতন।

Minor premise (পক্ষাবয়ব)—রাম একটী মানুষ।

Conclusion (নিগমাবয়ব)—সুতরাং রাম চেতন।

ইহাই হইল এ প্রণালী। এখানে প্রশ্ন উঠিবে, ইহা ত অবরোহণ প্রণালী—ইহার দ্বারা মূল সিদ্ধান্তে পৌঁছিব কিরূপে? কথাটী ঠিক। নিগমনমূলক যুক্তির বলে ব্যাপক পদার্থ হইতে তদন্তর্গত ক্ষুদ্র বা বিশেষ পদার্থে উপনীত হওয়াই সম্ভব। পরন্তু বিশেষ হইতে জাতি বা পরজাতি হইতে পরতর জাতি ক্রমে আরোহণ প্রণালী অবলম্বনে মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিগমনমূলক যুক্তির কার্য্য নয়। তবে এরিষ্টটলের বিশেষত্ব কোথায়?

উপরে যে উদাহরণটী দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যাই-তেছে, যেটী সিদ্ধান্ত হইল সেটী সাধ্যাবয়বের উপর একান্ত নির্ভর করে। সেটী যদি ভ্রমশূন্য না হয় তবে সিদ্ধান্তে ভ্রম থাকিবেই থাকিবে। তাবৎ সিদ্ধান্তের পক্ষে এই নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। মনুষ্য মাত্রেই চেতন—ইহাকে আবার প্রতিপাদনের বিষয় করা যাইতে পারে কিন্তু সেটী করিতে হইলেই মনুষ্যকে তদপেক্ষা এমন একটী ব্যাপকতর পদার্থের

অন্তর্গত (যথা প্রাণী) করিয়া লইতে হইবে—যাহার চৈতন্য বিদ্যমান। এই প্রণালী হইতে আমরা বুঝিতে পারি, যাহা প্রতিপাদ্য অথবা ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায়, নিগমনাবয়ব মাত্রেই ব্যাপকতর সাধ্যাবয়বের অপেক্ষা রাখে এবং সেই সাধ্যাবয়বকে আবার প্রকারান্তরে প্রতিপাদ্যের বিষয় করা সম্ভব তখন উহা সাধ্যাবয়বটী আর সাধ্যাবয়ব রহিবে না, তখন একটী নিগমনাবয়ব হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহার সাধ্যাবয়ব হইবে প্রাণী মাত্রেই চেতন। প্রণালী হইবে এইরূপ—প্রাণী মাত্রেই চেতন, মনুষ্য প্রাণী, সুতরাং মনুষ্য চেতন।

এখন আর একটী প্রশ্ন উঠে, এই যে প্রণালী ইহার মূল কোথায়? মূল নিরপেক্ষানুভূতি (Immediate knowledge) নিরপেক্ষ বা স্বতঃসিদ্ধ বলিব কেন? কারণ ইহাই যুক্তির মৌলিক নিয়ম—চিন্তাপ্রণালী অন্যরূপে প্রবাহিত হইতে পারে না। যাহার উপর বা যে সাধ্যাবয়বের উপর নির্ভর করিয়া যুক্তি প্রণালী সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতে অগ্রসর হইবে সেটী যদি প্রতিপাদ্য হয়, তাহা হইলে সেটী আর মূল সাধ্যাবয়ব রহিল না। মূল সাধ্যাবয়ব যেটী হইবে সেইটীকে আর প্রতিপন্ন করা অর্থাৎ যুক্তিবলে প্রতিপন্ন করা সম্ভব নয়। মূল সাধ্যাবয়ব আর মূলতত্ত্ব একই কথা। কোন দার্শনিক এরিষ্টটলের ন্যায়দর্শনকে কেবলমাত্র প্রমাণ-প্রয়োগ-প্রণালী-বিষয়ক বিজ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করেন কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যাহা কথিত হইল তাহা হইতে বুঝা যায়, এরিষ্টটলের ন্যায়দর্শনকে ঐ আখ্যা প্রদান করিলে তাহার মর্য্যাদাহানি করা হয়। মূলতত্ত্বের অনুসন্ধান ঐ শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য—যুক্তির প্রয়োগপ্রণালী বিচার করা গৌণ উদ্দেশ্য।

প্লেটো-দর্শন আলোচনাকালে অনেকেই মনে করিবেন, এবং সে কথা প্রথমে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, প্লেটো দুইটী পৃথক জগৎ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—একটী ভাবজগৎ বা জাতি, অপরটী প্রত্যক্ষ জগৎ বা বিশেষ এবং উহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

বস্তুতঃ প্লেটো উহাদের সম্বন্ধবিচার কার্য্য অসম্পূর্ণই রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাই বলিয়া সে সম্বন্ধের আভাষ পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শনে পাওয়া যায় না একরূপ মনে করা অযৌক্তিক। সেই আভাষের কথা আমরা প্লেটো দর্শনালোচনায় অল্পবিস্তর উল্লেখ করিয়াছি। সেই সম্বন্ধের সম্যক্ বিচারে এরিষ্টটলই প্রথম প্রবৃত্ত হন এবং তিনিই প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন যে, এই প্রত্যক্ষ জগৎ সেই ভাবজগতের সহিত গভীর ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ—নিগমনাবয়ব যেমন সাধ্যাবয়বের সহিত অচ্ছেদ সম্বন্ধে আবদ্ধ সেইরূপ বিশেষ পদার্থমাত্রেই জাতির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট।

এতক্ষণে বুঝা গেল, ন্যায়দর্শন বলিতে কি বুঝায় সে কথা বিচার করা আমাদের কেন প্রথমেই প্রয়োজন হইয়াছিল। এরিষ্টটলের মতে এই যুক্তিপ্রণালী অজ্ঞাত থাকিলে মনুষ্যের পক্ষে মূলসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব।

ইতিপূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হইল তাহাতে কেহ কেহ হয়ত মনে করিবেন, এরিষ্টটলের মতামত যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হইল না। কারণ, তিনি প্রত্যক্ষ পদার্থের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া দর্শনশাস্ত্র ও তদন্তর্গত ন্যায়শাস্ত্র গঠিত করিয়াছিলেন। এমন কি, কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, ভাবজগৎকে কাল্পনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া বাস্তব-জগতের সত্যতা প্রতিপন্ন করাই তাঁর (এরিষ্টটলের) উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সে কথা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, প্লেটো যে মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন এবং দর্শনশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য যাহা স্থির করিয়াছিলেন, সেই দুইটী বিষয়ে এরিষ্টটলের মতানৈক্য ছিল না, এটী সর্ব্ববাদীসম্মত কথা। সাধারণ বিষয়ের জ্ঞানলাভই দর্শনের উদ্দেশ্য, এই কথা এরিষ্ট-টলের মতানুযায়ী হইলে ভাবজগৎকে উপেক্ষা করা চলে না, অস্বীকার করা ত দূরের কথা। পক্ষান্তরে উহাকেই প্রত্যক্ষ জগতের মূলভিত্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

সৎকথা।

যিনি ভগবানকে চান তিনি দত্তাত্রেয়, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতি মহাপুরুষগণকেও মান্‌বেন। কারণ এঁরা হলেন মহা মহা জ্ঞানী—ভগবানের দর্শন লাভ করেছেন। এঁদের মেনে চল্‌লে, শ্রদ্ধাভক্তি কর্‌লে, হিংসা দ্বেষ চলে যাবে, দুঃখ দূর হবে এবং ভগবানকে বুঝ্‌তে পারবে।

*　　*　　*

যার যা ভোগ আছে ভুগ্‌বেই, বাধা দিলে কি হবে? মাঝে থেকে অপরের বিষনজরে পড়া। ভগবানকে নিয়ে পড়ে থাক, তাহলেই কল্যাণ হবে।

*　　*　　*

যার হবার তার হবেই। যে ভগবানকে চায়—সে তাঁকে ডাক্‌বেই, যে চায় না, সে কেন ডাক্‌বে?

*　　*　　*

লেখা পড়া শিখে, ত্যাগী মহাপুরুষদের জীবন দেখে শিক্ষালাভ না কর্‌লে, লেখা পড়া সমস্তই বৃথা।

*　　*　　*

উদ্দেশ্যহীন জীবন অতি খারাপ। মানুষের একটা না একটা উদ্দেশ্য থাকা বিশেষ প্রয়োজন। উদ্দেশ্য না থাক্‌লে উন্নতি হয় না। লক্ষ্য স্থির করে একটা কাজে জোর করে লেগে থাক্‌তে হয়। তবে যাঁর উদ্দেশ্য যত মহৎ, তিনি তত বড়।

*　　*　　*

সংসারে ছেলে মেয়ে, ধন দৌলত সব আছে, অথচ যাঁর ভগবানের অভাব বোধ হয়, তিনিই ভাগ্যবান্ পুরুষ।

*　　*　　*

ভগবানের মায়া বুঝা কঠিন। ক্ষুদ্রজীব হয়ত মনে করে—

লাফিয়ে গাছে উঠি, চন্দ্র সূর্য্য ডিঙ্গিয়ে যাই। কিন্তু তারা বুঝে না, ভগবানের দয়া ব্যতীত কিছু হয় না। তাই ত জীবের এত দুর্দ্দশা। তাঁকে ছেড়ে কি কোন বড় কাজ হয়?

* * *

যে ভয় করে, সংশয় করে তার কি সংসারে, কি ধর্ম্মজগতে কোথাও উন্নতি হয় না। এতে মন সঙ্কুচিত হয়ে যায়। যিনি সত্য লাভের জন্য জগৎ আছে কি না আছে গ্রাহ্য না করে অগ্রসর হন, তিনিই বীর, তিনিই শ্রেয় লাভ করেন।

* * *

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্‌, মুক্তিদাতা, কর্ত্তা, বিধাতা, তিনিও সংসারে জন্মগ্রহণ করে পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন, তাঁহাদের ভরণপোষণ করেছিলেন। হে জীব, তোমরাও পিতামাতাকে ভক্তি কর, পূজা কর। যে পুত্র ঐরূপ করে সেই ভাগ্যবান।

* * *

খাওয়া পরার কষ্ট না হলেই হল। অর্থ বেশী হলে ভগবানের স্মরণ মননে বাধা উপস্থিত হয়। দু'চার জন এমন ভাগ্যবানও থাকেন যাঁরা বুঝতে পারেন অর্থই অনর্থ ঘটায়। আর অর্থ দিয়ে পরিবার বল, ভাই বল, বন্ধু বল তাদের কিছুতেই মন যোগাতে পার্‌বে না। অর্থের আকাঙ্ক্ষা যত কম হয়, ততই ভাল।

* * *

গুরুবাক্যে সংশয় কর্‌লে কখনও ধর্ম্ম হয় না। একজনের উপর নির্ভর করা কি কম কথা? সুখ আসুক, দুঃখ আসুক গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করে চল্‌তে হবে—তবেই মঙ্গল।

* * *

চরিত্রহীন হলে কি ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝা যায়? ভগবান্‌ বল্‌ছেন, "হে জীব, সৎ হও, পবিত্র হও, চরিত্রবান্‌ হও, তবে তুমি আমাকে বুঝ্‌তে পার্‌বে।" চরিত্রহীন হলে শাস্ত্র পুরাণাদির কথা বুঝতে পারা যায় না—সেই জন্য লোকে ওসব গল্প গুজব মনে করে। তবে সাধন

ভজন, তপস্যাদি কর্‌লে ঐ সকলই আবার সত্য, প্রত্যক্ষ বলে মনে হবে।

*   *   *

মতামত মানুষে করে। মতামতের ভিতর ভগবান্ নাই।

*   *   *

যে ঠিক ঠিক সাধু হবে তার কোন স্বার্থ থাক্‌বে না। ভগবানের প্রতি কি করে ভক্তি শ্রদ্ধা হবে এইটুকু মাত্র স্বার্থ তার মধ্যে থাকে। সংসারের ঝঞ্ঝাট তার ভাল লাগে না, শান্তি পাবার জন্যই সাধু হয়।

*   *   *

পাশ করে ভাল চাকুরী না জুটলে যেমন সমস্তই বৃথা তেমনি আবার লেখা পড়া শিখে যার ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি না হয় তার লেখা পড়া সমস্ত বৃথা।

*   *   *

যেখানে মেয়েদের ব্যাপার সেইখানেই গোলমাল; সেইজন্য সাধু ভক্ত, যারা ভগবান্ লাভ কর্‌তে চায়, তারা ঐ সব থেকে দূরে থাক্‌বে।

*   *   *

সকলের ভেতর ভগবান্ আছেন। তোমার ভিতরও কি ভগবান্ নাই? আমরা বুদ্ধির ভ্রমবশতঃ বুঝ্‌তে পারি না। তিনি বলেছেন, আমি হচ্ছি পূর্ণ, আর সব আমার অংশ।

*   *   *

সৎ লোকের সহিত সৎ আলাপ কর্‌লে ভগবান্ খুসী হন। তাতে সৎবুদ্ধি হয়। বদ্ লোকের সহিত অর্থাৎ ভগবানে অবিশ্বাসী লোকের সহিত আলাপ কর্‌তে নেই, তাতে অসৎ বুদ্ধি জন্মায়। তাঁকে ভুলে যেতে হয়।

*   *   *

যেমন করেই হোক, সৎ হতেই হবে, তা যে ধর্ম্ম পালন করেই হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না।

যার ধর্ম্মভয় আছে, ভগবানকে ভয় করে, সে ত সৎলোক, কটা লোক ঐরূপ হয়।

* * *

মায়া দুই রকম—সৎ ও অসৎ। সৎ মায়া কেমন?—এতে জগৎ মিথ্যা, ভগবান্ সত্য, তিনি সত্যস্বরূপ বলে বোধ হয়। কি করে ভগবানের স্মরণ মনন কর্‌বে, কি করে তাঁর পূজা কর্‌বে, এই তার চিন্তা হয়।

অসৎ মায়া কেমন?—ভগবান্ মিথ্যা, জগৎ সত্য বলে মনে হয়। অসৎ মায়াতে জীব কষ্ট পায়।

সমালোচনা।

ধম্মপদ—(মূল, অন্বয়, সংস্কৃত ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও টীকাসহ)। তৃতীয় সংস্করণ। শ্রীচারুচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ২০১নং, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১॥০ টাকা, কাপড়ে বাধা ২৲ টাকা।

হিন্দু আমরা সচরাচর পুরাণ এবং বেদান্তাদি দার্শনিক গ্রন্থে বৌদ্ধ দর্শনের যে সমালোচনা দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনের একটা ধারণা করিয়া থাকি, কিন্তু এ ধারণা যে অতি অসম্পূর্ণ তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, কোন ধর্ম্ম বা দার্শনিক সম্প্রদায়ের যথার্থ তত্ত্ব জানিতে গেলে তত্তৎসম্প্রদায় নিজেরা নিজেদের যে বর্ণনা করেন, তাহা না শুনিয়া বিরুদ্ধবাদীর (তিনি যতই উদারভাবাপন্ন হউন না কেন) কথায় তাহার সঠিক ধারণা হয় না। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনের যথার্থ তত্ত্ব জানিতে হইলে উহার মূলগ্রন্থের সহিত আমাদের

পরিচিত হওয়া অতি প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ভারতে একদিন কত নূতন নূতন সৎকার্য্যের সূচনা হইয়াছিল, যাহার ফলে ভারতীয় সভ্যতা কতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার তত্ত্ব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ নানা পাশ্চাত্য ভাষায় প্রকাশ করিয়া চর্চ্চা করিতেছেন, আর আমরা আমাদের দেশের এত বড় একটা জিনিষকে এতদিন ধরিয়া অতিশয় অবহেলা করিয়া আসিতেছি—ইহা কি আমাদের পক্ষে অতিশয় লজ্জা ও নিন্দার বিষয় নহে ?

শ্রীযুত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় বহুদিন পূর্ব্বে পালিভাষায় রচিত অসাম্প্রদায়িক নীতিভাবপূর্ণ ধম্মপদ গ্রন্থেব প্রকাশ করিয়া আমাদের এই কলঙ্ক কিয়ৎপরিমাণে মোচন ক রয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আমরা কয়জন তাহার প্রদর্শিত পথে অন্যান্য বৌদ্ধ পালি গ্রন্থের অনুবাদ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি ? এ কার্য্য যতদূর কঠিন বলিয়া বোধ হয়, তত কঠিন নহে পালিভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য—যিনি সামান্য সংস্কৃত জানেন, তিনিই একটু চেষ্টা করিলেই পালি বুঝিতে পারেন। যাহারা চারুবাবুর ধম্মপদখানি পড়িয়াছেন, তাঁহারাই একথা স্বীকার করিবেন।

যাহা হউক. হিন্দুর গীতার ন্যায়, সমগ্র বৌদ্ধদেব শুধু তাহাই নহে, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর—উহা পরম আদরের গ্রন্থ— এই ধম্মপদের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। বিশেষতঃ, এ সংস্করণে ইহার অন্তর্গত সমুদয় শ্লোকগুলির একটী বর্ণানুক্রমিক সূচী সংযোজিত হওয়ায় এবং প্রত্যেক শ্লোক কোন স্থানে কাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকায়, পুস্তকখানির মূল্য আরও বাড়িয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সংক্রান্ত বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ও ফুটনোটে এবং পরিশিষ্টে সংযোজিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানি সাক্ষাৎ ভগবান্ বুদ্ধদেবের উক্তি। বৌদ্ধ শাস্ত্র ত্রিপিটক সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম নামক তিন পিটকের মধ্যে ইহা

সূত্র পিটকের অন্তর্গত। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে বুদ্ধঘোষ পালিভাষায় ইহার একটী উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করেন। এই সংস্করণে ঐ টীকার অর্থের বিশেষ ভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া পুস্তকখানি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষাও বিশুদ্ধতর হইয়াছে। গ্রন্থ-প্রারম্ভে বিখ্যাত পালিভাষাবিৎ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়-কৃত একটী উৎকৃষ্ট ভূমিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং সংস্কৃত অংশটী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় দেখিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এই সংস্করণটী যে অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা নিঃসঙ্কোচে প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠককে এই গ্রন্থ এক একখানি গৃহে রাখিয়া পাঠ করিতে বলি।

সম্পাদক মহাশয়কে আমাদের একটী অনুরোধ—আমরা ইহার কয়েকটী শ্লোক বেশ করিয়া পড়িয়া দেখিয়াছি—আগামী সংস্করণে আর একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিলে ভাল হয়। অন্যান্য নানা কার্য্যের মধ্যে এইরূপ সম্পাদন—তার উপর গ্রন্থক্রেতৃবর্গের তাদৃশ প্রাচুর্য্য না থাকায় উপযুক্তমত অর্থব্যয়ের অসামর্থ্য—ইত্যাদি কারণে ইচ্ছা থাকিলেও বাঙ্গালা গ্রন্থের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধিসম্পাদন এক কঠিন ব্যাপার, ইহা আমরা জানি। তথাপি আমরা প্রার্থনা করি, তৃতীয় সংস্করণটী শীঘ্র বিক্রীত হইয়া যাউক এবং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ চতুর্থ সংস্করণ শীঘ্র প্রকাশিত হউক।

ঋগ্বেদসংহিতা—মূল সায়নভাষ্য এবং উহাদের বঙ্গানুবাদসহিত বেদোদ্বোধিনী সমিতি, ১১২ নং, হাউজকটরা, পাথরগলি, বেনারস সিটি হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রতিখণ্ড ॥০ আনা। ১২ খণ্ড ৫৲ টাকা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রথম দুই খণ্ডের প্রাপ্তিস্বীকার করিয়াছিলাম - এক্ষণে ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডেই সায়নভাষ্যের উপোদ্‌ঘাত-প্রকরণ শেষ হইয়াছে এবং মন্ত্র আরম্ভ

হইয়াছে। প্রথমে মন্ত্র, পরে পদপাঠ, অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা, মন্ত্রের অর্থ, বেদোদ্বোধিনী নাম্নী সরল সংস্কৃত টীকা, সায়নভাষ্য, ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ স্থানে স্থানে বৈদিক দুরূহ শব্দের টিপ্পনী, মধ্যে মধ্যে তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ও বিভিন্ন নিরুক্তকারগণের মত ও স্থানে স্থানে নিরুক্তকারের বিশেষ ব্যাখ্যা—এই ভাবে প্রতি মন্ত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইতেছে। মোট কথা, যাহাতে বিশদরূপে বেদের তাৎপর্য্যগ্রহ হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে এরূপ বিস্তৃতভাবে বেদের মূল ও ভাষ্যের অনুবাদ কোন ভাষাতেই প্রকাশিত হয় নাই।

বঙ্গভাষার বিশেষ সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদসংহিতা এরূপ বিশদভাবে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিতেছে এবং বঙ্গভাষাভাষীর জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছে। অন্যূন একশত খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। আমরা জানি, কয়েক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত এই সৎকার্য্যের উদ্যোক্তা। কয়েকজন সহৃদয় ধনী এক এক খণ্ডের মুদ্রণভার লওয়ায় এতদিন পর্য্যন্ত এই গ্রন্থ-প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। যাহাতে অর্থসাহায্যাভাবে গ্রন্থ-প্রকাশকার্য্য অসমাপ্ত অবস্থায়ই বন্ধ না হইয়া যায়, তজ্জন্য দেশের ধনিবর্গের অগ্রসর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এক একজন যদি এক এক খণ্ডের প্রকাশার্থ ২০০৲ টাকা মাত্র দেন, তবে এ কার্য্য অতি সহজ হইয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ ও অন্যান্য বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনে বদ্ধপরিকর সাহিত্যসমিতিসমূহ এবং সনাতনধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত বঙ্গীয় ধর্ম্মমণ্ডলী সমুদয়েরও এই কার্য্যে সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

বেদোদ্বোধিনী সমিতি শুধু বেদ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বাঙ্গালীর ছেলেরা যাহাতে বেদ বুঝিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে তাঁহারা কয়েকটীকে বেদ পড়াইতেও আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের ইচ্ছা বাঙ্গালাদেশে যেখানেই কিছু সংস্কৃতের চর্চ্চা আছে, তথায়ই বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা অবিলম্বে আরব্ধ হউক। কেবল দর্শন, স্মৃতি, ব্যাকরণ, ন্যায়ের চর্চ্চায় সংস্কৃত শিক্ষাকে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। হিন্দুর সকল জ্ঞানের মূল এই বেদ। বেদ আয়ত্ত না হইলে হিন্দু-

ধর্ম্মের মূল ভিত্তিই বুঝা যায় না। হিন্দুসমাজের ক্রমপরিণাম বুঝিতে হইলে, পুরাণের মূল জানিতে হইলে, স্মৃতিসমূহের শ্রুতিমূলকতা বুঝিতে হইলে বেদাধ্যয়ন অত্যাবশ্যক। আমাদের দৃঢ় ধারণা, বঙ্গদেশে লুপ্ত বৈদিক জ্ঞানের পুনঃপ্রচার হইতে আরম্ভ হইলে বঙ্গদেশীয় ধর্ম্মসমাজসমূহে বিপুল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। অতএব যাঁহারা হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান জড়তা ভাঙ্গিয়া উহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করাইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের পক্ষে বেদপ্রচার উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায়। পূজ্যপাদ আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ বঙ্গদেশে বেদপ্রচারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। যাঁহারা স্বামিজীকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা নানারূপে করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্বামিজীর বিশেষ অভিপ্রেত এই বেদ-প্রচারকার্য্যে বিশেষভাবে সহায়তা করা বাঞ্ছনীয় নহে কি ?

দুঃখের বিষয়, ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই বেদ লইয়া সারাজীবন কাটাইয়া গেলেন কিন্তু যাহাদের ইহা নিজেদের জিনিষ তাহাদের চৈতন্য হইতেছে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—আমাদের দেশের লোকে এই বিষয়ে একটু সচেষ্ট হইলে আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মেমোরিয়াল।

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় বিগত ১১ই ডিসেম্বরের দরবার-বক্তৃতাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উল্লেখ করিয়া এমন কতকগুলি উক্তির প্রচার করেন যাহাতে অনেকস্থলে লোকের মনে মিশন সম্বন্ধে অনর্থক সন্দেহ ও ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ ঐ কথা বুঝিতে পারিয়া যাহাতে সাধারণের ঐরূপ ভ্রম নিরসন হইতে পারে তাহা প্রার্থনা করিয়া বিগত ২২শে জানুয়ারী তারিখে

উক্ত গভর্ণর সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে একখানি আবেদন পাঠাইয়াছিলেন :—

গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতাতে দেশের জনহিতকর ও লোক-সেবাব্রতী মণ্ডলীদিগের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের বিশিষ্ট উল্লেখ করায় যে সম্মান ও উৎসাহ দান করা হইয়াছে তজ্জন্য মিশন তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কিন্তু গভর্ণর বাহাদুরের সকল কথাগুলির যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া মিশন যে সরকার বাহাদুরের সন্দেহভাজন হইয়া উঠিয়াছেন—অনেকে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং অনেক স্থলেই মিশনের কার্য্যের জন্য অর্থাদি দান বিষয়ে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে মিশনের পরিচালিত সৎকার্য্যগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

মিশনের কর্তৃপক্ষ মিশনের অন্তর্ভুক্তগণের— তালিকা অনুসারে ৭৮ জন সাধু সভ্য, ১২১ জন গৃহস্থ সভ্য ও ২ জন এসোসিয়েট সভ্য) সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাদের কেহই রাজনীতিক বা অপর অপরাধে দোষী নহেন এমন কি কোনও অবৈধ আন্দোলনাদিরও প্রশ্রয়দাতা নহেন। অপরপক্ষে মিশনে যোগদান করিবার পূর্ব্বে কাহারও জীবনে কোনও দোষের সংস্পর্শ ছিল, কিন্তু এখন নাই, এরূপ দৃষ্টান্ত যদিও বা পাওয়া যায়, তাহা হইলে এ কথাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, মিশন কেন, কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায় এরূপ প্রবেশার্থীকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে যাহাতে তাহাদের জীবন মহৎ সঙ্কল্প ও সাধনার দ্বারা মিশনের আদর্শে গড়িয়া উঠে, সে চেষ্টায় মিশন কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

বক্তৃতার যে অংশে লাট বাহাদুর বলেন যে, অসৎ ও ক্রূরকর্ম্মা রাজনীতিক ষড়যন্ত্রকারিগণ রামকৃষ্ণ মিশন বা ঐরূপ কোনও সৎ-সঙ্কল্প-প্রণোদিত মণ্ডলীর নাম গ্রহণ ও তাহার সহিত সংযোগ স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয়-স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে এবং সুকুমারমতি যুবকগণকে বিপথে লইয়া যায়—সেই অংশ লইয়াই লোকে সন্দেহবহুল অর্থ করিয়া বসিয়াছে এবং মিশনের শুভাকাঙ্ক্ষিগণেরও মনে দ্বিধার সঞ্চার হইয়াছে। পূর্ব্বে

যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, মিশনের প্রকৃত সভ্যগণের মধ্যে কাহারও উপর রাজনীতিক অভিযোগ আনা যায় না। কখনও কখনও দুর্ভিক্ষ বন্যা প্রভৃতিতে আর্ত্তসেবা কার্য্যে বিশেষ বিস্তার ঘটিলে মিশনকে বাহিরের লোকের মধ্য হইতেও স্বেচ্ছাসেবক গ্রহণ করিতে হয়। মিশনের সহিত এ সকল সেবকের সংযোগ নিতান্ত সাময়িক এবং মিশনের কোনও কার্য্যে ইহাদের স্ব-কর্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্য থাকে না। এ অবস্থায় তাহাদের কোনও স্বতন্ত্র ও গুপ্ত আচরণের দ্বারা তাহারা যদি পুলিশের সন্দেহভাজন হইয়া থাকে তবে সে সন্দেহের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনকে দায়ী ভাবা উচিত নহে। এই সকল সাময়িক সেবকগ্রহণ সম্বন্ধে মিশনের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি আরও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া কতকগুলি বিশেষ কারণে ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া নিজেদের কার্য্য উদ্ধার করার সুযোগ ও সুবিধা অত্যন্ত অল্প। প্রথমতঃ, মিশন যে আদর্শ ও কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন ও প্রচার করেন, তাহার সহিত কোনও রাজনীতিক উদ্দেশ্যসাধনের কোনও সম্পর্ক নাই—ইহা মিশন হইতে পরিচালিত সাময়িক পত্রাদি অথবা মিশন হইতে প্রকাশিত বিবিধ পুস্তকাদি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এমন কি ১৯১৪ সালে এপ্রিল মাসে এ সম্বন্ধে জনসাধারণের নিকট মিশন একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, মিশনের শাসন ও পরিচালনার ভার সম্পূর্ণরূপে কতিপয় পুরাতন সন্ন্যাসিবর্গের উপর সংন্যস্ত থাকায় বাহিরের কোনও লোকের পক্ষে অথবা নূতন কোনও সভ্যের পক্ষে মিশনের কার্য্যের মধ্যে হঠাৎ কোনও নূতন উদ্দেশ্য বা প্রণালীর সন্নিবেশ বা প্রবর্তন করা একেবারে অসম্ভব। তৃতীয়তঃ, রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত স্থায়ী ও অস্থায়ী কেন্দ্র সর্ব্বদাই সরকারী ও পুলিশ কর্ম্মচারিগণকে তাঁহাদের অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণাদি কার্য্যে সর্ব্ব-প্রকার সুবিধা ও সাহায্য করিয়া থাকেন।

"কোনও সভা-সমিতি বা অনুষ্ঠানের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের নাম

সংযুক্ত থাকিলেই উহা যে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ত্তৃত্বাধীনে, ইহা ভাবা সঙ্গত নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে এ দেশের একজন মহাপুরুষ ছিলেন, অতএব সকলেরই নিজ নিজ সদনুষ্ঠানে তাঁহার নাম সংযুক্ত করিয়া রাখিবার অধিকার আছে।

কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন যেরূপ আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তাহা তাহার রেজিষ্ট্রীকৃত নিয়মাবলীতে ও রিপোর্টাদিতে স্পষ্টই প্রকাশিত রহিয়াছে। এ সমস্তই আবেদনের সহিত দাখিল করা হইল। বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রতি গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতি ও সহায়তার দৃষ্টান্ত এই স্থলে উল্লিখিত হইল।

পরিশেষে যাহাতে ভারত ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে গভর্ণর বাহাদুর যে কোনও ভাবেই হউক রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি সাধারণের পূর্ব্বোক্ত দ্বিধা ও সন্দেহের নিরসন করিয়া যাইতে পারেন তজ্জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হইল। এবং মিশন সম্বন্ধে যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় আবেদনে সন্নিবেশিত করা হইল তৎসম্বন্ধে কিছু বিশেষ জানিবার থাকিলে সাক্ষাতে বা পত্রাদিদ্বারা মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা সরকার বাহাদুরের নিকট নিবেদন করিতে প্রস্তুত, ইহাও জ্ঞাপন করা হইল।

এই আবেদনের প্রত্যুত্তরে লর্ড কারমাইকেল মিশনের সেক্রেটারীকে যে পত্র দিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

লর্ড কারমাইকেলের পত্র

গবর্ণরের ক্যাম্প।

বেঙ্গল, ২৬শে মার্চ্চ ১৯১৭।

মহাশয়

আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, এবং রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্ভব কিরূপে হইল, উহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য

কি, এ বিষয় আমাকে যাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কিছু দিন পূর্ব্বে মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে যে মেমোরিয়াল পাঠাইয়াছেন, তাহা আমি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। ধর্ম্ম, সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে মিশন যে সৎকার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, বিগত ডিসেম্বরের দরবারে মিশন সম্বন্ধে আমার কয়েকটি কথা যে কোনওরূপে তাহার সঙ্কোচজনিত ক্ষতির কারণ হইয়াছে, ইহা শুনিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম। মিশন ও মিশনের সভ্যগণের উপর অভিযোগ আনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, ইহা আমি জানি, আপনিও বুঝিয়াছেন। আমি জানি, মিশনের কাজ সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিক-অভিপ্রায় শূন্য এবং ইহার জনসমাজের সেবা-কার্য্য সম্বন্ধে আমি ভাল ছাড়া আর কিছুই শুনি নাই। আমি যাহা জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইতে চাহিয়াছিলাম, তাহা এই—লোকহিতৈষণা ও লোকসেবার যে সব কার্য্যে মিশন ব্রতী, বিপ্লবকারীদের একদল সেইরূপ কার্য্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিজেদের গর্হিত দুরভিসন্ধির আবরণরূপে অবলম্বন করে,—অভিপ্রায়, মিশনের সহিত তুল্য আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবকদিগকে নিজেদের দলে আকৃষ্ট করা এবং সেই আদর্শকে স্বাভিপ্রায়সিদ্ধির অনুকূলে বিকৃত করা। এইরূপ অসদভিপ্রায়ে মিশনের নাম ও সুযশ অকুণ্ঠিতভাবে স্বকার্য্যসাধনে নিয়োজিত করা হইতেছে।

প্রকৃত রামকৃষ্ণ মিশনের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহার সহিত আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কেবল মিশনের নামের যে অযথা ব্যবহার করা হইয়াছে, আমার ইচ্ছা উহা নিবারণ করা। আশা করি, দ্বিধাহীন দুষ্কৃতকারীদের এই অন্যায় আচরণ হইতে সাবধান থাকিবার পক্ষে আমার কথিত বাক্যগুলি মিশনের সাহায্যে আসিবে। ইতি—

ভবদীয়
কারমাইকেল।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বেলুড়, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে স্থানীয় ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র পল্লিবাসিগণকে সেবা করিবার জন্য একটী দাতব্য ঔষধালয় আছে। মঠেরই জনৈক সন্ন্যাসী আগত রোগিগণকে অবস্থামত ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

মঠের আশপাশের পল্লীসমূহ অতীব অস্বাস্থ্যকর, উহাদের প্রত্যেকটীকে এক একটী ম্যালেরিয়ার ডিপো বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; অথচ গঙ্গার ধারে চটকল প্রভৃতি থাকায় গরীব শ্রমজীবীদিগকে জীবিকার্জ্জনের জন্য ঐ সকল পল্লীতে বাস করিতে হয়। ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে তাহাতে দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া পীড়িত হইলে ঔষধাদির জন্য কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। সেই জন্য ঔষধাভাবে প্রায়ই সামান্য ব্যাধি পর্য্যন্ত মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠে। ইহাদের এই অভাব মোচন করিতে হইলে অনেকগুলি দাতব্য ঔষধালয়ের প্রয়োজন। যাঁহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয় জানেন তাঁহারাই আমাদের এই মত সমর্থন করিবেন সন্দেহ নাই।

এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া প্রথমতঃ মঠ হইতে জানা শুনা দুই চার জনকে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের ব্যবহারের সামান্য ঔষধ হইতেই চিকিৎসা করা হইত। কিন্তু এইরূপে দুই চারি জন করিয়া ঔষধপ্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে—উহাদের জন্য দাতব্য ঔষধালয়রূপে একটী স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে রোগীর সংখ্যা কত এবং বৎসর বৎসর উহাদের সংখ্যা কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা ইং ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালের সংখ্যা তুলনায় আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যাইবে। ১৯১০ সালে ৭৩১ জনকে ঔষধ দেওয়া হয় এবং ১৯১৬ সালে ১০,৪৭০ জন ঔষধ লইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৪০ জন রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এরূপ গরীবও থাকে যাহাদিগকে পথ্যাদিও

দিতে হয়। বর্ত্তমানে ঘুসুরি, বালী প্রভৃতি ৩।৪ মাইল দূরে অবস্থিত পল্লী হইতেও ঔষধ লইতে আসে। লোকের একটা ধারণাই হইয়া গিয়াছে যে, সাধুদের নিকট হইতে ঔষধ লইলে তাহারা শীঘ্র আরাম হইয়া যাইবে। ইহাও সংখ্যাবৃদ্ধির একটী কারণ।

যাহা হউক এতাবৎ কলিকাতার সুবিখ্যাত, দানশীল মেসার্স বটকৃষ্ণপাল এণ্ড কোং বিনামূল্যে সকল প্রকার ঔষধাদি দান করিয়া আতুরের সেবায় সহায়তা করিয়া আসিযাছেন এবং এখনও পূর্ব্ববৎ সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু রোগীর সংখ্যা যেরূপ বৎসর বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে একব্যক্তির পক্ষে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। আর এরূপ কার্য্যের স্থায়িত্ব সাধারণ সহানুভূতি ব্যতীত অসম্ভব। সেইজন্য আমরা এই সদনুষ্ঠানের জন্য পরদুঃখকাতর সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

অর্থ, ঔষধ কিম্বা কোনরূপ পথ্য হউক, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, অধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ আঃ বেলুড়, হাওড়া, এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

গ্রীষ্ম সম্মেলন, দার্জ্জিলিং :—গ্রীষ্মকালে য়ুরোপ ও আমেরিকার স্থানে স্থানে সাময়িক বিদ্যালয় ও বিদ্বৎ-সম্মেলনাদি স্থাপন ও সংগঠনপূর্ব্বক জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করা হইয়া থাকে। এ বৎসর ইহাদের আদর্শে ২১শে মে হইতে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিঙ্গে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে একটি গ্রীষ্ম-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়া সমাজের সকল শ্রেণীর লোক,—য়ুরোপীয়, ভারতবর্ষীয় সরকারী, বে-সরকারী কর্ম্মচারিগণ মহিলা ও পুরুষ স্বীয় স্বীয় গুরু কর্ম্মভার হইতে অবকাশ ও স্বাধীনতা ভোগ করেন। সম্মেলনের উদ্দেশ্য এই যে, সেই সময়টুকুর মধ্যে তাঁহারা শিল্প, কলা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজ ও নীতি প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের নানা সমস্যা ও অভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা ও ব্যাখ্যানা-

দিতে যোগদান করতঃ এই দেশের অবস্থা বুঝিতে পারেন ও তদনুসারে কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। নানা সমস্যার প্রতি নূতন নূতন তত্ত্বসৃষ্টির প্রয়োগ করিতে উৎসাহিত করা এবং নানা কর্ম্মীর কর্ম্মের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য [illegible] স্থাপন করাও এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। দেশের [illegible] ক্ষেত্রে যাঁহারা কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদের পরস্পরের সাহচর্য্য [illegible] এবং পরস্পরের অভাব উদ্দেশ্যাদির [illegible] পরিচয় [illegible] অল্পই সুযোগ ঘটে, আরও ঘনিষ্ঠভাবে যাহাতে তাঁহাদের চিন্তার আদান প্রদান হয় সে জন্য তাঁহাদিগকে একস্থানে সমাবেশ করাও এই সম্মেলনের আর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। ভারতীয় মানবজীবনের বিচিত্র প্রকৃতি ও গতি লক্ষ্য করিয়া জীব-তত্ত্ব (Biology) সম্বন্ধে এবং ভারতীয় সহর ও পল্লীর প্রয়োজনাদি লক্ষ্য করিয়া পৌরনীতিশাস্ত্র (civics) সম্বন্ধে অধ্যাপক গেডীস (Prof-Geddes) পর্য্যায়ক্রমে বক্তৃতা প্রদান করিবেন। কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্যবিধান, শিক্ষা-সংস্থান, শাসনতন্ত্র ও ধর্ম্মকর্ম্ম প্রভৃতি মানবজীবনের সমস্ত সাধনার পক্ষে জীবতত্ত্বের ও সমাজতত্ত্বের তথা চরিত্রনীতি ও মনস্তত্ত্বের জ্ঞান যে কত প্রয়োজনীয় তাহা তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিবেন। সার জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার পি, সি, রায়, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিদ্বদ্বৃন্দ এই সম্মেলনে বক্তৃতা করিবেন ও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সূচনা করিবেন। বক্তাগণ কেহই এই কার্য্যের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন না, তবে এই সম্মেলনের সমাবেশসূত্রে যে ব্যয় হইবে, আশা করা যায় যে তাহা সভ্যগণের প্রদত্ত অর্থ হইতে সঙ্কুলান হইয়া যাইবে। এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য সভ্যগণের ফি উপর্য্যুক্ত সময়ের জন্য ১০৲ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। শিক্ষক ও ছাত্রগণের জন্য অর্দ্ধমূল্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহাতে কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরে অর্থাভাবে ও অসময়ে উহা বন্ধ করিতে না হয় এজন্য পূর্ব্ব হইতেই একটি 'গ্যারান্টি ফণ্ড' স্থাপন করা হইয়াছে—ইহা হইতে অর্থ

গ্রহণের প্রয়োজন না ঘটিতেও পারে। সকলকে এই সম্মেলনে যোগদান করিতে আমরা আহ্বান করিতেছি। এই কার্য্যে যিনি যেরূপ সহায়তা করিতে বা পরামর্শ দিতে চান অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা নিম্নলিখিত সম্পাদকবর্গের নিকট পাঠাইবেন।—অধ্যাপক এস্, সি, মহলানবীশ, ডীন, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা। স্বামী সারদানন্দ ১ নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার কলিকাতা। ডব্লিউ, আর, গুর্লে, আই, সি, এস, সি, আই, ই, গভর্ণমেণ্ট হাউস্, কলিকাতা।

অস্থায়ী অনরারী সেক্রেটরী মিসেস পি, ব্যানার্জ্জি ও মিসেস পি, গেডীস, ৪৬ নং ঝাউতলা রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

গরীব ছাত্রদিগকে এবং অসহায় ও দুস্থ পরিবারগণকে সাহায্য করিবার জন্ম শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে একটী স্থায়ী "দরিদ্র-ভাণ্ডার' (P... F... ...) আছে উহা হইতে অনেককেই তাহাদের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া সাহায্য করা হয়। দুরবস্থার সময় দু'চার টাকা যাহা তাহাদের দেওয়া হয় তাহাতেই তাহারা যে কিরূপ আনন্দিত হয় তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু ফণ্ডে অতি সামান্য অর্থই সঞ্চিত থাকে বলিয়া দুরবস্থার কথা শুনিলেও সময় সময় সাহায্য করা যায় না। সেইজন্য আমরা সাধারণের নিকট নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা যদি মাঝে মাঝে দুই এক টাকা উক্ত ফণ্ডে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে তাঁহাদের এই ক্ষুদ্র দানেও অনেকের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীসমূহ।

(সিষ্টার নিবেদিতা।)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমাদের জাতীয় জীবনধারা যে অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে এই বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করায় স্বামিজীর স্বাধীন চিন্তার যেমন স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন আর কোন বিষয়ে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তাঁহার নিকট কোন প্রথার নূতন আকারটী সর্ব্বদাই পুরাতন পবিত্র সংস্কারসমূহের দ্বারা পবিত্রীকৃত বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার মতে, দেবী সরস্বতীর চিত্র অঙ্কিত করাই "তাঁহাকে পূজা করা"। ভৈষজ্য-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করাই "রোগ ও ময়লারূপ দানবদ্বয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নতজানু হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা"। প্রাচীনকালের ভক্তিপূর্ব্বক গোসেবা হইতে ইহাই পরিচয় পাওয়া যায় যে, হিন্দুসমাজের মধ্যে নূতন ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে দুগ্ধ, মাখন প্রভৃতি সরবরাহ করা, পশুগণের জন্য চারণভূমির ব্যবস্থা করা ও সকল প্রকারে তাহাদিগের পরিচর্য্যা করা ইত্যাদি ভাব পূর্ব্ব হইতেই যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। বুদ্ধিবৃত্তির যতদূর সম্ভব অনুশীলন করাকে তিনি ধ্যানধারণাদির শক্তিলাভের পক্ষে অত্যাবশ্যক জ্ঞান করিতেন। তাঁহার মতে অধ্যয়নই তপস্যা, এবং হিন্দুদিগের ধ্যানপরায়ণতা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মদৃষ্টিলাভের একটী উপায়। সকল কার্য্যই এক প্রকারের ত্যাগ। গৃহ ও পরিবারবর্গেরও প্রতি যে ভালবাসা, তাহাকেও সর্ব্বদা মহত্তর ও বিশ্বজনীন প্রীতিতে পরিণত করা যাইতে পারে।

তিনি সানন্দে দেখাইয়া দিতেন যে, হিন্দুগণের নিকট সকল

লিখিত শব্দই সমান পবিত্র,—সংস্কৃতও যেমন, ইংরাজী ও পারসিক শব্দও ঠিক তেমনি। কিন্তু তিনি বিদেশী আদবকায়দা ও বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার বাহ্য চাকচিক্যকে ঘৃণা করিতেন। যে সমালোচনা শুধু বাহিরের ব্যাপারগুলিকেই নূতন করিয়া সাজাইতে চায়, তাহাতে তিনি কর্ণপাত করিতেই পারিতেন না। যখন তিনি দুইটী সমাজের মধ্যে তুলনা করিতেন, তখন তিনি সর্ব্বদা দেখাইয়া দিতেন যে, বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন আদর্শকে বিকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং কি আধুনিক, কি মধ্যযুগে এই লক্ষ্যসাধনে কে কতটা পরিমাণে সফলকাম হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই তিনি তাহাদের সাফল্য ও অকৃতকার্য্যতার বিচার করিতেন।

সর্ব্বোপরি তাঁহার ভালবাসা সম্বন্ধে ধারণা এরূপ ছিল যে, তিনি বক্তা ও যাঁহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে এই দুই জনের মধ্যে এতটুকু ভেদ রাখিতে দিতেন না। কাহারও সম্বন্ধে "তাহারা" বলিয়া উল্লেখ করাই তাঁহার নিকট ঘৃণার কাছাকাছি বলিয়া বোধ হইত। তিনি যাহাদিগের ত্রুটী বা দোষ দেখান হইতেছে, সর্ব্বদা তাহাদিগেরই পক্ষ অবলম্বন করিতেন। যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ করিতেন, তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, যদি জগৎকে সত্য সত্যই ঈশ্বর ও সয়তান নামক দুই পৃথক ব্যক্তির সৃষ্টি বলিয়া কল্পনা করা চলিত, তাহা হইলে তিনি নিজে ঈশ্বরের সেনাপতি আর্কেঞ্জেল মাইকেলের পক্ষ অবলম্বন না করিয়া, যাঁহার উপর তিনি বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, সেই সদাপরাজিত সয়তানেরই পক্ষ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার এই ভাবটী, তিনি শিক্ষা দিতে বা সাহায্য করিতে সমর্থ, এই আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসের ফলস্বরূপ ছিল না—পরন্তু উহা শুধু কেহ চিরদিনের মত যে দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহারই অংশ গ্রহণ করিবার আন্তরিক দৃঢ় সঙ্কল্পপ্রসূত। কেহ কোথাও জন্মের মত যে দারুণ কষ্টে পতিত হইয়াছে, তাহারই সবটুকু নিজে গ্রহণ করিয়া, তিনি বিশ্বের সমগ্র শক্তিকে অগ্রাহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন।

তাঁহার প্রকাশিত পত্রগুলির মধ্যে কোন কোনখানিতে তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, দয়ারূপ ভিত্তির উপরেও নরসেবাব্রতকে ঠিক ঠিক দাঁড় করান যায় না। তাঁহার পক্ষে ঐরূপ বলা খুবই স্বাভাবিক হইয়াছে। তিনি ওরূপ পৃষ্ঠপোষকতার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন যে, দয়া তাহাকেই বলে, যাহা অপরকে জীবজ্ঞানে সাহায্য করে; কিন্তু প্রেম সকলকে আত্মা জ্ঞান করিয়া সেবা করিয়া থাকে। সুতরাং প্রেমই পূজাস্বরূপ এবং এই পূজাই ঈশ্বরদর্শনে পরিণত হয়। "সুতরাং অদ্বৈতীর পক্ষে প্রেমই একমাত্র কার্য্যপ্রবৃত্তির হেতু।" কোন উচ্চ সেবার ভারপ্রাপ্তির সহিত আর কোন উচ্চাধিকারই তুলিত হইতে পারে না। একখানি পত্রে তিনি বলিতেছেন, "যিনি কাহাকেও রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই স্বর্গান্তঃকরণে গমন করিবেন; যাঁহাকে রক্ষা করা হইয়াছে, তিনি নহেন।" পুরোহিতগণকে যেমন বাহান্তর শুদ্ধি করিয়া উৎসুক-ভাবে, অথচ সসম্ভ্রমে এবং সমস্ত বাধাবিপত্তির মধ্যেও অবিচলিত থাকিবার দৃঢ় সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া পূজাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তেমনি যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষারূপ পবিত্র কার্য্যের জন্য মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও কার্য্যে সেইরূপে অবতীর্ণ হইতে হইবে। কলিকাতা মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রী, মহারাষ্ট্র মহিলা মাতাজী মহারাণীর কথাগুলি স্বামিজী মনে রাখিযাছিলেন এবং প্রায়ই উহাদের উল্লেখ করিতেন। যে ছোট ছোট মেয়েগুলিকে তিনি পড়াইতেন তাহাদের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "স্বামিজী আমার কোন সহায় নাই। কিন্তু আমি এই নিষ্পাপা কুমারীগুলিকে পূজা করি; তাহারাই আমাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবে।"

নিম্নশ্রেণীর লোকশিক্ষার প্রতি স্বামিজী যে ভাব পোষণ করিতেন তাহাতে ঐরূপ এক প্রগাঢ় সহানুভূতি ও সেবার ভাবই প্রকাশ পাইত। তাঁহার মতে, সমাজের উচ্চ শ্রেণীসমূহের যেমন বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানলাভের, অধিকার আছে, তাঁহাদের এই নিম্নশ্রেণীর

ভ্রাতৃগণেরও ঐ বিষয়ে ঠিক তেমনি অধিকার আছে। এইটী পাইলেই তাহারা স্বাধীনভাবে ভিতর হইতে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ণীত করিয়া লইবে। তাঁহার পুরোবর্ত্তী এই কার্য্যটী সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তভাবে চিন্তা করিয়া তিনি শুধু, বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত ভারতে যত মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছিলেন। যে যুগে ঔপনিষদিক জ্ঞান শুধু আর্য্যদিগেরই বিশেষ অধিকার বলিয়া গণ্য হইত, ভগবান্ তথাগত সেই যুগে প্রাদুর্ভূত হইয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকে ত্যাগদ্বারা নির্ব্বাণ-লাভরূপ শ্রেষ্ঠ মার্গের উপদেশ করিলেন। যে দেশে এবং যে কালে সিদ্ধ আচার্য্যগণের প্রদত্ত মন্ত্র কেবল অত্যল্পসংখ্যক সুশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেই সযত্নে রক্ষিত হইত, আচার্য্য রামানুজ সেই দেশে এবং সেই সময়ে কাঞ্চীনগরীর গোপুরে আরোহণ করিয়া সেই মহামন্ত্র সকল প্যারিয়া বা চণ্ডালের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন। এখন ভারতে আধুনিক যুগের অভ্যুদয় কাল; এখন ভারতবাসিগণ ঐহিক জ্ঞান (secular knowledge) দ্বারা মানুষ হইতে শিখিবে। সুতরাং কিরূপে ইতর লোকদিগের মধ্যে ঐহিক জ্ঞানের বিস্তার করা যাইতে পারে তাহাই স্বভাবতঃ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন হইয়াছিল।

অবশ্য তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতে পুনরায় ঐহিক সম্পদের অভ্যুদয় করিতে হইলে সমগ্র জাতিটীর শক্তি ও সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। আর তিনি বেশ জানিতেন যে, ঐহিক সম্পদের পুনঃ প্রতিষ্ঠাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতার সহিত বলিয়াছিলেন, "যে ঈশ্বর আমাকে ইহ জীবনে এক টুকরা রুটী দিতে পারেন না, তিনি যে পরজীবনে আমাকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিবেন, একথা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না!" সম্ভবতঃ তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, এক মাত্র জ্ঞানবিস্তার দ্বারাই সমগ্র দেশটী সে যে মহান্ চিন্তা ও ধর্ম্মোৎকর্ষের উত্তরাধিকারী হইয়াছে, তৎপ্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে। যাহাই হউক না কেন, কেবল ইতর-

সাধারণের সহিত আদানপ্রদান সম্বন্ধ স্থাপনের এক বিরাট আন্দোলন উত্থাপিত করিলেই উচ্চশ্রেণীসমূহের ধমনীতে নবজীবন সঞ্চারিত হইতে পারিবে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই যে লোকে নেতৃত্বের সনন্দ প্রাপ্ত হয়, এই ধারণাটীকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতে হইবে। সম্যক্ অনুশীলন দ্বারা সুমার্জ্জিত যে কাণ্ডজ্ঞানকে লোকে প্রতিভা আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে, তাহার উদ্ভব ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের মধ্যে যেমন সম্ভবপর, সামান্য দোকানদার বা হলচালনাকারী কৃষকের মধ্যেও ঠিক তেমনি সম্ভবপর। যদি সাহস ক্ষত্রিয়েরই একচেটিয়া সম্পত্তি হইত, তাহা হইলে তাঁত্যিয়া ভীল কোথায় থাকিত? তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, বিধাতা সমগ্র ভারতবর্ষকেই গলাইবার পাত্রে প্রক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; তাহার ফলে কোন্ নব নব আকারের শক্তি ও সমৃদ্ধির সৃষ্টি হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে বলা মানবের ক্ষমতাতীত।

তিনি পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছিলেন যে ভারতের শ্রমজীবিকুলকে শিক্ষা দেওয়া প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই কার্য্য, অপর কাহারও নহে। বিদেশী লোকের দ্বারা বিদেশজাত জ্ঞানের প্রচলন হইলে তাহাতে যে কি অশেষ বিপদের সম্ভাবনা, তাহা কখনও এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার নিকট লুক্কাইত ছিল না। তাঁহার প্রকাশিত পত্রাবলীতে তিনি যে ক্রমাগত ছাত্রগণকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ম্যাজিক লণ্ঠন, ফটোগ্রাফ এবং সঙ্গে সঙ্গে রাসায়ণিক পরীক্ষার উপযোগী কিছু কিছু উপকরণ এই সকলের সাহায্যে গ্রামবাসিগণকে শিক্ষা দিতে বলিতেছেন, তাহার অর্থই এই। আবার, সাধুরা যখন ভিক্ষা উপলক্ষে নিম্নশ্রেণীর লোকদের সহিত মিশেন, সেই সময় তাঁহারা যেন কিছু কিছু ঐহিক শিক্ষাও উহাদিগকে প্রদান করেন, একথাও তিনি বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। এইগুলি নব শিক্ষার সহায়ক ও প্ররোচনা মাত্র হইবে। সেই আসল শিক্ষার জন্য প্রত্যেককে একাকী বা দলবদ্ধভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহ যে, একটী বৃহৎ জাতিকে তাহাদের বোধসীমার বাহিরে একটী চিন্তা ও

জ্ঞানরাজ্য রহিয়াছে, প্রথমে এই কথাটী হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়াই নূতন শিক্ষাকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার প্রথম সোপান। সুতরাং স্বামিজীর এইপ্রকার নানা কল্পনা করা খুবই সঙ্গত হইয়াছিল।

কিন্তু তিনি নিজে যে আচার্য্যোচিত কার্য্যের সূত্রপাত ও মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা অধিকাংশ স্থলেই ক্ষুধার্ত্ত বা পীড়িত-দিগের কোন বিশেষ প্রকারের সেবারূপে প্রকাশ পাইত। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্লেগনিবারণকল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবকদল প্রেরণ করিয়া পল্লী নগরাদির স্বাস্থ্যরক্ষার যে প্রথম বন্দোবস্ত করেন, এবং যাহা অদ্যাবধি তাঁহারা করিয়া আসিতেছেন, তাহা আরম্ভ করিবার উপযোগী অর্থ স্বামিজীই সংগ্রহ করিয়া দেন। তিনি পাশ্চাত্যদেশে যে কয় বৎসর ছিলেন, "ভারতের অন্ত্যজদিগের সেবাকার্য্যে যাহারা ব্রতী হইতে সক্ষম, সর্ব্বদা এমন সেবকগণের সন্ধানে থাকিতেন, এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ব্রাহ্মণশিষ্যদিগকে নীচজাতীয় কলেরারোগী-দিগের সেবা করিতে দেখিয়া তিনি যেরূপ উল্লসিত হইয়াছিলেন, এমন আর কিছুতেই হন নাই। এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "পূর্ব্বে বুদ্ধের সময় যাহা ঘটিয়াছিল আমরা এখন আবার তাহাই দেখিতে পাইতেছি!" তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার প্রেম ও দয়ার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানপ্রতিম, কাশীস্থ ক্ষুদ্র সেবাশ্রমটীর প্রতি এক বিশেষ প্রকার শ্রদ্ধা ও প্রীতি অনুভব করিয়া থাকেন।

কিন্তু তাঁহার হৃদয় অন্যান্য বিষয়েও কম আকৃষ্ট হইত না। এগুলির সহিত তাঁহার তেমন সাক্ষাৎসম্বন্ধ না থাকিলেও ইহারা আরও অধিক পরিমাণে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারই ছিল। যে সকল মাসিক পত্রের সহিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অল্পবিস্তর সম্বন্ধ ছিল, তাহাদের হিতাহিত, এবং মুর্শিদাবাদের অনাথাশ্রম হইতে যে শিল্পশিক্ষা প্রদত্ত হইত তাহা—এগুলি তাঁহার চক্ষে বিশেষ গুরুতর ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় মাসিক পত্রগুলি অনেক সময় একাধারে এক প্রকার জঙ্গম স্কুল, কলেজ, ও বিশ্ববিদ্যালয় বলিলেই চলে। তাহাদের প্রভাব অদ্ভুত। উহারা

একদিকে যেমন ভাব ছড়াইয়া দেয়, অপর দিকে তেমনি লোকের মনোভাব ব্যক্ত করিবার যন্ত্রস্বরূপ হয়। স্বামিজী উহাদের এই শিক্ষা-সংক্রান্ত উপকারিতা যেন সহজসংস্কার-প্রভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণপরিচালিত মাসিকপত্র-গুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এত আগ্রহান্বিত ছিলেন। কোন সাময়িক পত্রের একই সংখ্যায় হয় ত এক পৃষ্ঠায় উচ্চতম অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসমূহ আলোচিত হইয়াছে, আবার অপর এক পৃষ্ঠায় অপেক্ষাকৃত কাঁচা হাতের লেখা নানা ঐহিক বিষয়ের কল্পনা জল্পনা স্থান পাইয়াছে। ইহা হইতে ভারতীয় যুগসন্ধিকালের Transition) সাধারণ লোকের মনের গতি কোন দিকে, তাহারও একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এই আপাত-বিসংবাদী সত্য ব্যাপারটী সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া স্বামিজী নিজেই বলিয়াছিলেন, "হিন্দুরা মনে করে যে, ধ্যানের দ্বারাই জ্ঞান লাভ হইবে ; এটী তাহাদের পক্ষে বেশ খাটে—যখন বিষয়টী গণিত শাস্ত্র হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভূগোলের বেলায়ও তাহারা স্বাভাবিক সংস্কারবশে ঐ উপায় অবলম্বনেই প্রবৃত্ত হয় ; ঐ উপায়ে যে ভূগোলের বিশেষ জ্ঞান লাভ হয় না, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের স্বাভাবিক দয়াপ্রবৃত্তি শুধু যে ভারত-বাসিগণের কথাই চিন্তা করিত, তাহা নহে। যে সকল লোক মনে করে যে, ব্যবসায় যত অধিক মূলধন লইয়া হইবে, ততই তাহা ভাল হইবে,—তিনি তাহাদের পক্ষ গ্রহণ না করিয়া বরং যাহাদের অল্প জমির চাষ আছে, অথবা যাহারা অল্প পুঁজিতে কৃষিজাত দ্রব্যের কারবার করে, সর্ব্বদা তাহাদিগকেই সমর্থন করিতেন। উহা তাঁহার প্রাচ্য ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণের অনুরূপ কার্য্যই হইয়াছিল। তিনি বলিতেন যে, এক্ষণে যে দয়া দাক্ষিণ্যের যুগের অভ্যুদয় হইতেছে, তাহার প্রধান কার্য্যই হইবে—শ্রমজীবী বা "শূদ্র"দিগের সমস্যার সমাধান করা। যখন তিনি পাশ্চাত্যে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন তিনি যে তথাকার আপাতপ্রতীয়মান অধিকারসাম্য দেখিয়া বিশেষ আকৃষ্ট

হইয়াছিলেন, একথা আমরা তাঁহার পত্রাবলী হইতে বুঝিতে পারি। পরে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, তিনি উহার পশ্চাতে যে ধনীদিগের স্বার্থপরতা ও বিশেষাধিকার লাভের জন্য প্রাণপণ সঙ্ঘর্ষ রহিয়াছে তাহা বেশ দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং একজনকে চুপে চুপে বলিয়াওছিলেন যে, এখন পাশ্চাত্য জীবন তাঁহার নিকট "নরক" বলিয়া বোধ হইতেছে। পরিপক্ব বয়সের বহুদর্শিতার ফলে তিনি যেন কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অন্য যে কোন অপেক্ষাকৃত আধুনিক দেশ অপেক্ষা চীন দেশই মানবীয় নীতিজ্ঞানের আদর্শ ধারণার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। তথাপি, সমগ্র জগতের লোকদিগের নিকটই আগামী যুগ যে ইতর সাধারণের বা শূদ্রজাতির কল্যাণের কারণ হইবে, এবিষয়ে তাঁহার অনুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি এক দিন বলিয়াছিলেন, "আমাদিগকে শূদ্রজাতির সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, কিন্তু কি ভয়ঙ্কর সংক্ষোভ, কি ভীষণ আলোড়নের মধ্য দিয়া উহা সঙ্ঘটিত হইবে। তিনি যেন ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করিতে করিতেই কথা বলিতেছিলেন,—তাঁহার কণ্ঠস্বর ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় আরও লোকের কানে বাজিতেছিল; কিন্তু যদিও শ্রোতা উৎসুকভাবে শুনিবার আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তথাপি স্বামিজী নির্ব্বাক হইয়াই রহিলেন, এবং আরও গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

আমার বরাবর বিশ্বাস যে, এইরূপ একটা বিপর্য্যয় ও ভয়ের যুগে জনসাধারণকে পরিচালিত করিবার ও প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্যই আমাদের আচার্য্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে শক্তিপূজার এরূপ এক মহান্ উদ্বোধন ধ্বনিত হইয়াছে। জগন্মাতাই একাধারে এই সকল বিপরীত ভাবের সমন্বয়স্থল। তিনি ভাল মন্দ উভয়ের মধ্য দিয়াই বিকাশ পাইয়া থাকেন। সকল পথের গন্তব্য স্থান তিনিই। স্বামিজী যখনই মাতৃপ্রণাম মন্ত্রগুলি সুরসংযোগে আবৃত্তি করিতেন, তখনই আমরা একটী মাত্র কণ্ঠস্বরের পশ্চাতে বহুযন্ত্রোত্থিত মৃদু নিনাদের ন্যায় ঐতিহাসিক নাটকের এই মহাসমবেত সঙ্গীত শুনিতে পাই। তিনি আবৃত্তি করিতেন—

"যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতীনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ।
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা।
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥"*

তৎপরে যেমন উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতগণের এক সাধারণ আশা ও ভয়ে সম্মিলন, সেনাসমূহের সগর্ব্ব পদসঞ্চার, এবং জাতিনিবহের সংক্ষোভ মানসকর্ণে উচ্চতর ও স্পষ্টতরভাবে ধ্বনিত হইতে লাগিল, অমনি সে সকলকে ছাড়াইয়া এই মহাস্তোত্রের বজ্রনির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইল—

"প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা॥"†
"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"‡

* যিনি সুকৃতিগণের ভবনে স্বয়ং লক্ষ্মী, আবার পাপাত্মাদিগের গৃহে অলক্ষ্মী, যিনি নির্ম্মলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের হৃদয়ে বুদ্ধি, যিনি সাধুগণের শ্রদ্ধা ও সৎকুলজাত ব্যক্তিগণের লজ্জাস্বরূপ, সেই তোমাকে আমরা প্রণাম করিতেছি, হে দেবি। বিশ্বকে প্রতিপালন কর।—চণ্ডী।

† তুমি সকলের গুণত্রয় প্রকাশকারিণী প্রকৃতি, তুমি প্রথর রাত্রি, মরণরূপ রাত্রি এবং দারুণ মোহরাত্রি।—চণ্ডী।

‡ সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে শিবে, হে সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিকারিণি হে শরণাগত-রক্ষয়িত্রি, হে ত্রিনয়নি, গৌরি, নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।—চণ্ডী।

বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন।*

(মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ)

ইতিপূর্ব্বে বিবেকানন্দ সমিতি আমাকে বহুবার বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিষয়টী বড়ই গুরুতর বিশেষতঃ, বৌদ্ধদর্শন এত বহু-বিস্তৃত ও জটিল যে, তাহার সম্যক্ আলোচনা ও পরিচয় প্রদান নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে—বেদান্ত দর্শনের সহিত তাহার তুলনা করিয়া সাধারণ সমক্ষে একটা সিদ্ধান্ত স্থাপন করা একটা বা দুইটা বক্তৃতায় সম্ভব হইবে না ইহা ভাবিয়া এত দিন নিরস্ত ছিলাম। বৌদ্ধদর্শন ও তাহার ইতিহাস এদেশে যতই আলোচিত হউক না কেন, বিষয়টি এখনও এত গভীর ও এত জটিল রহিয়াছে যে, তাহার ঠিক ঠিক আলোচনার সময় এখনও এদেশে আসে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। একটি বহু প্রাচীন বটবৃক্ষের শাখা প্রশাখা নানা দিকে বিস্তৃত হইয়া যেমন মূলকাণ্ডটিকে আবৃত করিয়া ফেলে এবং অনেক দিন পরে কোন্‌টি তাহার আসল মূলকাণ্ড তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়, বৌদ্ধ দর্শনের ইতিহাসও অনেকটা সেইরূপ। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের পর হইতে তৎপ্রচারিত মতের গতিস্থিতি, উন্নতি অবনতি, এত বিচিত্র ও বিস্তৃতভাবে হইয়াছিল যে, অল্প সময়ে তাহা সম্যক্ নিরূপণ করা একান্ত অসম্ভব। ভাসা ভাসা অনুসন্ধানের ফলে এত অল্প সময়ে এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সময় ভারতের তদানীন্তন অবস্থাও বিশেষভাবে জানা আবশ্যক। ভারতবাসীর তাৎকালিক সভ্যতার রীতিনীতি ও আচারপদ্ধতির জ্ঞান থাকিলে আমরা বুঝিব, ভগবান্ বুদ্ধ ভারতের কি কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন।

সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ সভ্য জাতির চিন্তাস্রোত সাধারণতঃ তিনটি

---

* বিগত ১০ই মার্চ্চ তারিখে মেট্রোপলিটন ইনিষ্টিটিউসনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

প্রণালীর মধ্য দিয়া লক্ষিত ও প্রবাহিত হইতে দেখা যায়, যথা—(১) দর্শন (২) সৌন্দর্য্য বুঝিবার শক্তি (৩) নৈতিক অনুরাগ।

(১) বিজ্ঞান (Science) দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। বাহ্য বিষয়ের জ্ঞানের চরম বিকাশ ও পরিণতি বিজ্ঞানেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় (Intellectual aspirations)।

(২) শিল্প, সঙ্গীত, ও সাহিত্য প্রভৃতিতে দেশবাসীর সৌন্দর্য্য বুঝিবার শক্তি বিশেষ পরিস্ফুট হইতে দেখিতে পাওয়া যায় (Æsthetic culture)।

(৩) সর্ব্বশেষে নৈতিক উন্নতিতে অর্থাৎ অনুরাগে—ভক্তিতে (devotional aspirations) প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানব সভ্যতা পূর্ণতা লাভ করে। যে জাতিসমূহে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের তিন বিষযে উন্নতি লক্ষিত না হয়, তাহাদের সভ্যতা অপূর্ণ বুঝিতে হইবে। মোটের উপর একত্রে ঐসবগুলির উল্লেখ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তির সম্যক্ অনুশীলনে ও পূর্ণতালাভেই মানবের ধর্ম্ম পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। বৈশেষিক দর্শনে এই তিনটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই একটি সূত্র লিখিত হইযাছে, যথা—"যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিঃ স ধর্ম্মঃ।" যদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভ করা যায়, তাহারই নাম ধর্ম্ম। বৌদ্ধ সভ্যতার প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য সভ্যতার বিস্তৃতি ও প্রসারণ ঐ সকল মার্গেই হইয়াছিল—তাহার বহু প্রমাণ প্রাচীনতম হিন্দু শাস্ত্রে পাওয়া যায়। আপাততঃ বৌদ্ধদর্শনের বিষয় জানিবার তিনটি উপায় আছে—প্রথম, সংস্কৃত পুরাণ; দ্বিতীয়, পালিগ্রন্থাদি; তৃতীয়, পাশ্চাত্য মনীষিগণের অনুশীলন ও অনুসন্ধিৎসার ফলে আবিষ্কৃত বৌদ্ধবিষয়ক নানা তথ্য। আমরা এই সব গ্রন্থাদি হইতে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি। প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থাদিতেও বৌদ্ধগণের বিষয় উল্লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা বিষ্ণু পুরাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। বিষ্ণু পুরাণে, পদ্ম পুরাণে ও ভাগবতাদি গ্রন্থে সাধারণভাবে ইহাই লিখিত হইয়াছে যে,

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর অসুরদের মোহিত করিবার জন্য শ্রীবুদ্ধ আবির্ভূত হন। আচার্য্য শঙ্করকৃত ভাষ্যে সৌত্রান্তিক, যোগাচার, মাধ্যমিক ও বৈভাসিক প্রভৃতি বৌদ্ধ মতের উল্লেখ দেখা যায়। সংস্কৃত হিন্দু গ্রন্থ হইতে এই জাতীয় কতকগুলি উপাদান সংগৃহীত হইয়া থাকে।

পালি গ্রন্থাদি—বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের দুইশত বৎসর পর মহাদেব নামক জনৈক ভিক্ষু একটি বিরাট বৌদ্ধ ভিক্ষু সভা আহ্বান করিয়া তথাগতের উপদেশসমূহ একত্রিত করেন। তৎকাল-প্রচলিত পালি ভাষায় উহা লিখিত হইয়াছিল। কালের বিচিত্র প্রভাবে বৌদ্ধভিক্ষুগণের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ও মতভেদ বশতঃ সেই সময় হইতে অনেকগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থাপনের সূচনা আরম্ভ হয়। কালে তাহাদের সংখ্যা প্রায় আঠারটি হইয়াছিল। এই আঠারটি অর্থাৎ মহাসাঙ্ঘিক ও স্থেরাবাদ প্রভৃতি মতগুলিকে হীনযান বলে। তাহা ছাড়া পশ্চিম ভারতে যে সকল মত পরে প্রচারিত হয় তাহা মহাযান নামে প্রচলিত হয়।

হীনযান—ঔপনিষদ জ্ঞানমার্গের ন্যায়। হীনযানের উপাসকগণ নিজের কল্যাণের জন্য নিজেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। সংযম ও ত্যাগ প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহের পর প্রত্যেক ব্যক্তিরই আত্মোন্নতি বা নির্ব্বাণ লাভ করা কর্ত্তব্য, তাঁহারা এইরূপ মতই প্রচার করিতেন। মহাযান—প্রথম হইতে সাধক নিজেকে অত্যন্ত দুর্ব্বল ভাবিয়া একজন মহাপুরুষের সাহায্য ব্যতীত স্বীয় কল্যাণ কিছুতেই সাধিত হইতে পারে না, এইরূপ ভাবিয়া অপর কোন সমধিক গুণশালী পুরুষের উপাসনা করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের শিক্ষা অনেকটা ভক্তিবাদের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

বৌদ্ধদর্শনের প্রধান শাখা হীনযান। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাসাঙ্ঘিক মত ও স্থবিরবাদ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম—নির্ব্বাণের জন্য এবং মানবের সকল প্রকার অভ্যুদয়ের জন্য অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভর করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের তাৎকালিক প্রাচীনগ্রন্থ ঋগ্বেদ সংহিতার শেষভাগের মন্ত্রগুলি দেখিয়া সম্যক্ ধারণা হয় যে, আর্য্যঋষিরা প্রশ্ন করিতেছেন, 'ইয়ং বিসৃষ্টিঃ কুতআবভূব'—এই নশ্বর পরিবর্ত্তনশীল প্রপঞ্চ কোথা হইতে আসিল? অবশ্য এই বিকারধর্ম্মী প্রপঞ্চ কখনই নিত্য হইতে পারে না। ইহার মূলে নিশ্চয়ই কোনও অপরিবর্ত্তনীয় অবিকারী বা সৎপদার্থ অবশ্যই বিদ্যমান আছে। ঋষিদিগের এই চিন্তা পরে ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের যুগে ক্রমে অধিকারীভেদে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহার পারম্পর্য্য একটু বিশেষ লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদের অদ্বৈতবাদ বা উপাসনা পদ্ধতি ঋগ্বেদ-সংহিতার কোনঅংশেই পরিস্ফুট-ভাবে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদ-সংহিতায় আরম্ভ হইয়া এই সকল চিন্তাগুলি যেন ক্রমে উপনিষদে আসিয়া অধিকতরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, এইরূপ একটা ক্রমবিকাশ স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্ম-বস্তুর জন্য ঋকে যে অনুসন্ধান প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল, সে সংশয়, প্রশ্ন প্রভৃতি উপনিষদে যেন নিবৃত্ত হইয়া সিদ্ধান্তে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইল বৌদ্ধ-যুগের বহু পূর্ব্বের কথা। ইহার পর আর একটি বিষয় আমরা দেখিতে পাই—এই অনুসন্ধানের যুগে ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মের প্রাধান্যই প্রচার করিতেন। কর্ম্মবাদ বহুপূর্ব্বে ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছিল। পারলৌকিক অভ্যুদয়ের জন্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞাদির নানা প্রকার বর্ণনা ঐ যুগে উল্লিখিত আছে।

দেবতাগণের হোমের জন্য আহবনীয় ও গার্হপত্য, পিতৃগণের জন্য দক্ষিণাগ্নি, পাকাদি কার্য্যের জন্য আবসথ্য ও সভাগৃহের হিমাদি নিবারণের জন্য সভ্য অগ্নি ব্যবহৃত হইত। এই অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন কুণ্ডে স্থাপিত হইত। ব্রাহ্মণগণই এই সমস্ত অগ্নি কিরূপে প্রজ্বালিত করিতে হয়, তাহা দ্বারা কিরূপে ইহলোকে সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয় ও পরলোকে স্বর্গাদি প্রাপ্তি হয়, তাহার বিস্তৃতভাবে ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপে কর্ম্মকাণ্ডের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা নরপতি হইতে সামান্য প্রজার উপর পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক ভাব

ও আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কল্পসূত্রের দ্বারা আরও প্রকটিত হয় যে, এই ব্রাহ্মণগণই বৈরাগ্যের অধিকারী ছিলেন—ত্যাগ, শান্তি, আত্মবিচার ও চিরনিবৃত্তির পথে চলিবার অধিকারী একমাত্র ব্রাহ্মণগণই ছিলেন এবং ব্রাহ্মণেতর সমস্ত জাতি কর্ম্মকাণ্ড অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণের নিদেশানুযায়ী চলিত। কিন্তু বহুদিন ধরিয়া এইরূপ একটি জাতির আধ্যাত্মিক প্রাধান্য স্বীকার করিয়া চলা মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধ। একারণ একটা পরিবর্ত্তন অবশম্ভাবী হইয়া উঠিল এবং সর্ব্বত্র অধ্যাত্ম-রাজ্যের একটা অনুসন্ধিৎসার ভাব দেখা গেল। বৌদ্ধ প্রাধান্যের পূর্ব্বে এইরূপ অপর কয়েকটী সম্প্রদায়ের কথা শুনা যায়। সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটীর নাম জৈন। অনেকেই ইহাকে বেদবাহ্য পৃথক্ মত বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। জৈনেরা সকলের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তির বার্ত্তা প্রচারের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। অচেলক এই জৈন সম্প্রদায়ের একটি শাখা। তাঁহারা বস্ত্রাদিকে দেহের বন্ধন বিবেচনা করিয়া তাহাও ত্যাগ করিতে বলিতেন; তাঁহারাই এখন দিগম্বর জৈন বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকেন। আজীবক সম্প্রদায়, মংখালিয়া, গোখালী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বেদবাহ্য সম্প্রদায়ের নানা শাখাও দেশমধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ মতও প্রচার করিত যে, মানবের কোন কর্ত্তব্য নাই অকর্ত্তব্যও নাই, ধর্ম্ম অধর্ম্ম কিছুই নাই। প্রকৃতিশক্তি মানবকে যেমন চালাইবে সে সেইরূপই চলিবে। বেদ-বিরুদ্ধ এইরূপ নানাপ্রকার মতবাদ জিন প্রভৃতি তীর্থঙ্কর দ্বারা ভারতে বৌদ্ধমত প্রচারের পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। এইরূপে ভারতে স্বাধীন মতবাদের প্রচারের প্রভাবে অনেক ভ্রান্ত মতও সত্যের নামে প্রচারিত হইয়াছিল। অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায়—সত্যের আংশিক আভাস মাত্রই ইহা দ্বারা পাওয়া যাইত। ক্রমে এই সকল ধর্ম্মের অনেক অবনতি ও হীনাবস্থা ঘটিল। মীমাংসাবার্ত্তিকে কুমারিল-ভট্ট বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রসঙ্গে অতি কঠোর উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'যথা হি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধঃ'। আজ কাল কিন্তু আর সে নিন্দার যুগ নাই। ঐতিহাসিক সত্যের

প্রতিষ্ঠার প্রভাবে এখন আর ঐরূপ নিন্দা করা চলে না। ভারতের সর্ব্বপ্রধান অলঙ্কার আধ্যাত্মিকতার পূর্ণ বিকাশ যে মহাত্মার জীবনে প্রকটিত হইয়াছিল তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, শিক্ষা ও নীতিকে উপেক্ষা করিলে আমরাই সভ্য সমাজের সমক্ষে একদেশদর্শী বলিয়া ঘৃণিত হইব। সৌভাগ্যক্রমে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের জ্ঞান ভাণ্ডার বেদান্ত দর্শনের সহিত বৌদ্ধ দর্শনের মহমিলনের যুগ আসিয়াছে। এতদুভয়ের মিল কোথায় তাহা বিচার করিযা ব্যক্তিগত ও ব্যক্তির সমষ্টি সমাজগত উন্নতি হওয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছে।

পরদুঃখে কাতর হইযা এবং সেই দুঃখের নিরাকরণ কিরূপে হয় সেই উপায়ের উদ্ভাবনের জন্য বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রকাব বিলাস ও ঐশ্বর্য্য বর্জ্জন করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরার্থে এইরূপ অসাধারণ আত্মত্যাগ ভারতে ইহার পূর্ব্বে আব দেখা যায় নাই।

প্রথমে নিজের মঙ্গল বা ইষ্ট কিরূপে হইবে তাহা অপরের উপদেশ দ্বারা পরিচালিত না হইযা স্বীয় বিবেকদ্বারা বুঝিব—অন্য কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিব না—নিজের মুক্তি নিজে সাধন করিব সুতরাং বিবেক কিসে নির্ম্মল ও প্রখর হয় তাহার চেষ্টা করা মানবের উচিত—ইহাই বুদ্ধদেবের প্রধান উপদেশ।

বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে কোন অবতার পুরুষের জীবনে এই ভূতদয়ার এমন আশ্চর্য্য বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। জীবের দুঃখ নিবারণের জন্য নৈরঞ্জনা তীরে অনবরত সাতদিন সাতরাত (মতান্তরে অধিক সময়) চিন্তার পর যখন নির্ব্বাণের প্রশস্ত পথ তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত হইল অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া যখন তিনি পরাশান্তি লাভ করিলেন, তখন সেই আনন্দে বিভোর হইয়াও তিনি জীবদুঃখ ভুলেন নাই। মার্জ্জিত বিবেকের বাণী তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। জীবকুল সংসারতাপে দগ্ধ হইয়া নিরন্তর দুঃখ-প্রপীড়িত হইতেছে, এই অমৃতের—কল্যাণের পথ তাহাদিগকেও দেখাও—বুদ্ধত্ব লাভ করিবার উপায় তাহাদিগকেও শুনাও। মুক্তি

নিজের শান্তির জন্য নয়। সংসারে প্রবেশ করিয়া ত্রিতাপদগ্ধ নর নারীর কল্যাণ সাধন কর। এই বিবেকবাণীর অনুসরণে তিনি ৪২ বৎসর কাল ভারতের সর্ব্বত্র মুক্তির বার্ত্তা প্রচার করিবার জন্য প্রাণপাতী পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

তাঁহারই সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ সেবাব্রতধারী ভিক্ষুসম্প্রদায় ভারতের সর্ব্বত্র এবং ভারতবহির্ভূত নানাদেশে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই অমৃতময়ী বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। প্রাচীনতম যুগে হিন্দু সন্ন্যাসিগণ আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টায় নিঃসঙ্গ হইয়া তপোবনে ও বিজন প্রদেশে শুচি হইয়া একাকী সংসারের বহুদূরে বাস করিতেন। ত্যাগ, সংযম বা সমাধির সমস্ত ফল নিজেরাই পৃথক্‌ভাবে ভোগ করিতেন। জ্ঞানলাভেচ্ছু হইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত না হইলে এই মুক্তির বার্ত্তা প্রায় তাঁহারা কাহাকেও বলিতেন না। অপর পক্ষে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ অসংসারী হইয়াও গৃহস্থের নিকট প্রাণ ধারণোপযোগী ভিক্ষালাভের ব্যপদেশে নরনারীর, এমন কি, পশুপক্ষী প্রভৃতি সমস্ত জীবকুলের কল্যাণসাধনে সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন। তথাগতের শিক্ষা ছিল, ব্যাধি দুই প্রকার—দৈহিক এবং মানসিক। স্থূল দেহের ব্যাধির উপশমের জন্য বৈদ্যগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা ব্যবস্থা এবং আরোগ্য বিধান করিয়া থাকেন কিন্তু সূক্ষ্ম মানব মনের কাম ক্রোধাদিরূপ বৈকল্য হইতে মনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে হইলে সংযম, ত্যাগ ও নিবৃত্তিমার্গের শিক্ষা বিশেষ মঙ্গলপ্রদ। গৃহস্থের সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য নানা উপায়ে সাহায্য করিবার জন্য প্রথম ভাবনা সন্ন্যাসিকুলের মধ্যে শ্রীবুদ্ধদেব হইতেই ভারতে প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সন্ন্যাসিসঙ্ঘ স্থাপনের শিক্ষা ও প্রণালীবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার উপদেশ তদীয় শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরে বহুদূরে প্রচারিত হইয়াছিল। বর্ণাশ্রমবিভক্ত প্রাচীন আর্য্য সমাজে, তথাগতের অদ্ভুত হৃদয়বত্তার ছায়া পড়িয়া আর্য্য সভ্যতাকে আরও গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল—বর্ত্তমানকালে তাহা অস্বীকার করা চলে না। ইহার নিদর্শন প্রাচীন ভারতের

শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতিতে এখনও প্রচুর ভাবে দেখা যায়।

প্রাচীন ইতিহাসাদিতে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের তিনশত বৎসর পরে রাজা অশোকের চেষ্টায় অমিতাভের নীতিমূলক উপদেশ একত্রিত করা হইয়াছিল। তিনি ভারতের নানাস্থানে বৌদ্ধ বিহার স্থাপন ও ভারতের নানাদেশে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিতেন।

এই সকল বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণের অসাধারণ আত্মত্যাগ ও অলৌকিক নিঃস্বার্থপরতা পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য জাতির মধ্যে অতি অল্পই দেখা যায়। কেন আত্মরক্ষা করিব? পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণিগণের কল্যাণসাধনের সুযোগ লাভ করিব, এই হেতুই আমি আত্মরক্ষা করিব এইরূপ হিতৈষণা প্রণোদিত হইয়া বৌদ্ধভিক্ষুগণ আত্মরক্ষায় যত্নশীল হইতেন—প্রাণ ধারণের অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁহারা রাখিতেন না। বিপন্ন বা অন্য কর্ত্তৃক পীড়িত হইলেও তাঁহারা হিংসা করিতেন না। স্বর্গ বা ইন্দ্রত্বাদি প্রাপ্তির জন্য কোন কার্য্যই সকামভাবে তাঁহারা করিতেন না। ভিক্ষুজীবনের চরম উদ্দেশ্য অপর প্রাণীর ব্যথা নিবারণ করা। এই অদ্ভুত হৃদয়বত্তা ও করুণার ভাব খ্রীষ্ট জন্মিবার বহু পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণ জগতের সমক্ষে কেবল প্রচার দ্বারা নয়, তাঁহাদের অদ্ভুত ত্যাগশীল জীবনের দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন। সাধারণতঃ ইহাই দেখা যায় যে, তোমার মঙ্গল করিলে তুমি স্বভাবতঃই তাহার প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইবে। কৃতজ্ঞতা মানবপ্রকৃতির একটি স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি। উপকারীর নিকট বাধ্য হওয়ায় নূতনত্ব আর কি আছে কিন্তু তুমি যদি অপকারীর প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইতে পার—যদি লাঞ্ছিত পীড়িত হইয়াও অত্যাচারীর উপকার করিতে সমর্থ হও, তবেই বুঝিব তুমি তথাগতের উপদেশ ধারণ করিতে পারিয়াছ। ভিক্ষুদিগের শিক্ষার ইহাই সার মর্ম্ম।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের জীবন অপূর্ব্ব ত্যাগের আদর্শে

নিয়ন্ত্রিত ছিল। তাঁহাদিগের জাতীয় জীবন বর্ত্তমান কালে নানা কারণে কোন কোন অংশে অবোধ্য হইলেও স্বার্থত্যাগে তাঁহারা যে জগতে অতুলনীয় ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। পরার্থে আত্মোৎসর্গ এবং অপরের জন্য নিজের মুক্তি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা আমরা শ্রীবুদ্ধদেব হইতে শিক্ষা পাইয়াছি। ভিক্ষুপ্রধান অসঙ্গ, নাগার্জ্জুন ও বসুমিত্রের আত্মত্যাগের কাহিনী প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের বহু তথ্যপূর্ণ বৌদ্ধগ্রন্থাবলীতে লক্ষিত হইয়া থাকে। সঙ্কীর্ণতা এবং বিদ্বেষের যুগ ভারত হইতে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করুক। এই উদার যুগে আমাদিগের পূজ্য পিতৃপুরুষগণের সম্পত্তি তাঁহাদিগের অমূল্য উপদেশরাজি বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না—অপরের বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যাহাতে আমরা ভবিষ্যতে আরও মহান্ ও গৌরবান্বিত হইতে পারি তাহার জন্য সতত তৎপর ও যত্নশীল হইতে হইবে।

একটী প্রশ্ন।

(জনৈক ব্রহ্মচারী)

যাঁরা একটু আধটু ধর্ম্মালোচনা করেছেন তাঁরাই দেখেছেন যে, ধর্ম্মবিষয়ক যে সকল প্রশ্ন মনে উঠে তাদের মধ্যে কতকগুলির সহজেই যুক্তিতর্কের দ্বারা মীমাংসা হয়ে যায়; কিন্তু আর কতকগুলি প্রশ্ন আছে যে গুলির মীমাংসা কর্‌তে গেলে ঘুরে ফিরে একটী প্রশ্নেতে এসে দাঁড়ায়—সেটী হচ্চে, এক কি করে বহু হলেন। এই ছোট্ট প্রশ্নটীর আর জবাব খুঁজে পাওয়া যায় না। কাউকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন—বাপু ও নিয়ে তোমার অত মাথাব্যথা কেন? সৃষ্টি কেন হল?—এক কি ক'রে বহু হলেন? এ সব কূটকচালে প্রশ্নে

তোমার লাভ কি? আম বাগানে ঢুকে, বাগানে কত গাছ আছে, কার বাগান কত খরচ পড়েছে—এ সব প্রশ্ন করে তোমার লাভ কি? তুমি আম পাড় আর খাও। অথবা আরও বেশী বিরক্ত করলে হয়ত বল্‌বেন, "বাপু হে, যে সভায় সৃষ্টির কথা ঠিক হয় আমি সে সভায় উপস্থিত ছিলাম না।" কতকগুলি লোক এতে সন্তুষ্ট হতে পারে বটে কিন্তু সকলে এ উত্তরে বেশ তৃপ্ত হয় না। তাই তিনি এক থাক উপরে উঠে বল্‌লেন—আচ্ছা, উত্তর দেবার আগে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এক যে বাস্তবিকই বহু হয়েছেন তার প্রমাণ কি? সংসারে আমরা এক দেখ্‌তে পাচ্চি না; বহু দেখ্‌ছি। বহুর মধ্যে যে এক রয়েছেন এটা আমরা শাস্ত্র বা সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষদের কাছ থেকে জান্‌ছি মাত্র। সুতরাং তাঁদের কথায় সত্যাসত্য নির্ণয় কর্‌তে হলে তাঁদের প্রদর্শিত রাস্তা দিয়ে চল্‌তে হবে। তাঁরা ত বল্‌ছেন না যে আমরাই কেবল দেখ্‌ছি—তোমরা দেখ্‌তে পাবে না। তাঁরা বল্‌ছেন, এখন তোমরা স্বপ্ন দেখ্‌ছ। যে দিন স্বপ্ন ভাঙ্গবে-যে দিন এই সুদীর্ঘ নিদ্রা থেকে জেগে উঠ্‌বে সেই দিন বুঝ্‌বে যে, বাস্তবিক বহু নেই—বহু কখনও ছিল না—এক কখনও বহু হয় নাই। বহুজ্ঞান স্বপ্ন—ভ্রম মাত্র।

প্রশ্ন—স্বপ্ন যে মিথ্যা তার প্রমাণ কি?

উত্তর—প্রমাণ এই যে, স্বপ্নদৃশ্য পদার্থগুলো বাইরে থাকে না, দেহের মধ্যেই থাকে। কিন্তু দেহের মধ্যের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। সুতরাং স্বপ্নে যে হাতী, পাহাড়, সমুদ্র প্রভৃতি দেখা যায় তা এতটুকু শরীরের মধ্যে থাকতেই পাবে না। কাজে কাজেই সেগুলো মিথ্যা—মনের কল্পনামাত্র।

প্রঃ—স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ যে বাইরে থাকে না, তার প্রমাণ কি?

উঃ—মনে কর একজন ছাত্র পরীক্ষা দেবে। সে একদিন রাত্রে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌লে যে, সে পরীক্ষা দিতে গিয়েছে। আরও শত শত পরিচিত অপরিচিত ছেলেরা এসেছে। ঘণ্টা বাজ্‌ল—সকলে নিজের নিজের জায়গায় বস্‌ল—প্রশ্নপত্র এলো—উত্তর

লেখা চল্‌তে লাগ্‌লো ইত্যাদি, ইত্যাদি। ছেলেটী যখন ঘুম থেকে উঠ্‌ল, তখন সে বুঝ্‌তে পার্‌ল যে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। বাস্তবিক তার স্থূল শরীর বা সূক্ষ্মশরীর কোথাও যায় নাই। পরীক্ষা-ঘটিত ব্যাপারগুলি আদৌ ঘটে নাই। যে পরীক্ষার্থী, তার মনে পরীক্ষার চিন্তা খুবই স্বাভাবিক—নিদ্রাবস্থায় মনে সেই সমস্ত চিন্তা উঠেছে মাত্র। তার মনই স্বপ্নাবস্থায় সেই সেই আকার ধারণ করেছে। সুতরাং স্বপ্নদৃশ্য ব্যাপার যে বাইরে থাকে না তা একটু চিন্তা কর্‌লেই অনায়াসে বুঝ্‌তে পারা যায়।

প্রঃ—আচ্ছা, স্বীকার কর্‌লাম যে স্বপ্নটা মিথ্যা—মনের কল্পনা-মাত্র। কিন্তু জাগ্রদ্দশাটাও যে স্বপ্নের মত মিথ্যা তা কেমন করে বলি?

উঃ—স্বপ্নে আর জাগ্রতে তফাৎ কি? স্বপ্নাবস্থায় যেমন তুমি এবং তোমার জগৎ থাকে জাগ্রদবস্থায়ও ঠিক তাই। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখ্‌ছ ততক্ষণ স্বপ্নের তুমি ও তোমার জগৎই সত্য বলে মনে হয়—এ জগতের কথা একেবারে ভুল হয়ে যায়। আবার যখন জেগে উঠ্‌লে তখন এ জগৎটাই সত্য বলে মনে হয়—স্বপ্নটা মিথ্যা বলে ধারণা হয়। কিন্তু এটাও যে একটা স্বপ্ন নয় তা কে বল্‌লে? দেখ, গ্রাহ্য গ্রাহক ভাব দুটোতেই সমান। স্বপ্নে আমরা যা দেখি তার মাথা নেই মুণ্ডু নেই অথচ স্বপ্নাবস্থায় সেগুলো কেমন কার্য্যকারণ ভাবে বদ্ধ (relevent) বলে মনে হয়! সেই-রূপ জাগ্রদবস্থায় আমরা যা কিছু দেখছি সমস্তই বেশ সুশৃঙ্খল, অর্থযুক্ত ও কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে জড়িত বলে বোধ হচ্ছে বটে কিন্তু এ আমাদের বুদ্ধি অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন রয়েছে বলে। যাঁদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়েছে—তাঁরা এ জগতেও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় আদৌ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ দেখ্‌তে পান না। স্বপ্নাবস্থার ন্যায় এখানেও সমস্তই বিশৃঙ্খল। বীজ একটী সসীম জিনিষ-বৃক্ষও একটী সসীম জিনিষ। সুতরাং বীজ ও বৃক্ষের সহযোগে একটী অসীম প্রবাহ কখনও হতে পারে না। কতকগুলো সসীম রাশি যোগ করে যে কখনও একটী

অসীম শ্রেণী (Infinite series) হতে পারে না, আধুনিক গণিত-শাস্ত্রই তার প্রমাণ। সুতরাং জগৎ যে প্রবাহাকারে নিত্য—এটা একটা মস্ত ভুল। অতএব সাদৃশ্য (Analogy) ও বিচার উভয় দিক্ থেকেই জগৎটা যে স্বপ্নতুল্য মিথ্যা তা দেখা গেল।

আর এক দিক্ থেকে দেখা যাক। যে জিনিষটা কিছুক্ষণ আগে ছিল না এবং কিছুক্ষণ পরে থাক্‌বে না—সেটা বর্ত্তমানেও নেই। যেমন মরীচিকা। মরুভূমিতে যখন জলভ্রম হয় তখনও জল নেই এবং ভ্রম হবার আগে বা ভ্রম দূর হবার পরে ত থাকেই না। সেই-রূপ সমুদয় জাগ্রদ্দৃশ্য পদার্থ আদি ও অন্তবিশিষ্ট—দেশ-কাল-নিমিত্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং বর্ত্তমানে তাদের যে অস্তিত্ব বোধ হচ্ছে সেটাও ঐ মরীচিকার মত ভ্রমমাত্র।

প্রঃ—স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রৎটাও মিথ্যা বলা হয়েছে, কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ, জাগ্রৎ অবস্থায় ক্ষিধে পেলে খেলেই তা দূর হয় কিন্তু স্বপ্নে তা হয় না।

উঃ—স্বপ্নে এক পেট খেলেও ঘুম ভাঙ্গলে যেমন ক্ষিধে তেমনি থাকে একথা সত্য বটে। কিন্তু জেগে এক পেট খেয়েও স্বপ্নাবস্থা-মাত্রও ত কেউ কেউ আপনাকে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত মনে করে। সুতরাং, স্বপ্নটা যে মিথ্যা সে বিষয়ে যেমন আমরা সন্দেহ করি না, সেইরূপ জাগ্রৎটাও যে মিথ্যা সে বিষয়ে সন্দেহ করা উচিত নয়। দুটোই এক রকমের মিথ্যা।

জাগ্রদবস্থার সঙ্গে স্বপ্নাবস্থার অদ্ভুত মিল রয়েছে। স্বপ্নে আমাদের দুরকমের অনুভূতি হয়—ইন্দ্রিয়দ্বারা বহির্বিষয়ের অনুভূতি এবং মনে মনে কল্পনাপ্রসূত অনুভূতি। জাগ্রদবস্থায়ও আমাদের ঠিক ঐ দুই রকমের অনুভূতি হয় চক্ষু কর্ণাদি দ্বারা বহির্জ্জগতের রূপ, রস, গন্ধাদির অনুভূতি এবং মনে মনে কল্পনা দ্বারা অনুভূতি। দুই অবস্থাতেই আমরা ইন্দ্রিয়ানুভূতিকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি—আর কল্পনাজাত অনুভূতিকে মিথ্যা বলে থাকি। কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে গেলে যেমন দেখ্‌তে পাই যে, স্বপ্নাবস্থার দুরকম অনুভূতিই সম্পূর্ণ মিথ্যা,

সেই রকম জাগ্রদবস্থার উভয় প্রকার অনুভূতিও সর্ব্বৈব মিথ্যা। তবুও আমরা জাগ্রৎটাকে ভুল বল্‌তে চাই না। উহার মিথ্যাত্ব চিন্তা কর্‌তে চাই না। তার কারণ আমরা জগৎকে আঁকড়ে ধরে থাক্‌তে চাই—উহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দ সম্ভোগ কর্‌তে চাই। তাই আমরা মায়াবাদের নাম শুন্‌লে চমকে উঠি 'নেতি নেতি' মার্গ শুষ্ক জ্ঞানীর পথ ইত্যাদি বলে ঠাট্টা করি। তাই আমরা ভোগের মধ্য দিয়ে ত্যাগ কর্‌তে চাই।

"ভাঙ্গ বীণা, প্রেমসুধাপান, দূর কর নারীমায়া" দূর কর দুর্ব্বলতা। সাহসের সহিত বল এ জগৎ স্বপ্নবৎ। পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা এই সত্য ধারণা কর্‌বার চেষ্টা কর। এই রকম কর্‌তে কর্‌তে এক দিন নিশ্চয়ই ঘুম ভাঙ্গ্‌বে—তোমার স্বপ্ন ছুটে যাবে।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

গ্রীক দর্শন।] [এরিষ্টটল।

শ্রীকানাইলাল পাল এম, এ, বি, এল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, প্লেটোর বিজ্ঞানবাদ বা ভাববাদ (Idealism) ও এরিষ্টটলের বাস্তববাদ (Realism) মূলতঃ একই। মূল সত্য প্রমাণের বিষয় হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে সেটীকে আর মূল বলা যায় না, সেটী সাধ্য বস্তু হইয়া পড়ে। সাধ্য হইয়া পড়িলে তাহার সিদ্ধি অপরের উপর নির্ভর করিবে এবং যেটীর উপর নির্ভর করিবে তাহাই সে স্থলে মূল পদবাচ্য হইবে। এরিষ্টটল ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। সে কথাও আমরা ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছি। সুতরাং মূলতঃ উভয়ের

মধ্যে (এরিষ্টটল ও প্লেটোর মধ্যে) কোন অনৈক্য নাই—একথা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মূলসত্য ব্যাপকতম পদার্থ হওয়া চাই, নচেৎ সেটী আবার মূল পদবাচ্য হইবে না। নিগমন মূলক যুক্তির প্রয়োগে ব্যাপকতর, ব্যাপক ও ব্যাপ্য যাবতীয় পদার্থের সম্বন্ধ ও পরিচয় পাওয়া যায়। নিগমন-মূলক যুক্তির প্রণালী কিরূপ, সে কথা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পাঠকবর্গ হয়ত এইখানে প্রশ্ন করিতে পারেন, মূল সত্য যদি স্বতঃসিদ্ধ বা প্রমাণের বিষয় নয় তবে ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? এবং পাশ্চাত্য ন্যায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া এরিষ্টটলই বা চির-স্মরণীয় হইয়া আছেন কিরূপে? কথাটা প্রণিধানযোগ্য। উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে, মূল সত্য প্রমাণগম্য নয় একথা ন্যায়-শাস্ত্রই বলিতে সক্ষম। যিনি বিশুদ্ধ যুক্তিপ্রণালী অবলম্বনে বিচার করিতে সক্ষম, তিনিই শেষে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা আমাদের সর্ব্ব প্রথমে একান্ত প্রয়োজন। তাই দেখি, এরিষ্টটল ইহাকে তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ গণ্য করিয়া প্রথমেই ইহার আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। তত্ত্ব-জ্ঞান সকল জ্ঞানের মূল, সুতরাং যাবতীয় বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত হইতে হইলে প্রথমেই ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতে হইবে।

বিচারপ্রণালী নিয়মসঙ্গত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। সক্রেটীসের পূর্ব্বে পাশ্চাত্য জগতে কেহ এই নিয়মের মর্য্যাদা সম্যক্ অবগত ছিলেন কি না সন্দেহ। সন্দেহই আমাদিগকে প্রথমতঃ দার্শনিক চিন্তায় ব্রতী করে। যাহার মনে সন্দেহ উদয় হইলে সেটী দূর না করিয়া এড়াইয়া যাইতে দেয় তাহার পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। কোন একটী বস্তু দেখিলাম, সেটা কি সম্যক্ জানা থাকিলে কোন প্রশ্নের বা সন্দেহের কারণ থাকে না। কিন্তু আমি যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি বা অনুভব করিতেছি, তাহাই যে যথার্থ জ্ঞান তাহা

কে বলিল? যে বস্তু প্রকৃত যাহা, সেটীকে তৎরূপে জানাই সত্য জ্ঞান, সেটীকে অন্যরূপে জানা মিথ্যা জ্ঞান বা ভ্রান্তি। রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানা সত্য, রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা মিথ্যা। জ্ঞান ও বস্তুর সম্বন্ধ লইয়াই 'সত্য' 'মিথ্যা' পদ প্রযুক্ত হয়। যাহা সৎ তাহারই অস্তিত্ব জ্ঞান অথবা যাহা সৎ নয় তাহার অনস্তিত্ব জ্ঞানকে সত্যজ্ঞান এবং যাহা সৎ তাহার অনস্তিত্ব জ্ঞান অথবা যাহা সৎ নয় তাহার অস্তিত্ব জ্ঞানকে মিথ্যা জ্ঞান বলা হয় (Affirming non-existence of the existent or existence of the non-existent is falsehood but affirming existence of the existent and non-existence of the non-existent is truth)। সম্মুখে রজ্জু রহিয়াছে, রজ্জু সৎ - সেই সৎ বস্তু রজ্জুকে দেখিয়া তাহারই অস্তিত্ব জানাই সত্য জ্ঞান। সম্মুখে রজ্জু রহিয়াছে, রজ্জু সৎ—তাহার অনস্তিত্ব অর্থাৎ সর্পের অস্তিত্ব জানা মিথ্যা জ্ঞান। এরিষ্টটলের উক্তি অনুসারে এই বাস্তব ও চিন্তার সম্বন্ধ বিচারই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় হওয়ায় সেই কার্য্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া যাউক।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বস্তু মাত্রেরই একটা না একটী সংজ্ঞা আছে; সেই সংজ্ঞা আবার সেই বস্তুর ধর্ম্ম বা গুণকে লক্ষ্য করিয়া প্রদত্ত হয়। সংজ্ঞা বলিলেই কতকগুলি, অন্ততঃ একটী গুণকে বুঝাইবেই বুঝাইবে। যে স্থলে কতকগুলি গুণকে বুঝায়, সেখানেও তাহাদের মধ্যে একটীরই বৈশিষ্ট্য বা বিশিষ্টতাকে লক্ষ্য করে। এই যে গুণ বা ধর্ম্ম এগুলি আমাদের চিন্তার বিষয় এবং তৎসাহায্যে আমরা বস্তুর সত্তা অর্থাৎ বাস্তবিক সেটী কি, ইহাই আমরা স্থির করিতে অগ্রসর হই। এইবার দেখা যাউক, কোন একটী বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইলে কি ভাবে আমরা সেটীকে গ্রহণ করি। প্রথমেই সেটী একটী 'বস্তু' (Substance) বা 'দ্রব্য'—ইহাই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। তার পর সেটীর 'সংখ্যা' (Quantity) বা 'পরিমাণ' আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। তার পর তাহার 'গুণের' (Quality)

পরিচয় প্রাপ্ত হই। 'সংখ্যা' বা 'পরিমাণ' জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 'সম্বন্ধ' (Relation) জ্ঞানের উদয় হয়। যদি কাহারও 'সংখ্যা' জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 'সম্বন্ধ' জ্ঞানের উদয় না হয় তবে 'গুণ' জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয় হওযা অনিবার্য্য। 'দেশ' (Space) ও 'কালের' (Time) সম্বন্ধ লইযাই 'সম্বন্ধ'; পার্থিব বস্তু মাত্রেই 'দেশ' ও 'কালে' বর্ত্তমান—এমন কোন বস্তু নাই, যেটী কোন 'কালে' বা কোন 'দেশে' অবর্ত্তমান। বর্ত্তমান বলিলে 'কিরূপ ভাবে বর্ত্তমান' (Position) একথা তাহার পরই মনে হয। 'দেশ' ও 'কালের' সহিত 'দ্রব্যের' সম্বন্ধ লইযা বস্তুর 'অবস্থান' (Position) নির্দ্দিষ্ট হয। অপর পক্ষে 'গুণের' সহিত 'দ্রব্যের' সম্বন্ধ লইযা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বা 'অধিকার' (Possession) জ্ঞান জন্মে। এবং ঐ কার্য্যকারণের সম্বন্ধ যাহা দ্বারা সংঘটিত হয়, তাহাকে 'ক্রিযা' (Action) বলে, এবং সেই 'ক্রিযা' যাহার উপর সংঘটিত হয সেই বস্তু ক্রিয়ার 'আশ্রয়' (Position) বলিযা গণ্য হয। 'অধিকার' (Possession), 'ক্রিয়া' (Action) ও 'আশ্রয' (Position) এই তিনটীর পরিচয় আর একটু বিশদভাবে দেওয়া প্রযোজন। অগ্নিতে দাহিকা শক্তি বর্ত্তমান, অগ্নি দাহিকা শক্তির 'অধিকারী', সুতরাং দাহিকা শক্তি অগ্নির 'অধিকারিত্বে' (Possession) বা অধিকারে। এই 'অধিকার' জ্ঞান 'দ্রব্য' ও তাহার 'গুণের' সম্বন্ধ ছাড়া কখনও উদয় হয় না। অগ্নি দহন করে; দহন-কার্য্য অগ্নির 'ক্রিযা'-বিশেষ (Action); যদি কল্পনা করা যায—অগ্নি আছে, আর কিছুই নাই, তাহা হইলে অগ্নির দহনরূপ কার্য্যের বা ক্রিযার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। অগ্নি ও অগ্নি ছাড়া অপর একটী বস্তুর সম্বন্ধ হইতে 'ক্রিয়ার' প্রকাশ হয। এস্থলে দাহিকা শক্তি যেমন অগ্নিতে বর্ত্তমান তেমনি অপর বস্তুতে দাহ্য হইবার শক্তি বা গুণও বর্ত্তমান থাকা চাই। দাহিকা শক্তির বিকাশ হইতে হইলে অগ্নি ও অগ্নি ভিন্ন অপর বস্তু থাকা চাই। ইহাই হইল ক্রিয়ার নিয়ম। অগ্নি পুড়াইতেছে, কাষ্ঠ পুড়িতেছে—একটী 'বিষয়' অপরটী 'আশ্রয়'। একটী

'অধিকারী' অপরটী 'আশ্রয়ী'। 'গুণের' ব্যক্তাবস্থা 'ক্রিয়া'; 'ক্রিয়া', 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' অবলম্বন না করিয়া প্রকাশ পাইতে পারে না।

কোন একটী বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর হইলে আমরা চিন্তাবলে তাহাকে এই দশটী প্রকরণ-সাহায্যে গ্রহণ করি।

ভাষার সাহায্যে আমরা মনোভাব প্রকাশ করি, সুতরাং ভাষার সহিত চিন্তার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকা দরকার। যে ভাষায় আমি যে ভাব প্রকাশ করি, অপরেও যদি তাহাই করে, তবেই ভাষার সার্থকতা। কর্ত্তৃকারক, 'দ্রব্যকে' বুঝায়; 'পরিমাণ', 'গুণ' ও 'সম্বন্ধ', বিশেষণের সাহায্যে প্রকাশিত হয়, ক্রিয়ার বিশেষণ, 'দেশ' ও 'কালকে' জ্ঞাপন করে। ক্রিয়া ও ক্রিয়া সম্বন্ধমূলক 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' ক্রিয়া দ্বারা ব্যক্ত হয়।

ক্যাটিগরিস্ De. Categories পুস্তকে দশবিধ প্রকরণের উল্লেখ আছে, কিন্তু পরবর্ত্তী পুস্তকে 'অবস্থান' (Position) ও 'অধিকারিত্ব' (Possession) এই দুইটীকে অপরের অন্তর্গত করিয়া লওয়া হইয়াছে। 'দেশ' ও 'কাল' দ্বারা 'অবস্থানের' জ্ঞান জন্মায়, সুতরাং 'অবস্থানের' পৃথক একটী স্থান প্রদান করার প্রযোজন থাকে না। 'গুণ', 'গুণীতে' বা 'দ্রব্যে' বর্ত্তমান, 'দ্রব্য', 'গুণের' 'অধিকারী'; 'গুণ' বলিতেই এই 'অধিকারিত্বকে' বুঝায়; সেই কারণ এই 'অধিকারিত্ব'ও শেষে প্রকরণশ্রেণী হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

বুঝা গেল (১) 'দ্রব্য' (Substance) (২) 'দেশে' (Space) ও (৩) 'কালে' (Time) বর্ত্তমান; 'দ্রব্য' মাত্রেই (৪) 'গুণ' (Quality) সম্বলিত এবং তাহার (৫) 'পরিমাণ' (Quantity) আছে এবং সেই 'দ্রব্যের' (৬) 'ক্রিয়া' কখনও অব্যক্ত কখনও ব্যক্ত। 'ক্রিয়া' ব্যক্তাবস্থায় 'বিষয়' ও 'আশ্রয়'কে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত এই ক্রিয়ার 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' উভয়েই 'দ্রব্যের' অন্তর্গত সুতরাং ক্রিয়ার বিষয় ও আশ্রয়কে পৃথক ভাবে উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে। ক্রিয়ার 'বিষয়' ও 'আশ্রয়'কে প্রকরণ-শ্রেণী হইতে বাদ দিলে আমরা ষট্প্রকরণ প্রাপ্ত হই। ন্যায়ের ষট্ পদার্থ এ স্থলে স্বতঃই স্মরণ-

পথে উদিত হয়। এ স্থলে উভয়ের মধ্যে ঐক্য বা অনৈক্য বিচার স্থগিত থাকুক।

Metaphysics (তত্ত্ববিজ্ঞান) গ্রন্থে তত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হইয়া এরিষ্টটল পরিশেষে আটটী প্রকরণকে তিনটীতে পর্য্যবসিত করিয়াছেন। বিচার-বুদ্ধির ক্রমবিকাশে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, যাবতীয় পদার্থকে তিনটী প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যায় যথা—'দ্রব্য', 'গুণ' ও 'সম্বন্ধ'। সম্বন্ধ বলিতেই 'দেশ' ও কালের' সম্বন্ধ বুঝায়, সুতরাং 'দেশ' ও 'কালকে' পৃথকরূপে উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। 'গুণের' ব্যক্তাবস্থা লইয়াই 'ক্রিয়া এবং 'ক্রিয়ার' প্রকাশের জন্য 'বিষয়' ও 'আশ্রয়ের' অবলম্বন আবশ্যক; সুতরাং 'ক্রিয়া', 'অধিকার' ও 'আশ্রয়' এগুলিকে গুণের অন্তর্গত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। 'পরিমাণ' জ্ঞান দেশ' ও কালের উপর নির্ভর করে, সুতরাং 'পরিমাণ'কেও পৃথকরূপে নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

'দ্রব্যের' সহিত গুণের সম্বন্ধ লইয়াই জগৎ, সুতরাং চিন্তা-প্রণালীর মূলে তিনটী মাত্র প্রকরণ হইলেই যথেষ্ট। যে 'দ্রব্যের' সহিত যে গুণের' নিত্য সম্বন্ধ, সেইটীই তাহার 'স্বরূপ' শক্তি (essence) বা গুণ, আর যেটীর সহিত সে সম্বন্ধ নাই সেটী আগন্তুক মাত্র উপলক্ষণ (accident)। প্রত্যেক ত্রিকোণের (triangle) কোণগুলির সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রি এটী ত্রিকোণের স্বরূপগত গুণ। এই ত্রিকোণটীর তিনটী ভুজ সমান বা সমান নয় এই গুণ ইহার পক্ষে আগন্তুক মাত্র।

কোন বস্তুর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে হইলে এই প্রকরণ সাহায্যে আমাদের সে কার্য্য সাধিত হয়। সুতরাং এরিষ্টটল প্রথমেই ঐ প্রকরণের পরিচয় প্রদান করিয়া সংজ্ঞা নির্দ্দেশে অগ্রসর হন। সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে হইলে যে 'দ্রব্যের' সহিত যে 'গুণের' নিত্য সম্বন্ধ, আমাদের তাহাই স্থির করিতে হইবে। সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে হইলে বাক্যের সাহায্যেই তাহ হওয়া সম্ভব। ত্রিকোণ মাত্রেরই কোণ-সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রি, ত্রিকোণের এই

যে গুণ, ইহার দ্বারাই ত্রিকোণের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা সম্ভব। ঐ বাক্যই সুতরাং সংজ্ঞানির্দ্দেশের উপায় মাত্র। এই বাক্য হয় অন্বয়ী (affirmative) অথবা ব্যতিরেকী (negative); অর্থাৎ প্রত্যেক বাক্যই হয় সত্য অথবা মিথ্যা। সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে হইলে দ্রব্যের সহিত গুণের নিত্য সম্বন্ধকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তবেই সেটী অভ্রান্ত হইবে, নচেৎ তাহা সংজ্ঞা নামেরই যোগ্য হইবে না। সংজ্ঞা-প্রকাশক যে বাক্য তাহা সত্যই হইবে, কিন্তু বাক্য মাত্রই সত্য হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। উদাহরণ-সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। রাম হয় খঞ্জ; এস্থলে 'রাম' এই সংজ্ঞা দ্বারা যাহাকে বুঝাইতেছে সেখানে কোন ভ্রম নাই, 'খঞ্জ' বলিতে যাহা বুঝায় সেখানেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু রাম খঞ্জ না হইতে পারে এবং রাম খঞ্জ না হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে খঞ্জ বলায় ঐ বাক্য মিথ্যা বাক্য হইল। রামের সহিত খঞ্জত্ব সম্বন্ধ নিত্য নয় সুতরাং উহা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। একটী বাক্য হয় সত্য হইবে না হয় মিথ্যা হইবে। একটী বাক্য একাধারে সত্য ও মিথ্যা হইতে পারে না। রাম যদি খঞ্জ হয়, তবে রাম খঞ্জ নয়, এ কথা আর বলা যায় না। যুক্তির এই যে মৌলিক নিয়ম 'বিরোধ নিয়ম' (Law of contradiction) এরিষ্টটলই প্রথমে প্রচার করেন। কোন দ্রব্য বা বস্তু সম্বন্ধে কোন গুণ হয় বর্ত্তমান থাকিবে না হয় অবর্ত্তমান থাকিবে, বিরোধ নিয়ম হইতেই এই মধ্যাভাব নিয়ম (Law of excluded middle) সিদ্ধ হয়। এই যে মৌলিক নিয়ম, ইহা অনুমানসাপেক্ষ নয়; ইহা না মানিলে যুক্তি-বিচার অসম্ভব। এই নিয়মের সত্যতা, মৌলিকতা স্বতঃসিদ্ধ—এরিষ্টটল এই কথাই প্রচার করেন। নিগমন-মূলক যুক্তিরও ইহাই মূল নিয়ম। পূর্ব্বে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে, সে কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(ক) মনুষ্যমাত্রেই মর;
রাম একজন মনুষ্য;
সুতরাং রাম মর।

মানুষ—এটী একটী উদ্দেশ্য (subject)। মর—এটী বিধেয় (Predicate)। মানুষ মাত্রেই মর—এটী সাধ্যাবয়ব (major premise)। রাম—এটী একটী উদ্দেশ্য। মনুষ্য—বিধেয়। রাম একটী মনুষ্য—এটী পক্ষাবয়ব (minor premise)। রাম—এটী উদ্দেশ্য, মর—এটী বিধেয়। রাম মর এটী—অনুমান (conclusion)।

এইটী হইল নিগমন-মূলক যুক্তির প্রণালী।

আমি জানিতাম 'মনুষ্য মাত্রেই মর' আর জানিতাম 'রাম একটী মানুষ', এখন কিরূপে অনুমান করিলাম 'রামও মর'? না, হেতু (middle term) সাহায্যে। সেই 'হেতু' এখানে মনুষ্য। এই 'হেতু' উপরের লিখিত (ক) উদাহরণে সাধ্যাবয়বে উদ্দেশ্যপদ ও পক্ষাবয়বে বিধেয়পদ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এই 'হেতু' সাধ্যাবয়বে ও পক্ষাবয়বে উভয় স্থলে উদ্দেশ্য বা বিধেয় হইতে পারে।

উভয় স্থলেই বিধেয়। যথা—

(খ) রাম একজন মনুষ্য—শ্যাম একজন মনুষ্য।

উভয় স্থলেই উদ্দেশ্য। যথা—

(গ) মনুষ্য মাত্রেই চিন্তাশীল।

মনুষ্য মাত্রেই দুই হস্তবিশিষ্ট।

এখানে (ক) উদাহরণে 'হেতুর' সাহায্যে আমরা অনুমান করিতে সমর্থ হই এবং সাধ্যাবয়বের বা পক্ষাবয়বের প্রত্যেকটীর উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে বাস্তবিক যদি কোন অনৈক্য না থাকে তাহা হইলে আমাদের অনুমানও সত্য হইবে। পরন্তু (খ) ও (গ) উদাহরণে পক্ষাবয়ব ও সাধ্যাবয়বকে অবলম্বন করিয়া মনুষ্যকে হেতু ধরিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় না। ঐরূপ অনুমান যে ভ্রান্ত হইবে সেটী সহজেই বুঝা যায়। প্রথমে (খ) উদাহরণটী বিচার করিয়া দেখা যাউক—এই উদাহরণের সাধ্যাবয়ব হইতে জানিতে পারি, মনুষ্য বলিতে যে জাতি বুঝায়, রাম তদন্তর্গত ব্যক্তি-বিশেষ শ্যামও তাহারই অন্তর্ভুক্ত। এক জাতির অন্তর্ভুক্ত দুইটী বিশেষ পদার্থ কখনও 'একাত্মক' (identical) হইতে পারে না।

সুতরাং 'রাম হয় শ্যাম' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। (গ) উদাহরণটী গ্রহণ করিলে দেখা যায়, একই জাতির দুইটী বিশেষ গুণ আছে কিন্তু সেই বিশেষ গুণ একাত্মক হইবে কিরূপে? তাহা হইলে 'দুই হস্তবিশিষ্ট প্রাণী মাত্রেই চিন্তাশীল' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। পরন্তু এমনও প্রাণী আছে যাহারা দুই হস্তবিশিষ্ট অথচ চিন্তাশীল নয়। এই উদাহরণ-সাহায্যে বুঝা গেল, সাধ্যাবয়বের যেটী উদ্দেশ্য পদ সেইটী যদি পক্ষাবয়বের বিধেয় পদ হয়, তবেই আমাদের অনুমান যুক্তিযুক্ত হয় নচেৎ যথাযথ অনুমান সম্ভব হয় না; এবং প্রত্যেক অবয়বের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের সম্বন্ধ যদি বাস্তব হয় অর্থাৎ কাল্পনিক না হয় তবেই আমাদের অনুমানও সত্য হইবে। আমরা এই বিষয়ে আরও কয়েকটী কথা আগামী বারে লিপিবদ্ধ করিয়া তত্ত্ববিদ্যালোচনায় (Metaphysics) ব্যাপৃত হইব।

(ক্রমশঃ)

স্বামীবিবেকানন্দ ও তাঁহার বাণী।

(শ্রীকুমুদবন্ধু সেন)।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে আছে—"এক সময়ে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে পঞ্চবটীতলে আহ্বানপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'দেখ্ তপস্যাপ্রভাবে আমাতে অণিমাদি বিভূতিসকল অনেক কাল হইল উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমার ন্যায় ব্যক্তির, যার পরিধানের কাপড় পর্য্যন্ত ঠিক থাকে না, তাহার ঐসকল যথাযথ ব্যবহার করিবার অবসর কোথায়? তাই ভাবিতেছি, মাকে বলিয়া তোকে ঐসকল প্রদান করি, কারণ মা জানাইয়া দিয়াছেন, তোকে তাঁর অনেক কাজ করিতে হইবে। ঐসকল শক্তি তোর ভিতরে সঞ্চারিত হইলে কার্য্যকালে ঐসকল ব্যবহারে লাগাইতে পারিবি—কি বলিস্?'

ঠাকুরের পুণ্য দর্শন লাভ করিবার দিন হইতে নরেন্দ্র দৈবশক্তির অশেষ প্রকাশ তাঁহাতে নয়নগোচর করিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার ঐ কথায় অবিশ্বাস করিবার নরেন্দ্রের কোন কারণ ছিল না। অবিশ্বাস না করিলেও কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক ঈশ্বরানুরাগ তাঁহাকে ঐ সকল বিভূতি নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে দিল না। তিনি চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, ঐ সকলের দ্বারা আমার ঈশ্বরলাভবিষয়ে সহায়তা হইবে কি?' ঠাকুর বলিলেন, 'সে বিষয়ে সহায়তা না হইলেও ঈশ্বরলাভ করিয়া যখন তাঁহার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবি, তখন উহারা বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবে।' নরেন্দ্র ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, 'মহাশয়! আমার ঐ সকলে প্রয়োজন নাই। আগে ঈশ্বরলাভই হউক, পরে ঐ সকল গ্রহণ করা না করা সম্বন্ধে স্থির করা যাইবে। বিচিত্র বিভূতি সকল এখন লাভ করিয়া যদি উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই—এবং স্বার্থপরতার প্রেরণায় উহাদিগকে অযথা ব্যবহার করিয়া বসি—তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে যে।' ঠাকুর নরেন্দ্রকে অণিমাদি বিভূতি সকল সত্য সত্য প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন অথবা তাঁহার অন্তর পরীক্ষার জন্য পূর্ব্বোক্তভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় বলা সাধ্যাতীত কিন্তু নরেন্দ্র ঐ সকল গ্রহণে অসম্মত হওয়াতে তিনি যে বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছিলেন একথা আমাদিগের জানা আছে।"

ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম বিরল নহে। যখন ভগবান্ শ্রীঈশার চল্লিশ দিন অনাহারে ও কঠোর তপস্যার পর সয়তান তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাজ্যাদি নানা ভোগ-সুখ ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়াছিল তখন ঈশা প্রলোভনবেশী সয়তানকে চিনিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "Get thee hence, Satan, for it is written Thou shalt worship the Lord, Thy God and Him only shalt Thou serve" শ্রীবুদ্ধের কঠোর সাধনকালে যখন মার মায়ার মোহিনীবেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে আসিয়াছিল তখন তিনিও বজ্রগম্ভীর

স্বরে বলিয়াছিলেন, “দূর হও মার, আমি তোমাকে চিনিয়াছি।” ইঁহারা প্রলোভনকে প্রলোভনরূপে জানিয়া সত্যলাভের অন্তরায় বিবেচনা করিয়া তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামিজীর জীবনের এই ঘটনা, এই প্রত্যাখান, এই কঠোর পরীক্ষা কত বীরত্বব্যঞ্জক, কত মহৎ, কত বৈরাগ্যপূর্ণ। এখানে যিনি তাঁহার জীবনের আদর্শদেবতা, যিনি তাঁহার জীবনের ধ্রুবজ্যোতি, যাঁহাকে তিনি প্রাণে প্রাণে বলিয়াছিলেন, “প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর! কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।”—যখন সেই পরমযোগেশ্বর মহাপুরুষ ঐ বিভূতিসকল তাঁহাকে প্রদান করিতে চাহিতেছেন তখন স্বামিজী—তাহা ঈশ্বরলাভের সহায়তা করিবে না জানিয়া গ্রহণ করিলেন না। এই ঘটনাটী পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় ঈশ্বরলাভ ভিন্ন আর যত কিছু তাঁহার নিকট সব তুচ্ছ! ত্যাগ ও ঈশ্বরানুরাগের কি জ্বলন্ত উদাহরণ! যখন স্বামিজী সেই মহা-সত্য জীবনে উপলব্ধি করিয়া বেদমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব সমন্বয়-বাণী ও প্রেমের বার্ত্তা জগতে প্রচার করিতে পাশ্চাত্যদেশে গমন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন তখন এই অদ্ভূত ত্যাগিরাজ—এই অপূর্ব্ব বৈরাগ্যবান্ তেজোদ্দীপ্ত সন্ন্যাসী তাঁহার কোন সন্ন্যাসী গুরু-ভ্রাতকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'অভিমানং সুরাপানং গৌরবং ঘোররৌরবং। প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা ত্রয়ং ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ॥” আবার যখন তিনি সেই চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় সেই সুদূর প্রতীচ্য-ভূখণ্ড আমেরিকা প্রদেশে—যখন সকল প্রকার গৌরব প্রতিষ্ঠা ও জয়শ্রী তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িতেছে তখন সেই কৌপিনধারী নির্ভীক যুবক সন্ন্যাসী যোগীরাজ নীলকণ্ঠ শঙ্করের ন্যায় সে দিকে দৃকপাত না করিয়া বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্ত প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে শান্তি ও অভয় বাণী প্রচার করিতেছেন! কামকাঞ্চনাসক্ত জীবকে ত্যাগ ও পবিত্রতার মন্ত্রে আহ্বান করিতেছেন! অনন্ত নরক-ভয়-প্রপীড়িত জনগণকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন, “হে অমৃতের পুত্রগণ! তোমাদিগকে কে বলে পাপী। (Sinner? It is a

sin to call a man so) পাপী? মানুষকে পাপী বলাই মহাপাতক? জানি না পূর্ব্বে কেহ মানবকে ঐরূপ ভাবে অমৃত-আস্বাদনে আহ্বান করিয়াছেন কি না! "আত্মার মহিমায় মহিমান্বিত হও। শান্তি—ভোগে নহে, ত্যাগে। জড়ের পূজায় মৃত্যু, চৈতন্যের উপাসনায় অমরত্ব। হে ভোগমুগ্ধ, ভোগকে ছাড়িয়া ত্যাগকে আশ্রয় কর; নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর মায়াময় সংসারকে ত্যাগ করিয়া সেই অবিনশ্বর সনাতন সত্যকে আশ্রয় কর।"—ইহাই স্বামিজী প্রচার করিয়াছেন। স্বামিজীর এই মেঘমন্দ্রস্বর, শান্তির এই অপূর্ব্ব নির্ঘোষ—তখন সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়াছিল। জানি না সেই মহাবাণী আবার প্রতিধ্বনিত হইয়া সমগ্র পাশ্চাত্য জাতিকে এই মহাকল্যাণকর পথে পরিচালিত করিবে কি না? কিন্তু যদি না করে তবে পাশ্চাত্য জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

আর এই পুণ্যভূমি ভারতে—যেখানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়াছেন, যেখানে ধর্ম্মসংস্থাপক অবতার পুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকেন—যেখানে যুগ-যুগান্ত হইতে বিশ্বের মহাসত্য নরজীবনে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া মহীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে—যেখানে অপূর্ব্ব ধর্ম্ম, অপূর্ব্ব দর্শন এবং অপূর্ব্ব সভ্যতা ভারতকে পবিত্রতীর্থরূপে পরিণত করিয়াছে, সেই ভারতে যখন সনাতন ধর্ম্মে আস্থাবিহীন পাশ্চাত্য-জাতির অনুকরণলোলুপ, হিংসাদ্বেষে জর্জ্জরিত, অনাচারী উচ্ছৃঙ্খল ও ভোগলিপ্সু কপটিগণের প্রাধান্য হইয়াছিল, যখন ধর্ম্ম কেবল সম্প্রদায়-বিদ্বেষে ও বহিরাচরণে, পাণ্ডিত্য কেবল বিজাতীয় গ্রন্থের চর্ব্বিতচর্ব্বণে, বীরত্ব যখন অপেক্ষাকৃত শক্তিমানের পদলেহনে—তখন এই স্বেচ্ছাচারী জড়বুদ্ধি জড়-বিদ্যাভিলাষী আর্য্য সন্তানের মধ্যে নিরক্ষর সরল দরিদ্র ব্রাহ্মণ—ভাগীরথী বেষ্টিত পঞ্চবটীমূলে ভারতের—জগতের উদ্ধারকল্পে যে মহাশক্তির বিকাশ করিয়াছিলেন—বিশ্বের পাবনরূপে মহান্ সত্যের আদর্শস্বরূপ মাধুর্য্যপূর্ণ ভাগবত তনু ধারণ করিয়াছিলেন—স্বামিজী

জলদগম্ভীর স্বরে ভারতের সেই সনাতন আদর্শকে জগতে লোক-চক্ষুর সমক্ষে স্থাপিত করিয়া সম্প্রদায়দ্বন্দ্বসঙ্কুল জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত অপূর্ব্ব প্রেমপূর্ণ সমন্বয়বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি জ্বলন্ত ভাষায় ভারতবাসীকে বলিয়া গিয়াছেন—

"বারম্বার এই ভারতভূমি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিলেন এবং বারম্বার ভারতের ভগবান্ আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছিলেন।

"কিন্তু ঈষন্মাত্র যামাগতপ্রায়া বর্ত্তমান গভীর বিষাদরজনীর ন্যায় কোন অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতনসমূহ গোষ্পদের তুল্য।

"—সেই জন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জ্বলতায় অন্য সমস্ত পুনর্বোধন সূর্য্যালোকে তারকাবলীর ন্যায়। এই পুনরুত্থানের মহাবীর্য্যের সমক্ষে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য্য বাললীলা প্রায়।

"পতনাবস্থায় সনাতন ধর্ম্মের সমগ্র ভাবসমষ্টি অধিকারিহীনতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আকারে পরিরক্ষিত হইতেছিল এবং অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছিল।

"এই নবোত্থানে, নব বলে বলীয়ান মানবসন্তান বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্ম-বিদ্যা সমষ্টিকৃত করিয়া ধারণা ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে; এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে; ইহার প্রথম নিদর্শনস্বরূপ শ্রীভগবান্ পরম কারুণিক, সর্ব্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্ব্বভাবসমন্বিত, সর্ব্ববিদ্যাসহায়, যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।

"অতএব এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্ব্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্ত ভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্ম্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চ নিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

"এই নব যুগধর্ম্ম, সমগ্র জগতে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান; এবং এই নব যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীভগবান্ পূর্ব্বগ

শ্রীযুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব! ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণা কর।"

অন্যত্র, স্বামিজী তাঁহার কোন শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন, "বিশ্বাসে যে অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় এবং একমাত্র ইহাতেই যে মানুষকে পরিত্রাণ করিতে পারে এই পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার একমত, কিন্তু উহাতে আবার গোঁড়ামী আসিবার ও ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার রোধ হইবার আশঙ্কা আছে। জ্ঞানমার্গ খুব ঠিক, কিন্তু উহাতে আশঙ্কা, পাছে উহা শুষ্ক বাদবিতণ্ডায় দাঁড়ায়।

"ভক্তি খুব বড় জিনিষ, কিন্তু উহা হইতে নিরর্থক ভাবুকতা আসিয়া আসল জিনিষটাই নষ্ট হইবার যথেষ্ট ভয় আছে।

"এই সবগুলির সামঞ্জস্যই দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এইরূপ সমন্বয়পূর্ণ ছিল।"

"ভগবান যদিও সর্ব্বত্র আছেন বটে কিন্তু তাঁকে আমরা জানতে পারি কেবল মানব চরিত্রের মধ্য দিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণের মত এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয় নাই, সুতরাং আমাদের তাঁকেই কেন্দ্রস্বরূপ করে তাঁকেই ধরে থাকা উচিত। অবশ্য যে তাঁকে যে ভাবে নিক্, তাতে কোন বাধা দেওয়া উচিত নয়। কেউ আচার্য্য বলুক, কেউ পবিত্রাতা বলুক, কেউ ঈশ্বর বলুক, কেউ আদর্শ পুরুষ বলুক, কেউ বা মহাপুরুষ বলুক—যার যা খুসি—সে তাঁকে সেই ভাবে নিক।"

তমাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে জাগ্রত করিবার জন্য তিনি আপামর সাধারণের মধ্যে যাহাতে রজোগুণের বিকাশ হয় তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতে পৈত্রিক শক্তি বিদ্যমান; যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহা পুনস্ফুরণ হইবে।"

প্রস্ফুরিত হইয়া কি হইবে? স্বামিজী বলিতেছেন- "তবে হইবে কি? যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্ব্বকালেও ছিল না, যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার

হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, * * * সেই আত্মনির্ভরতা, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা। চাই—সর্ব্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ-সম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে এই রজোগুণই আমাদের জাতীয় জীবনের একমাত্র প্রয়োজন। কেন না স্বামিজী আমাদিগকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন,"অপর দিকে তালপত্র-বহ্নির ন্যায় রজোগুণ শীঘ্রই নির্ব্বাণোন্মুখ, সত্ত্বের সন্নিধান নিত্যবস্তুর নিকটতম। সত্ত্ব প্রায় নিত্য। রজোগুণপ্রধান জাতি দীর্ঘ জীবন লাভ করে না, সত্ত্বগুণ প্রধান যেন চিরজীবী. ইহার সাক্ষী ইতিহাস।" তমোগুণ-সমুদ্রে নিমগ্ন ভারত রজোগুণের মধ্যে দিয় সত্ত্বে উপনীত হইবে—ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি বলিয়াছেন, "সত্ত্বগুণাপেক্ষা মহাশক্তির সঞ্চার আর কিসে হয়? অধ্যাত্ম বিদ্যার তুলনায় আর সব 'অবিদ্যা' সত্য বটে, কিন্তু কয় জন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে—এ ভারতে কয় জন? সে মহাবীরত্ব কয় জনের আছে যে নির্ম্মম হইয়া সর্ব্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয় জনের ভাগ্যে ঘটে যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য্য ও মহিমা চিন্তায় নিজ শরীর পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়। আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটী কোটী নরনারীকে সামাজিক, আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে?"

আধুনিক ভারতের ইংরাজীশিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার মূলকারণ হিন্দু ধর্ম্মকে নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা মনে করেন, আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি সমাজনীতি বা রাজনীতির উপর স্থাপিত হইলে ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইত। কিন্তু স্বামিজী এই মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন,

"হিন্দুধর্ম্মের কোন দোষ নাই। হিন্দু ধর্ম্ম তো শিখাইতেছেন, জগতে যত প্রাণী আছে সকলেই তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ কেবল এই তত্ত্বকে কার্য্যে পরিণত না করা—সহানুভূতির অভাব হৃদয়ের অভাব।"

"গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না; ভরসা তোমাদের উপর—পদমর্য্যাদাহীন দরিদ্র কিন্তু বিশ্বাসী তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখ। কোন কৌশলের প্রয়োজন নাই। কৌশলে কিছুই হয় না। দুঃখীদের জন্য প্রাণে প্রাণে ক্রন্দন কর আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, সাহায্য আসিবেই আসিবে।" স্বামিজী দেশের যুবকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতের জন্য এই সহানুভূতি এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থ সারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলে দীন দরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও এবং তাঁহার নিকট এক মহাবলি প্রদান কর; বলি—জীবন বলি, তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য।

"তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া শত শত যুগসঞ্চিত পর্ব্বত-প্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।

"তোমরা রোগ কি বুঝিলে, ঔষধ কি তাহা বুঝিলে, কেবল বিশ্বাসী হও।

"আমরা ধনী বা বড় লোককে গ্রাহ্য করি না, হৃদয়শূন্য মস্তিষ্ক-সার ব্যক্তিগণকে বা তাহাদের নিস্তেজ সংবাদপত্র প্রবন্ধসমূহকেও

গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস! বিশ্বাস! সহানুভূতি। অগ্নিময় বিশ্বাস! অগ্নিময় সহানুভূতি! জয় প্রভু জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু, অগ্রসর হও। প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে চাহিও না। এগিয়ে যাও সম্মুখে সম্মুখে! এইরূপে আমরা অগ্রগামী হইব, একজন পড়িবে আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।" স্বামিজী অগ্নিময়ী বাণীর দ্বারা আমাদিগকে যে জীবনসংগ্রামের জন্য আহ্বান করিয়া গিয়াছেন, তাহার লক্ষ্য "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" সে সংগ্রামের অস্ত্র সরলতা, পবিত্রতা, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও বিশ্বপ্রেম, সে মহারণের ভেরী—অভীঃ অভীঃ অভীঃ, সে সংগ্রামের জয়নাদ—জয় প্রভুর জয়, জয় গুরুমহারাজের জয়, জয় মহামায়ীর জয়। এই সংগ্রাম—পাশবিক নরহত্যা নহে। এই যুদ্ধে ভ্রাতৃরক্তে ভ্রাতৃহস্ত কলুষিত হয় না। এই যুদ্ধে মানুষ পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় মহানগরী শ্মশানে পরিণত করে না; চঞ্চল হৃদয়ে অশান্তির আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয় না। এই যুদ্ধে মানুষ দেবতা হয়, ভোগসুখকাতর প্রলুব্ধ চিত্ত সংযত হইয়া শান্তি ও আনন্দের বিমল ধারায় অবগাহন করে। এই যুদ্ধে ধনী দরিদ্রকে, বিদ্বান মূর্খকে, ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে, পুণ্যবান পতিতকে, সাধু অসাধুকে, বলবান দুর্ব্বলকে ভাই বলিয়া—আপনার অভিন্ন দেহ বলিয়া—সেই মহাশক্তির এক সন্তা জানিয়া গাঢ় প্রেমে আলিঙ্গন করে। ঐ শুন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারিত মহাসমন্বয় বাণী "হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য, জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী, কর্ম্মী, আস্তিক নাস্তিক ভ্রাতৃপ্রেমে সম্মিলিত হইয়া সেই মহাসত্যের দিকে অগ্রসর হও।" জগতের সেই শুভমুহূর্ত্তে সেই অপূর্ব্ব সমন্বয়লীলা দেখিয়া বিশ্বাসী মহানন্দ ভোগ করিবে। সে দিন আসিবেই আসিবে। তাই স্বামিজী বলিয়াছেন, "ভালবাসা কখনও বিফল হয় না। আজি হউক কালি হউক শতযুগ পরে হোক্ প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মনুষ্যজাতিকে ভালবাস? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্ব্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর

নহে? অগ্রে তাঁহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস সম্পন্ন হও।" স্বামিজী প্রেমোন্মত্ত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, "আমি মুক্তি চাই না, আমি ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব।" জীবের কল্যাণ-যজ্ঞে যিনি স্বীয় জীবন আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি ইহা বলিবেন, তাহা আর আশ্চর্য্য কি! তাঁহার প্রদর্শিত আদর্শ চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, "এক আত্মাই বিভিন্ন উপাধির মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইতেছেন। সব প্রাণীই ব্রহ্মস্বরূপ, প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘে ঢাকা সূর্য্যের মত—একজনের সঙ্গে যেন আর একজনের তফাৎ এই, কোথাও সূর্য্যের উপর মেঘের কেবল ঘন আবরণ, কোথাও এই আবরণ একটু তরল।" তাই স্বামিজী অন্যত্র বলিয়াছিলেন,—"প্রত্যেক নরনারীকে, সকলকেই ঈশ্বর দৃষ্টিতে দেখিতে থাক। তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, তুমি কেবল সেবা করিতে পার। প্রভুর সন্তানদিগকে, যদি সৌভাগ্য হয়, তবে স্বয়ং প্রভুকে সেবা কর। যদি প্রভুর অনুগ্রহে তাঁহার কোন সন্তানের সেবা করিতে পার, তবে তুমি ধন্য হইবে। নিজেকে একটা কেষ্ট বিষ্টু ভেব না। তুমি ধন্য যে, তুমি সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ, অপরে পায় নাই। অতএব তফাৎ, কেহই তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে না। উহা তোমার পূজা স্বরূপ। আমি কতকগুলি দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিতেছি,—আমার নিজ মুক্তির জন্য আমি তাহাদের নিকট যাইয়া তাহাদের পূজা করিব; ঈশ্বর সেখানে রহিয়াছেন। কতকগুলি ব্যক্তি যে দুঃখ ভুগিতেছে, সে তোমার আমার মুক্তির জন্য যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠী, পাপী প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পূজা করিতে পারি। আমার কথাগুলি বড় কঠিন হইতেছে, কিন্তু আমাকে উহা বলিতেই হইবে, কারণ তোমার আমার জীবনের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে, আমরা প্রভুকে এই সকল বিভিন্নরূপে সেবা করিতে পারি।"

এই দরিদ্র নারায়ণ, আর্ত্ত নারায়ণের সেবার দ্বারাই

দিন দিন চিত্তশুদ্ধি হয় এবং সেই নির্ম্মল চিত্ত-দর্পণে ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হন। এই জীবন্ত নারায়ণের সেবা জগতে নূতন। ইহা প্রেমের ভিত্তির উপরে স্থাপিত। এই মহাসমন্বয় ও এই মহা প্রেমপূর্ণ সেবাধর্ম্ম সমগ্র জগত প্লাবিত করিবে। তাই স্বামিজী বলিয়াছেন, "যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর।" আসুন এই পবিত্র পুণ্য প্রবাহে আমরা নিমজ্জিত হইয়া কৃতার্থ ও ধন্য হই। আর যেন সরল পবিত্র মনে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, "কার্য্যে আমাদের অধিকার—ফল প্রভুর হস্তে।" কেবল আমরা বলি, "হে ওজঃস্বরূপ আমাদিগকে ওজস্বী কর, হে বীর্য্যস্বরূপ, আমাদিগকে বীর্য্যবান কর; হে বলস্বরূপ, আমাদিগকে বলবান কর।"

শঙ্করদেব। *

(শ্রীরমণীকান্ত বসু)

ইদানীং ব্রহ্মপুত্রোপত্যকায় প্রায় ঊনবিংশ লক্ষ হিন্দুর বাস। এতন্মধ্যে কিঞ্চিদধিক দ্বাদশ লক্ষই বৈষ্ণব মতাবলম্বী। বৈষ্ণবগণ মহাপুরুষীয়া, দামোদরীয়া, মোয়ামারিয়া, হরিদেব পন্থী, গোপালদেব পন্থী, চৈতন্য পন্থী প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এতৎ-প্রদেশে হিন্দুধর্ম্মের সম্প্রসারণশীলতার প্রভাব অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রভাবে অদ্যাপি বহু পার্ব্বত্য জাতি সুবিশাল হিন্দুসমাজের সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজ-কলেবরের পুষ্টিসাধন করিতেছে। আজিও হিন্দুসমাজ-বহির্ভূত অনার্য্যগণ আচারবান্ হইয়া গোস্বামী প্রভুগণের "শরণীয়া"

* আসামে ইঁহাকে "হঙ্করদেব" বলে কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নাম শঙ্করদেব। আসাম অঞ্চলে 'শ' ও 'স' অনেকটা 'হ'রূপে উচ্চারিত হয়।

অর্থাৎ শরণাপন্ন হইলে, তাঁহারা তাহাদিগকে হিন্দু সমাজের প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। এই আচারবান্ অনার্য্যগণ, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ হইতে উদার ব্যবহার প্রাপ্ত ও ক্রমে ক্রমে যথেষ্ট উন্নত হইয়া থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে, আসামে হিন্দু সমাজ বৈষ্ণব গোস্বামিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। আসামে এই যে পূর্ণমাত্রায় বৈষ্ণব প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যে মহাত্মা তাহার মূলীভূত কারণ— যিনি আসামে বৈষ্ণবধর্ম্মের তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যাঁহার পবিত্র স্মৃতি আজও আসামের অণুপরমাণুর সহিত বিজড়িত, যাঁহার সুলেখনী দ্বারা অসমীয় সাহিত্য গৌরবান্বিত, যিনি ভগবদবতার-রূপে সম্পূজিত, যাঁহার পবিত্র নামোচ্চারণ কালে আজিও আসাম-বাসীর বক্ষ গৌরবে স্ফীত, হৃদয় ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে উদ্বেলিত ও মস্তক সসম্ভ্রমে অবনত হয়—সেই ভক্তকুলচূড়ামণি মহাপুরুষ শঙ্কর-দেবের সংক্ষিপ্ত জীবনীই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

শঙ্করদেব আসামের সুবিখ্যাত 'শিরোমণি ভূঞা' চণ্ডীবরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ বা বৃদ্ধ প্রপৌত্র। চণ্ডীবর * এবং কতিপয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কমতেশ্বর † দুর্ল্লভনারায়ণ কর্ত্তৃক গৌড়রাজ্য হইতে আনীত হন। চণ্ডীবর ও তৎপিতা লম্বোদর প্রথমতঃ লেঙামাগুরী নামক স্থানে উপনিবেশিত হন। কালে চণ্ডীবর কোন কারণবশতঃ রাজরোষ-বহ্নিতে পতিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন; কিন্তু পরে কোন কার্য্য দ্বারা কমতেশ্বরের প্রীত্যুৎপাদন করিয়া তিনি মুক্তিলাভ করেন। দুর্ল্লভনারায়ণ এই কার্য্যে তাঁহার প্রতি এতাদৃশ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি চণ্ডীবরকে দেবীদাস নাম প্রদানপূর্ব্বক 'শিরোমণি ভূঞা' অর্থাৎ ভূঞাশ্রেষ্ঠ ‡ পদে বরণ করিয়া সম্মানিত

* ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন।

† আসামেতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ সেনবংশীয় প্রথম রাজা নীলধ্বজ, প্রাগ্জ্যোতিষপুর হইতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া স্বীয় রাজ্যের পশ্চিমাংশে কমতাপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।

‡ নেপাল ও বঙ্গের ন্যায় আসামেও বারভূঞা প্রথা প্রচলিত ছিল।

করেন। অবশেষে চণ্ডীবর টেম্বুখানি বরদোয়ায় বাস স্থাপন করেন।

চণ্ডীবরের প্রপৌত্র কুসুমবর সুদীর্ঘকাল পুত্রহীন থাকায় পুত্র-লাভাকাঙ্ক্ষায় দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হন ও পুত্র-কামনায় দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। কিন্তু এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বনগঞ্জাগিরির জন্মের পূর্ব্বেই প্রথমা স্ত্রী সত্যসন্ধ্যার গর্ভে একটী পুত্রের জন্ম হয়। এই পুত্ররত্নই সুপ্রথিতযশা শঙ্করদেব।

১৩৭১ শকের * কার্ত্তিকী অমাবস্যা তিথিতে বৃহস্পতিবার নিশীথ-কালে শঙ্করদেব জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অপরূপ রূপচ্ছটায় ও জ্যোতির্ম্ময় দেহপ্রভায় সূতিকাগৃহ আলোকিত হইল। বোধ হইল, যেন সাক্ষাৎ ভাস্করদেব গগনমণ্ডল হইতে অবতরণ করিয়া স্বীয় জ্যোতিঃ দ্বারা সূতিকাগৃহ উদ্ভাসিত করিয়াছেন। শঙ্করের জন্মবার্ত্তা ঘোষিত করিয়া মেঘমালা মৃদুগর্জ্জন ও অশ্বসমূহ হ্রেষারব করিয়া উঠিল। পুত্রের জন্মসংবাদে কুসুমবরের আর আনন্দের সীমা রহিল না। নবজাত তনয়ের লাবণ্যমণ্ডিতানন সন্দর্শন করিয়া কুসুমবরের হৃদয়তন্ত্রী যেন কোন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সুরে বাজিয়া উঠিল—হৃদয়সলিলে আনন্দলহরী ক্রীড়া করিতে লাগিল। স্নানান্তে বিশুদ্ধ হইয়া কুসুমবর স্বীয় কুলোচিত দানাদি কার্য্য সমাধা করিলেন। দৈবজ্ঞগণ গণনা করিয়া কহিলেন, "এই শিশুর ভবিষ্যৎ অত্যুজ্জ্বল। কালে এই শিশু ঐশীশক্তিবলে নামধর্ম্মের প্রবল প্রেমবন্যা প্রবাহিত করিয়া সহস্র সহস্র জীবের মুক্তির কারণ হইবেন।"

অতি শৈশবে শঙ্করের পিতৃবিয়োগ হয়। † তাঁহার মাতাও

---

* শঙ্করদেবের জন্ম ও মৃত্যুর সময় লইয়া বহু মতভেদ বর্ত্তমান। ইদানীং অনেকেই ১৩৭১ শক শঙ্করদেবের জন্ম শক ও ১৪৯০ শক তাঁহার মৃত্যু শক বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন।

† শঙ্করের জনক ও জননীর মৃত্যুসময় নির্দ্ধারণে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কণ্ঠ-ভূষণ ও অন্যান্য কতিপয় শঙ্কর-চরিতাখ্যায়কের মতে তাঁহার মাতৃ-পিতৃ বিয়োগ

অনতিবিলম্বে পতির অনুগামিনী হন। বালক শঙ্করের লালন-পালনের ভার তাঁহার বৃদ্ধা পিতামহীর স্কন্ধে পতিত হইল। বাল্য-কালে শঙ্কর নিরতিশয় চঞ্চল ও ক্রীড়াপ্রিয় ছিলেন। প্রায় দশ বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি মা সরস্বতীর সহিত সর্ব্বসম্পর্ক-বিহীন ছিলেন। একদিন শঙ্কর অন্নভোজনে নিরত রহিয়াছেন, এমত সময়ে তাঁহার বৃদ্ধা পিতামহী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, আমাদিগের এই মহদ্বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তোমার এত বর্ষ বয়ঃক্রম হওয়া সত্ত্বেও, তুমি বিদ্যাশিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন; আমার বোধ হয় তুমি মূর্খ হইয়া অশেষ দুর্গতিভাজন ও এই পবিত্র বংশের গ্লানির কারণ হইবে।" বৃদ্ধা পিতামহীর এই বাক্যগুলি শঙ্করের অন্তর স্পর্শ করিল। তিনি বিদ্যালাভ করিবার জন্য অন্তরে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে শঙ্কর মহেন্দ্র কন্দলির নিকট পাঠারম্ভ করিলেন। শীঘ্রই পাঠাভ্যাসে তাঁহার আশ্চর্য্যজনক অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতা দৃষ্ট হইল। তিনি তাঁহার সতীর্থগণকে শীঘ্রই অতিক্রম করিয়া গেলেন। নানা শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ সমাপন করিয়া শঙ্কর পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন। অতঃপর তিনি কিয়ৎকাল যোগাভ্যাস করিয়া তাহাতেও অপূর্ব্ব সিদ্ধিসমূহ লাভ করিলেন।

মহেন্দ্র কন্দলির নিকট পাঠকালে সঙ্ঘটিত শঙ্করের উজ্জ্বল ভবিষ্য-দ্দ্যোতক এক ঘটনাকাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, এক দিবস পাঠান্তর ছাত্রগণ পাঠশালাগৃহ হইতে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল, কিন্তু শঙ্কর পাঠশালাতেই শয়ন করিয়া রহিলেন। কিয়ৎ-কালান্তর তাঁহার অঙ্গোপরি রৌদ্র নিপতিত হইলে একটী সর্প স্বীয় ফণা বিস্তারপূর্ব্বক তদুপরি ছায়া প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইল;

তদীয় প্রথম বিবাহের পর সংঘটিত হয়; কিন্তু তদীয় অন্যতম চরিতাখ্যায়ক দৈত্যারি ঠাকুরের মতে অতি শৈশবে শঙ্কর মাতৃপিতৃহীন হন। মহাপুরুষীয় সমাজে এই শেষোক্ত মতই প্রচলিত।

কিন্তু এই সময়ে মহেন্দ্র কন্দলি তথায় উপনীত হওয়ায় সর্প ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। এই ঘটনার দিবস হইতে মহেন্দ্র শঙ্করদেবকে সবিশেষ সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতেন।

শঙ্কর ক্রমে ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন। শঙ্কর-জনক কুসুমবর বরদোয়া হইতে আলিপুখরীতে উপনিবেশিত হইয়াছিলেন। জ্ঞাতিবর্গের পরামর্শে শঙ্কর পুনরায় বরদোয়ায় বসবাস করেন। শাস্ত্রচর্চ্চায় নিমগ্ন শঙ্কর ক্রমে ক্রমে সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন ও ক্রমশঃ তিনি সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইতে লাগিলেন শঙ্করের এতাদৃশ অবস্থা দর্শনে পিতামহীদ্বয় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তাঁহারা সূর্য্যাবতী নাম্নী জনৈকা বহু রূপ-গুণাদিবিভূষিতা কন্যার সহিত তাঁহাকে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। কতিপয় বৎসর নবদম্পতী সুখে অতিবাহিত করিলেন। তাঁহাদিগের মনু নাম্নী এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। মনুর জন্মের অব্যবহিত পরেই সূর্য্যাবতী ইহলোক ত্যাগ করেন। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে শঙ্করদেব যথাকালে তাঁহাকে হরি নামক জনৈক কায়স্থ-কুলোদ্ভব যুবকের সহিত পরিণয়পাশে আবদ্ধা করিলেন।

শঙ্করদেবের হৃদয়ে পূর্ব্ব হইতেই তীর্থভ্রমণাকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া পতিপ্রাণা সতী সাধ্বী সূর্য্যাবতীর স্নেহডোরের আকর্ষণে প্রবাসী বেশে সুদূর বিদেশে তীর্থপর্য্যটন-চিকীর্ষা কিয়ৎকালের জন্য ত্যাগ করেন। এক্ষণে সংসারের এক মাত্র দৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করায়, তাঁহার হৃদয়ে পুনরায় তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বিলীন প্রায় তীর্থপর্য্যটনাকাঙ্ক্ষা পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল। নির্ব্বেদপ্রাপ্ত শঙ্কর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বনগঞ্জা-গিরিকে জামাতা হরির গৃহে রাখিয়া সপ্তদশ সংখ্যক সঙ্গি সমভি-ব্যাহারে তীর্থভ্রমণোদ্দেশ্যে বহির্গত হইলেন।

দ্বাদশ বর্ষ তীর্থভ্রমণান্তর শঙ্করদেব স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। তিনি প্রথমতঃ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করেন। এই পবিত্র স্থানে দিবসত্রয় অবস্থিতি করিয়া স্বীয় সুগভীর পাণ্ডিত্যে পাণ্ডাদিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তি

অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি অধিকাংশ সঙ্গীদিগকে বিদায় প্রদান করিয়া অন্যান্য তীর্থদর্শনমানসে গমন করিলেন। গয়া, কাশী প্রভৃতি বহু বৃহৎ ও ক্ষুদ্র তীর্থ পর্য্যটনে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত করিয়া অবশেষে তিনি স্বদেশে পুনরাগমন করেন।

শঙ্করদেব গৃহে প্রত্যাগমন করিলে পর বৃদ্ধা পিতামহী, ভ্রাতা বনগঙ্গাগিরি, জামাতা হরি প্রমুখ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধববর্গ উল্লসিতহৃদয়ে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। শঙ্করদেব হরিনাম ও কীর্ত্তনে সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকালান্তর পিতামহী প্রভৃতির সনির্ব্বন্ধানুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। অতঃপর তদীয় পিতামহীর দেহত্যাগ হইয়াছিল। পরলোকগত আত্মার তৃপ্তিবিধানার্থ তিনি যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন।

শঙ্করদেব গৃহে গৃহে সুধামাখা হরিনাম বিতরণ করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাছারীদিগের উপর্য্যুপরি উপদ্রবে তাঁহার বরদোবায় বাস করা অসম্ভব হইল। তিনি আত্মীয়কুটুম্বাদির সহিত ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরস্থ গাংমৌ গ্রামে আবাসগৃহ ও নামঘরাদি* নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রমানন্দ ঠাকুরের জন্ম হয়। জনৈকা দাসীপ্রমুখাৎ পুত্রের জন্মসংবাদ অবগত হইয়া শঙ্কর সবিষাদে গাহিয়াছিলেন ঃ—

পায়ে পড়ি হরি, করোঁহো কাতরি, প্রাণ রাখবি মোর।
বিষয়বিষধর বিষে জরজর, জীবন না রহে আর॥
অথির ধন জন, অথির জীবন, অথির এহ সংসার।
পুত্র পরিবার, সবহি অসার, করবো কা হেরি সার॥
কমলদলজল চিত্ত চঞ্চল, থির নোহে তিল এক।
নাহি ভবভয়, ভোগ পরিহরি, পরম্পদ পরতেক॥

* আসামে বৈষ্ণবগণ নামঘরে সমবেত হইয়া নামকীর্ত্তনাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন।

কহতু শঙ্কর, এ দুঃখসাগর, পার করা হৃষিকেশ।
তুহু গতি মতি, দেহু শ্রীপতি তত্ত্বপথ উপদেশ॥

গাংমৌ অবস্থান কালে শঙ্করদেবের দ্বিতীয় পুত্র হরিচরণ, তৃতীয় পুত্র কমললোচন ও সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা রুক্মিণীর জন্ম হয়।

গাংমৌ অবস্থিতির পর তিনি ধুঞাহাটে বসবাস করেন। এই স্থলে বহুলোক তাঁহার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিলেন। গয়াপাণি নামক জনৈক ধনীসন্তান তীর্থযাত্রামানসে শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন, কিন্তু সেখানে ৺জগন্নাথদেব কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শঙ্করের সুনাম শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। কথাপ্রসঙ্গে গয়াপাণি

তত্রৈব গঙ্গাযমুনা চ তত্র গোদাবরী সিন্ধু সরস্বতী।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ॥

—এই শ্লোকটীর যথোচিত ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইলে শঙ্করদেব স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সুমিষ্ট ভাষায় কহিলেন :—

কৃষ্ণর উদার কথার প্রসঙ্গ
যথাত হোয়ে নিশ্চয়।
গঙ্গা গোদাবরী আদি যত তীর্থ
নিবাস তথা করয়॥

শঙ্করদেবের কথিত শ্লোকার্থ শুনিয়া গয়াপাণি শ্রীক্ষেত্রের স্বপ্নের তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হইলেন। ইনি অবশেষে শঙ্করচরণাশ্রিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। গয়াপাণির নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া রামদাস রাখা হইল।

অতঃপর শঙ্কর-মাধব-সম্মিলন। মহাপুরুষ মাধবদেব উত্তরকালে 'মহাপুরুষীয়া' সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। * ইনি পূর্ব্বজীবনে ঘোর শাক্ত ছিলেন। একদা কোন কারণবশতঃ মাধব দেবীপূজায় একজোড়া শ্বেত ছাগ মানস করেন। দেবীপূজায় ছাগ-

* শঙ্করদেব স্বয়ং কোন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন নাই। তৎশিষ্য মাধবদেব "মহাপুরুষীয়" ও দামোদরদেব "দামোদরীয়া" সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন।

বলির বৈধতাসম্বন্ধে তাঁহার সহিত তাঁহার ভগ্নীপতি গয়াপাণির (পূর্ব্বোল্লিখিত শঙ্কর-শিষ্য রামদাস) বিস্তর বাদানুবাদ হয়। গয়াপাণি মাধবকে শঙ্করের নিকট লইয়া যান। শঙ্কর ও মাধবে ঘোর বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হইল; অবশেষে মাধবদেব পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক শঙ্করদেবকে স্বীয় গুরুত্বে বরণ করেন। শঙ্করদেব মাধবের ন্যায় ক্ষম ব্যক্তিকে সহায়স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। অসমীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের মধ্যে শঙ্করদেবের নিম্নেই মাধবদেবের স্থান।

আসাম সুপ্রাচীন কাল হইতেই তন্ত্রশাস্ত্রের বীজভূমি বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। শঙ্করদেবের সময়ে আসামে শাক্তধর্ম্মের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। শঙ্করদেব এই তন্ত্রপ্রধান দেশে নাম-ধর্ম্ম প্রচার এবং গীতাদির আলোচনা করিতে লাগিলেন। অব্রাহ্মণ শঙ্করদেবের শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্মপ্রচার সন্দর্শন করিয়া তৎকালীন আসাম-শাক্তজগতের শীর্ষস্থানীয় বহু ব্রাহ্মণ ঈর্ষাপরবশে তাঁহার বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই প্রতিবন্ধকসমূহ শঙ্করের অমঙ্গলকর না হইয়া বরং ইষ্টজনক হইয়া তাঁহার অসাধারণ শক্তি-বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। নানা বিপৎপাতের মধ্য দিয়াই মহাপুরুষগণের প্রকৃত মহত্ত্ব প্রকটিত হইয়া থাকে। শঙ্করদেবেরও তাহাই হইল। শনৈঃ শনৈঃ ব্রাহ্মণগণ একে একে শঙ্করের নিকট পরাভব স্বীকার করিলেন। শঙ্কর মহোল্লাসে নাম-ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে এক শোচনীয় ঘটনায় শঙ্করদেব হৃদয়ে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। নিষ্ঠুর অহমরাজ বিনাপরাধে তাঁহার জামাতা হরিকে নিহত করেন। কথিত আছে, হরির স্কন্ধচ্যুত মস্তক ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া রামনামোচ্চারণ করিয়াছিল মাধবপ্রমুখাৎ এই দুঃসংবাদ অবগত হইয়া শঙ্করদেব বিমর্ষ হৃদয়ে অত্যাচারী অহমরাজের রাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে তিনি সপরিবারে কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে কামরূপেশ্বর মহারাজ

নরনারায়ণের রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। কামরূপ রাজ্যে প্রথমতঃ কপলা নামক স্থানে ছয়মাস কাল অবস্থান করিয়া তৎপরে তিনি পালন্দী গমন করেন। এই স্থলে সুবিখ্যাত ভক্ত নারায়ণ ঠাকুরের সহিত তাঁহার সম্মিলন হয়। উত্তরকালে ভক্ত নারায়ণদেবের শান্ত-শীতল শুদ্ধ চরিত্রের অমল বিভা ও যশঃপ্রভা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অসমীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে ইনি ভক্তরাজ প্রহ্লাদের অবতাররূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন।

অতঃপর কুমারকুচিতে এক বর্ষকাল বাস করিয়া শঙ্কর পাটবাউসীতে গমন করেন এই স্থানে সত্র * স্থাপিত হইলে পর, চতুর্দ্দিক হইতে ক্রমে ক্রমে ভক্তসমাগম হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে দেব দামোদর আগমন করিলেন। ইনি জাত্যংশে ব্রাহ্মণ ছিলেন। শঙ্করদেবের অসাধারণ কৃষ্ণপ্রেম সন্দর্শনে ইনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। এক দিবস দামোদরদেব ভক্তি পূত-চিত্তে শঙ্কর-দেবকে প্রণিপাত করিয়া তৎসমীপে "শরণ" প্রার্থনা করিলেন। দামোদর জাত্যংশে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া, শঙ্করদেব তাঁহাকে "শরণ" দিতে প্রথমতঃ অস্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহার সনির্ব্বন্ধানুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া, তিনি অবশেষে তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। এই শঙ্করশিষ্য দেব দামোদরই উত্তরকালে "দামোদরীয়া" সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন।

অল্পকাল মধ্যেই শঙ্করদেবের গুণগীতি মহারাজ নরনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ চিলারায় বা শুক্লধ্বজের কর্ণে পৌঁছিল। যুবরাজ শঙ্করদর্শনমানসে ব্যাকুলচিত্তে লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে স্বধামে আনয়ন করিলেন। শুক্লধ্বজের নিকট হইতে শঙ্কর-দেবের অশেষ গুণগরিমা শ্রবণে মহারাজ নরনারায়ণ শঙ্করদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবিধ শাস্ত্রালাপ-জনিত অশেষ আনন্দ উপভোগ করিলেন। শঙ্কর-গুণগ্রাম-বিমোহিত নরনারায়ণ তাঁহাকে পাটবাউসীর 'বরভূঞার' পদ ও তাঁতীকুচির শাসনাধিকার প্রদান করিলেন।

* বঙ্গীয় বৈষ্ণবদিগের আখড়ার অনুরূপ।

শুক্লধ্বজ ও তৎপত্নী ভুবনেশ্বরী শঙ্করের নিকট "শরণ" লইলেন। এইরূপে শঙ্করদেব প্রকৃত গুণগ্রাহী নৃপতি কর্ত্তৃক বহু সম্মান-বিভূষিত হইয়া পাটবাউসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। আগামীবারে সমাপ্য)

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

আলমোড়া।

৯ই জুলাই, ১৮৯৭।

প্রিয় ভগ্নি—

তোমার পত্রখানি পড়ে উহার ভিতরে একটী নৈরাশ্যব্যঞ্জক-ভাব ফল্গুনদীর মত বইছে দেখে বড় দুঃখিত হ'লাম, আর উহার কারণটা কি তাও আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি। প্রথমেই তুমি যে আমাকে সাবধান করে দিয়েছ তার জন্য তোমায় বিশেষ ধন্যবাদ। তোমার ওরূপ লেখার উদ্দেশ্য আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি। আমি রাজা অজিতসিংহের সঙ্গে ইংলণ্ডে যাবার বন্দোবস্ত করেছিলাম, কিন্তু ডাক্তাররা অনুমতি দিলে না কাজেই যাওয়া ঘট্‌ল না। হ্যারিয়েটের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে জান্‌তে পার্‌লে আমি খুব খুসী হব। তিনিও, তোমাদের যার সঙ্গেই হোক্ না কেন দেখা হলে, খুব আনন্দিত হবেন।

আমি অনেকগুলি আমেরিকান কাগজের খণ্ডিতাংশ (cutting) পেয়েছি; তাতে দেখ্‌লাম মার্কিণ রমণীগণ সম্বন্ধে আমার উক্তি-সমূহের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে—আরও তাতে এক অদ্ভুত খবর পেলাম যে, আমাকে এখানে জাতিচ্যুত করা হয়েছে!—আমার জাত থাক্‌লে ত—আমি যে সন্ন্যাসী।

জাত ত কোন রকম যায়ই নি বরং আমি পাশ্চাত্য দেশে যাবার দরুণ সমুদ্রযাত্রার উপর সমাজের যে একটা বিরুদ্ধভাব ছিল তা এক রকম নষ্টই হয়ে গেছে। আমাকে যদি জাতিচ্যুত কর্‌তে হয় তা হলে ভারতের অর্দ্ধেক রাজন্যবর্গ ও সমুদয় শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আমাকে জাতিচ্যুত কর্‌তে হবে। তা ত হয়ই নি বরং আমি সন্ন্যাস নেবার পূর্ব্বে আমার যে জাতি ছিল সেই জাতিভুক্ত প্রধান রাজা আমাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটী সামাজিক ভোজের আয়োজন করেছিলেন তাতে ঐ জাতির অধিকাংশ বড় বড় লোক যোগ দিয়েছিলেন। এ ত গেল তাঁদের তরফ থেকে—আমাদের দিক থেকে ধর্‌লে আমরা ত সন্ন্যাসী—নারায়ণ ভারতে আমরা সামান্য নরলোকের সঙ্গে একত্রে খাই না—আমরা যে দেবতা, তারা যে মর্ত্ত্যলোক—উহাতে আমাদের মর্য্যাদাহানি। আর প্রিয় মেরি, শত শত রাজার বংশধরেরা এই পা ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়েছে, পূজো করেছে—আর সমস্ত দেশের ভিতর যেরূপ আদর অভ্যর্থনা অভিনন্দের ছড়াছড়ি হয়েছে, ভারতে আর এরূপ কারও হয়নি।

এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, রাস্তায় বেরুতে গেলেই এত লোকের ভিড় হয় যে শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের দরকার হয়—জাতিচ্যুত করাই বটে! অবশ্য আমার এইরূপ অভ্যর্থনায় মিশনরী-ভায়াদের রীতিমত গাত্রদাহ হয়েছে। কিন্তু এখানে তাদের পোঁছে কে? তাদের যে একটা অস্তিত্ব আছে সেই সম্বন্ধেই আমাদের খেয়াল নেই।

আমি এক বক্তৃতায় এই মিশনরী ভায়াদের সম্বন্ধে এবং ইংলিস চর্চ্চের অন্তর্ভুক্ত ভদ্র মিশনরীগণকে বাদ দিয়ে—সাধারণ মিশনরী-দলের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলেছিলাম। সেই সঙ্গে আমেরিকার সেই চার্চ্চমাগীদের সম্বন্ধে এবং তাদের পরকুৎসা রটনার সম্বন্ধেও আমায় কিছু বল্‌তেও হয়েছিল।

মিশনরী-ভায়ারা এখানে আমার প্রচারকার্য্যের বিলোপ সাধনের জন্য এইটীকেই সমগ্র মার্কিণ রমণীগণের উপর আক্রমণ বলে ঢাক

পেটাচ্ছে—তারা বেশ জানে শুধু তাদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বল্‌লে যুক্তরাজ্যের লোকেরা খুসীই হবে। প্রিয় মেরি, ধর যদি ইয়াঙ্কিদের বিরুদ্ধে আমি খুব ভয়ানক কথা বলেই থাকি—তারা আমাদের মা বোনের বিরুদ্ধে যে সব কথা বলে তাতে কি তার লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও প্রতিশোধ হয়? ভারতবাসী হিদেন আমাদের উপর খৃশ্চান ইয়াঙ্কি নরনারী যে ঘৃণা পোষণ করেন তা ধৌত করতে পৃথিবীর সমুদয় মহাসমুদ্রের জলেও কুলোয় না—আর আমরা তাদের কি অনিষ্ট করেছি? অপরে সমালোচনা কর্‌লে ইয়াঙ্কিরা ধৈর্য্যের সহিত তা সহ্য কর্‌তে শিখুক, তার পর তারা অপরের সমালোচনা করুক। এটী একটী মনোবিজ্ঞানসম্মত সর্ব্বজনবিদিত সত্য যে যারা সর্ব্বদা অপরকে গালিগালাজ দিতে প্রস্তুত তারা অপরের একটুকু সমালোচনার ঘা সহ্য কর্‌তে পারে না। আর তার পর তাদের আমি কি ধার ধারি! তোমাদের পরিবার, মিসেস বুল, লেগেট্‌রা এবং আর কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি ব্যতীত আর কে আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছে! কে আমার ভাবগুলি কার্য্যে পরিণত কর্‌বার সাহায্য কর্‌তে এসেছিল? আমায় কিন্তু ক্রমাগত খাটতে হয়েছে, যাতে মার্কিণেরা অপেক্ষাকৃত উদার ও ধর্ম্মপ্রবণ হয়—তার জন্য আমেরিকায় আমার সমুদয় শক্তি ক্ষয় কর্‌তে হয়েছে, এখন আমি মৃত্যুর দ্বারে অতিথি!

ইংলণ্ডে আমি কেবল ছমাস কাজ করেছি—একবার ছাড়া কখনও কোন নিন্দার রব উঠেনি—সে নিন্দা-রটনাও একজন মার্কিণ রমণীর কাজ—এই কথা জান্‌তে পেরে ত আমার ইংরাজ বন্ধুরা বিশেষ আশ্বস্ত হলেন। আক্রমণ ত কোন রকম হয়ই নি বরং অনেকগুলি ভাল ভাল ইংলিস চার্চ্চের পাদরি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলেন—আর না চেয়েই আমি আমার কাজের জন্য যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলাম এবং নিশ্চিত আরও পাব। ওখানকার একটা সমিতি আমার কার্য্যের প্রসার লক্ষ্য করে আস্‌ছে এবং উহার জন্য সাহায্যের যোগাড় কর্‌ছে। তথাকার চার জন

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমার কার্য্যের সাহায্যের জন্য সব রকম অসুবিধা সহ্য করেও আমার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এসেছেন। আরও অনেকে আস্‌বার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং এর পর যখন যাব শত শত লোক আরও প্রস্তুত হবে। প্রিয় মেরি, আমার জন্য কিছু ভয় কোরো না। মার্কিণেরা বড় কেবল ইউরোপের হোটেলওয়ালা ও বস্ত্রবিক্রেতাদের চোখে এবং নিজেদের কাছে। জগৎটাতে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে, ইয়াঙ্কিরা চটলেও আমার জগতে স্থানের অভাব হবে না। যাই হোক্ না কেন, আমি যতটুকু কাজ করেছি তাতে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছি। আমি কখনও কোন জিনিষ মতলব করে করিনি। আপনা আপনি যেমন যেমন সুযোগ এসেছে আমি তারই সহায়তা নিয়েছি। কেবল একটা ভাব আমার মস্তিষ্কের ভিতর ঘুরছিল—ভারতবাসী সাধারণ জনগণের উন্নতির জন্য একটা যন্ত্র প্রস্তুত করে চালিয়ে দেওয়া। আমি সে বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য্য হয়েছি। তোমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌তো যদি তুমি দেখ্‌তে আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও দুঃখকষ্টের ভিতর কেমন কাজ কর্‌ছে। কলেরাক্রান্ত পারিয়ার মাদুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তার সেবাশুশ্রূষা কর্‌ছে, অনশনক্লিষ্ট চণ্ডালের মুখে কেমন অন্ন তুলে দিচ্চে, আর প্রভু আমায় তাদের জন্য সাহায্য পাঠাচ্ছেন। মানুষের কথা কি আমি গ্রাহ্য করি? সেই প্রেমাস্পদ প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, যেমন আমেরিকায়, যেমন ইংলণ্ডে, যেমন যখন ভারতের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতুম সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। লোকেরা কি বলে না বলে তাতে আমার কি এসে যায়—ওরা ত বালক। ওরা আর ওর চেয়ে বেশী বুঝ্‌বে কি করে। কি, আমি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেছি, সমুদয় পার্থিব বস্তু যে অসার বুঝেছি, আমি সামান্য বালকদের কথায় আমার নির্দ্দিষ্ট পথ থেকে চ্যুত হব—আমাকে দেখে কি সেইরূপ বোধ হয়?

আমাকে আমার নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বল্‌তে হয়েছে—কারণ, নিজের প্রতি আমার সেটা কর্ত্তব্য ছিল। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি আমার কাজ শেষ হয়েছে। জোর তিন চার বছর জীবন

অবশিষ্ট আছে। আমার নিজের মুক্তির ইচ্ছা সম্পূর্ণ চলে গেছে। আমি সাংসারিক সুখের কখনও প্রার্থনা করিনি। আমি দেখ্‌তে চাই যে, আমি যে যন্ত্রটা প্রস্তুত কর্‌লাম তা বেশ মজবুত, কাজের উপযোগী হয়েছে; আর এটা নিশ্চিত জেনে—অন্ততঃ ভারতে লোকের কল্যাণের জন্য এমন একটী যন্ত্র বসিয়ে গেলাম কোন শক্তি যাকে হঠাতে পার্‌বে না—আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবো, পরে কি হবে সে সম্বন্ধে আর ভাব্‌ব না। আর আমি প্রার্থনা করি যে, আমি বার বার জন্ম গ্রহণ করে সহস্র দুঃখ সহ্য করি, যেন ঐ সকল জন্মে একমাত্র যে ঈশ্বর বাস্তবিক বর্ত্তমান, আমি একমাত্র যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী সেই ঈশ্বরের—সমুদয় জীবাত্মার সমষ্টিস্বরূপ সেই ঈশ্বরের—সর্ব্বোপরি পতিত, দুঃখী, পাপীতাপীরূপী আমার ঈশ্বরের—সকল জাতির দরিদ্র, দুঃস্থরূপী আমার ঈশ্বরের পূজা করিতে পারি—ইহারাই আমার বিশেষ উপাস্য।

"যিনি তোমার ভিতরে, যিনি তোমার বাহিরে, যিনি প্রত্যেক হস্তের দ্বারা কার্য্য কর্‌ছেন ও প্রত্যেক চরণের দ্বারা যিনি চল্‌ছেন, তুমি যাঁর দেহস্বরূপ, তুমি তাঁর পূজা কর, অন্যান্য প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল।

"যিনি উচ্চ ও নীচস্বরূপ, যিনি সাধু ও পাপীস্বরূপ, যিনি দেবতা ও কীটস্বরূপ, সেই প্রত্যক্ষ সত্যস্বরূপ আমাদের জ্ঞানের গোচর সর্ব্বব্যাপী পুরুষের উপাসনা কর, অন্যান্য প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল।

"যাঁহার পূর্ব্বজন্ম নাই, যাঁহার পরজন্ম নাই, যাহার বিনাশ নাই, গমনাগমন নাই, যাঁহাতে আমরা সর্ব্বদা অবস্থিত থেকে অখণ্ডত্ব লাভ করেছি এবং ভবিষ্যতেও কর্‌ব, তাহারই উপাসনা কর, অন্যান্য প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল।"

আমার সময় অল্প, এখন আমার যাহা কিছু বল্‌বার আছে কিছু না চেপে বলে যেতে হবে। ওতে কাহারও হৃদয়ে আঘাত লাগে বা কেউ বিরক্ত হয় এ বিষয়ে লক্ষ্য কর্‌লে চল্‌বে না। অতএব প্রিয় মেরি, আমার মুখ হতে যাই বেরুক না কেন কিছুতেই ভয় পেও না। কারণ, যে শক্তি আমার পশ্চাতে থেকে কাজ কর্‌ছে,

তা বিবেকানন্দ নহে—তা প্রভু স্বয়ং। কিসে ভাল হয়, তিনি ভাল বোঝেন। যদি আমাকে জগৎকে সন্তুষ্ট কর্‌তে হয় তা হলে ত আমার দ্বারা জগতের অনিষ্টই হবে। অধিকাংশ লোক যা বলে তা ভুল, কারণ, দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে তারা চিরকাল লোকের উপর প্রভুত্ব কর্‌ছে এবং জগতের অবস্থা অতি শোচনীয়ই রয়েছে। যে কোন নূতন ভাব প্রচারিত হবে তারই বিরুদ্ধে লোকে লাগ্‌বে; সভ্য যাঁরা তাঁরা শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন না করে উপহাসের হাসি হাস্‌বেন, আর যাঁরা সভ্য নন তাঁরা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ চীৎকার কর্‌বে ও কুৎসিত নিন্দা রটাবে। পৃথিবীর কীট এরাও এক দিন খাড়া হয়ে দাঁড়াবে। অজ্ঞান বালকেরাও এক দিন জ্ঞানালোকে আলোকিত হবে। মার্কিণেরা অভ্যুদয়ের নূতন সুরাপানে এখন মত্ত। অভ্যুদয়ের বন্যা শত শত বার আমার দেশের উপর এসেছে ও চলে গেছে। তাতে আমরা এমন শিক্ষা পেয়েছি যা বালকপ্রকৃতির জাতিরা বুঝ্‌তে এখন অক্ষম। আমরা জেনেছি এ সবই মিছে, এই বীভৎস জগৎটা মায়া মাত্র—ত্যাগ কর, ত্যাগ করে সুখী হও। কামকাঞ্চনের ভাব ত্যাগ কর—অন্য পথ নাই। বিবাহ, স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ, টাকা কড়ি এইগুলি মূর্ত্তিমান পিশাচস্বরূপ। সাংসারিক প্রেম যা কিছু, সব দেহ থেকেই প্রসূত—নিশ্চিত জেনো ঐ প্রেম দেহগত, তা ছাড়া আর কিছু নয়। কামকাঞ্চন-সম্বন্ধ সব ছেড়ে দাও—ঐগুলি যেমন চলে যাবে অমনি দিব্যদৃষ্টি খুলে যাবে, আধ্যাত্মিক সত্য সব সাক্ষাৎকার করবে, তখন আত্মা তাঁর অনন্ত শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হবে। আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল হ্যারিয়েটের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য ইংলণ্ডে যাই। আমার কেবল একটী ইচ্ছা আছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাদের চার বোনের সঙ্গে একবার দেখা করা; আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হবেই হবে। ইতি।

তোমারই

চিরস্নেহাবদ্ধ

বিবেকানন্দ।

প্রাদেশিক সম্মিলনে

"বাঙ্গলার কথা"।

("ভারতের সাধনার" লেখক)

(১)

প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স এতদিনে প্রাদেশিক সম্মিলন হইয়াছে, এবং ইংরাজীশিক্ষিতের পলিটিক্যাল এজিটেশন সেখানে আজ বাঙ্গলার কথায় পরিণত হইয়াছে। সেই জন্য "উদ্বোধনে" আজ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের আলোচনা উপস্থিত না করিয়া থাকা গেল না।

"বাঙ্গলার কথা" এই আখ্যা লাভ করিয়া সভাপতির অভিভাষণটী মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। আমরা উহার একখণ্ড পাইয়াছি। এই অভিভাষণ পড়িতে পড়িতে আনন্দে মন ভরিয়া গিয়াছিল। ইহারই বিষয় আজ কিছু লিখিব।

বহু পুরাকাল হইতে আমাদের দেশেও একটা বিশাল জীবনস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু আমরা—আজকালকার শিক্ষিত সমাজ— সে জীবনের সন্ধান বড় বেশী পাই নাই, কেন না ইস্কুলের কেতাবে, সংবাদপত্রে, বিলাতের আমদানি হাজার হাজার পুস্তকে, সে জীবনের সন্ধান একরূপ দেয় না বলিলেও চলে। আর মহামহিম রাজ-সরকারকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের যে একটা নূতন জীবনজাল শতেক বৎসর ধরিয়া আমরা গড়িয়া তুলিতেছি, তাহাও ঐ সনাতন জীবন-প্রবাহে জলরাশির উপর তৈলধারার মত ভাসিয়া চলিয়াছে, কিছুতেই মিশিয়া যাইতে পারে নাই। যদি বল, জলের সহিত তেলের মিশিতেই হইবে, তবে তোমার সে চেষ্টা, সে পুরুষকারের কে সমর্থন করিবে?

কিন্তু সেই চেষ্টা ও পুরুষকারের ক্ষণিক উদ্দীপনায় আমাদের

কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স এতদিন ডগ্‌মগ্‌ করিত। পাশ্চাত্যে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের স্বদেশপ্রেম রাজসরকাররূপ কর্ম্মযন্ত্রকে নিয়মিত করিয়া, ঐ যন্ত্র হইতে দেশের লোকের সর্ব্ববিধ কল্যাণের ব্যবস্থা করাইয়া লয়। ইহার নাম পলিটিক্স। আমাদের দেশে এই পলিটিক্সের অনুকরণে, জলরাশিতে তৈলবৎ ভাসমান শিক্ষিতসমাজ হইতে কয়েকশত প্রতিনিধি আপনাদের আপনারা নির্ব্বাচিত করিয়া লন, তাহারপর ইংরাজপ্রতিষ্ঠিত রাজসরকারের অভিমুখে তাঁহাদের স্বদেশ-প্রেম ছুটিয়া যায়, কেন না সেই রাজসরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার লাভ করা পাশ্চাত্য পলিটিক্সের প্রথম সোপান। সেই ক্ষমতা লাভ করিলে তবে ত রাজসরকাররূপ যন্ত্র হইতে দেশের সকল রকম কল্যাণের ব্যবস্থা আদায় করা যাইবে!

রাজসরকারের দিকে স্বদেশপ্রেমের এই অনিবার্য্য গতিই পাশ্চাত্য পলিটিক্সের অন্ধ অনুকরণ। যখন এই আবেগময়ী গতি রাজ-সরকারের দ্বারে দ্বারে ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়ায় তখন ঐ গতির অনিবার্য্যতার অনুপাতে এনার্কিজমের উদ্ভব অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

এবারকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় স্বদেশ-প্রেমের এই অন্ধগতিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, রাজসরকারের দিক হইতে যুগযুগান্তের প্রজাসাধারণের দিকে ছুটিয়া আসিবার জন্য আমাদের স্বদেশপ্রেমকে আহ্বান করিয়াছেন। কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সের সভাপতির পক্ষে এ বড় সামান্য কৃতিত্ব নহে। এনার্কিজমের জড় মারিবার পক্ষে এর চেয়ে বড় চাল আর কি হইতে পারে? সভাপতি মহাশয়ও এক জায়গায় বলিয়াছেন, "আমার মনে হয় এই কাজ করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও কাজে লাগিতে না পারায় দেশের যুবকদিগের মধ্যে একটা অসহিষ্ণুতার ভাব—একটা নৈরাশ্যের বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই রাজবিদ্রোহিতা সেই অসহিষ্ণুতা ও সেই নৈরাশ্যের ফল।"

এতকাল কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সের প্রস্তাবিত কার্য্যপ্রণালী দেশের

যুবককে রাজসরকারের দিকে ধাবিত করিয়াছে, তাহাকে প্রকৃত দেশের কাজ দিতে পারে নাই। তাহার আশা-ভরসা, তাহার চিন্তা-সাধনা, তাহার বাদ-প্রতিবাদ, তাহার রোষ আস্ফালন, তাহার আদর-অভ্যর্থনা, তাহার সমস্ত হৃদয়াবেগের সম্মুখে সে রাজসরকারকেই দেখিতে পাইয়াছে। কিন্তু এ কি বিলাতের রাজসরকার যে সমস্ত দেশের জীবন, সমস্ত দেশের ইতিহাস, সেই রাজসরকারে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে আর সেই কল্যাণময়ী মূর্ত্তিকে যে দিকে নাড়িয়া বসাইতেছ সেইদিকেই ধর্ম্মে কর্ম্মে সমাজে শিক্ষায় ব্যবসা বাণিজ্যে —লোককল্যাণ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে? বিলাতে দেশের কাজ এ ভাবে নিশ্চয়ই হইতে পারে, আমাদের দেশে হইতে পারে না। আর হইতে পারে না বলিয়াই পলিটিক্যাল এজিটেশনের সমুদ্র-মন্থনে গরলই বেশী উঠিতেছে, অমৃতের কোনও সন্ধান নাই।

আমাদের দেশে বহু বহু শতাব্দী হইতে দেশের কাজ দেশের লোকেই করিয়া আসিয়াছে রাজসরকার তাহার তত্ত্বাবধায়ক। গ্রামে গ্রামে লোকে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন নিজের হাতে করিয়া নিজের ভাবে সংসার পালন করিয়াছে, নিজের ভাবে ভবপার হইবার তরণী প্রস্তুত করিয়াছে। রাজা রাজরাজড়ার বিবাদ বিসম্বাদের অবসরে কেবল তত্ত্বাবধান করিয়াছেন—তাহারা নিজেদের ধর্ম্ম, নিজেদের কাজ করে কিনা এবং সেই ধর্ম্মকর্ম্মের বিঘ্ন অপসারণ করিয়াছেন। এই তত্ত্বাবধান, এই বিঘ্নাপসারণের জন্য রাজা প্রজার নিকট কর আদায় করিয়াছেন। সে কর রাজার জমির ভাড়া নয়, রাজার কাজের মজুরি।

আর এই যে দেশের লোকের ধর্ম্ম ও কাজ, তাহার ব্যবস্থা-বিধানও রাজা দিতেন না, দিতেন ব্রাহ্মণ অথবা অভাবপক্ষে সন্ন্যাসী। ফলে সাংসারিক সমস্ত প্রয়োজনের যে সাধনা, তাহাও যথাকালে পরমার্থসাধনায় পৌঁছিয়া দিতে পারিত, পরমার্থরূপ একই লক্ষ্যের সাধনে আর সমস্ত অর্থ বা প্রয়োজন নিয়ন্ত্রিত হইতে পারিত। প্রাচীন

ভারতের দেশের কাজের এই যে প্রকৃতি, তাহা সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় গোড়াতেই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন; তিনি বলিতেছেন, "আমাদের কৃষিকার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় সামাজিক ব্যবহার পর্য্যন্ত, আমাদের সকল ভাব সকল ভাবনা সকল চেষ্টা ও সকল সাধনার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ ছিল ও আছে তাহার বিচার অবশ্যকর্ত্তব্য। সে দিকে চোখ না রাখিলে সব দিকই যে অন্ধকার দেখিবে। সব প্রশ্নই যে অকারণে অস্বাভাবিকভাবে জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিবে। সেই দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোন মীমাংসাই সম্ভবপর হইবে না।"

যে দেশে দেশের কাজের মূলপ্রকৃতি এইরূপ, সে দেশে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন কি ভাবে গড়িয়া উঠিবে সে কথাও সভাপতির অভিভাষণে উত্থাপিত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "এই যে মিলন যাহাতে অনেকেই বিশ্বাস করেন এবং আমিও বিশ্বাস করি, সেই মিলনের যথার্থ মর্ম্ম কি? এই বিষয়টা দুই দিক দিয়া দেখা যায়, ইহাকে জাতিত্বের দিক দিয়া অর্থাৎ বাঙ্গালী জাতির যে জাতিত্ব ও ইংরাজ জাতির যে জাতিত্ব, এই দুইটী সত্যের দিক দিয়া দেখা যায়। আর একটা দিক দিয়াও দেখা যায়—সেটা আমাদের নিজ নিজ শাসন বিভাগ অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের দিক দিয়া।

"শুধু জাতিত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর যথার্থ মিলনভূমি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আমি আগেই বলিয়াছি, দুইটী জাতি যখন নিজ নিজ প্রকৃতির মধ্যে নিজ নিজ স্বভাবধর্ম্মের গুণে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখনই তাহাদের মধ্যে যথার্থ আদান-প্রদান ও মিলন সম্ভব হয়। যখন ইংরাজ ও বাঙ্গালী উভয় জাতিই সেই প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে তখনই তাহাদের মধ্যে প্রকৃত মিলন হইবে।"

আর শাসনবিভাগ অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের দিক দিয়া "বিচার করিতে হইলে ইহা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, দুইটী স্বতন্ত্র জাতি নিজ

নিজ বিশিষ্ট রূপেই বিকশিত হইলেও এই দুইটী শাসনবিভাগের উপরদিকে একটা একছত্র যোগাযোগ থাকিবে। বাঙ্গালী জাতির ও ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরস্পরের শাসনবিভাগের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং সমস্ত ভারতবর্ষের যে শাসনবিভাগ তাহার সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ, একটা বাস্তবিক সম্বন্ধ, গড়িয়া উঠিবেই উঠিবে। কিন্তু সেই সম্বন্ধের ভিতরের প্রকৃতি কি হইবে, বাহিরের আকার কি হইবে, তাহা এখনও ঠিক করিয়া বুঝা এবং বলা অসম্ভব।"

সভাপতি মহাশয়ের এই মন্তব্য আমরা অনুমোদন করি, কিন্তু কথাটা অন্য রকমে এবং আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়। ইংরাজের জাতিত্ব বা nationalism আধুনিক জগৎ-রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, আমাদের জাতিত্ব এখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই। আমাদের জাতিত্ব আমাদের অতীতের ঘটনাপারম্পর্য্যে নিহিত রহিয়াছে, আমাদের জাতির আদর্শ-পুরুষদের জীবনে নিহিত রহিয়াছে। আমাদের জাতিত্ব বা nationalism আমাদের ইতিহাসের তাৎপর্য্য, আমাদের ইতিহাসের মর্ম্মকথা। সেই মর্ম্মকথাকে আজ ব্যক্ত করিতে হইবে। যে গভীর ব্যঞ্জনা সহযোগে সমগ্র ভারতে সমগ্র উচ্চ চিন্তা ও সাধনাকে ইতিহাস চিরকাল একই ছাঁচে ঢালিয়া আসিয়াছে, সেই জাতিত্বের ব্যঞ্জনাকে আজ কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। আমাদের দেশের কাজের যে আজ ইহাই একটী প্রধান লক্ষ্য, কেন না আধুনিক যুগে জাতিত্বের, nationalismএর, অভিব্যক্তিই জীবনযাত্রায় পণের কড়ি। এ পণ না দিলে কোনও দেশই বাঁচিতে পারিবে কিনা বিষম সন্দেহ।

এই জাতিত্ব আমাদের ব্যক্ত করিতে হইবে, আর ইংরাজের জাতিত্ব ইংরাজ ব্যক্ত করিয়াছে। এই দুইটী জাতিত্ব বা nationalismএ প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য ত আছেই, তার উপর অবস্থারও প্রভেদ রহিয়াছে। উভয়ে প্রকৃতিতে বিলক্ষণ কেন, আগে তাহা অল্প কথায় বুঝিয়া দেখা যাক। একটা মানুষের মনুষ্যত্বে যেমন বিশেষ কোনও লক্ষ্যকে সে তাহার পরমপুরুষার্থ বলিয়া ধরিয়া লয় এবং অন্যান্য সমস্ত

সাধনার বিষয়কে সে সেই মূল লক্ষ্যসাধনের অনুকূলে ও সহায়রূপে গ্রহণ করে, তেমনি একটা জাতি বা nationএর জাতিত্বে একটা পরমার্থ বা পরম প্রযোজন (supreme governing end) থাকে এবং সে অন্যান্য জাতীয় প্রয়োজন বা তাহাদের সাধনাকে সেই পরম প্রযোজনের অনুকূলে ও সহায়রূপে নিয়ন্ত্রিত করে। এই যে একটা দেশে সমষ্টিজীবনের সমস্ত প্রয়োজনের অঙ্গাঙ্গিভাবাত্মক সাধনা ও স্থিতি ইহাকেই জাতিত্ব বা nationalism বলে।

এখন ইংরাজের জাতিত্ব ও আমাদের জাতিত্বের প্রভেদ এই যে, যে পরম প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া ইংরাজের জাতিত্ব বা nationalism গড়িয়া উঠিয়াছে, আমাদের ইতিহাস সে প্রয়োজনকে কখনও কার্য্যক্ষেত্রে মুখ্য বলিয়া স্বীকার করে নাই এবং করিবেও না, অতএব আমাদের জাতিত্ব সেরূপ পরম প্রযোজনের সাধনাকে কেন্দ্ররূপে লাভ করিয়া কখনও গড়িয়া উঠিবে না বা আত্মপ্রকাশ করিবে না। জাতিত্ব বা nationalismএ যে প্রযোজনের সাধনা কেন্দ্রস্থানীয়, সেই প্রযোজনটী অন্যান্য সমস্ত প্রযোজনের সার্থকতা, মূল্য, সাধনপ্রণালী প্রভৃতি নিরূপিত করে। এই জন্য পরম প্রয়োজনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমগ্র জাতিত্বের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আসিয়া পড়ে। জীবনের প্রত্যেক প্রয়োজনের সাধনায় সেই বৈশিষ্ট্যের একটা ছাপ থাকে। ইংরাজ পার্থিব জীবনের উৎকর্ষকে জাতীয় জীবনে পরমপুরুষার্থ, পরম প্রযোজন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল, কিন্তু ভারত যখনই একটা সমষ্টিভূত জীবন গড়িতে গিয়াছে, তখনই পরমার্থ বলিতে অন্য কিছু বুঝিযাছে, পার্থিব জীবনকে একটা উপায় মাত্র বিবেচনা করিয়া অমৃতত্ব বা অপরিণামী জীবনকেই পরম পুরুষার্থ বা পরম প্রয়োজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইংরাজ ও ভারতের জাতিত্বের মধ্যে এই মৌলিক বৈলক্ষণ্য রহিয়া গিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে উভয়ের বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াও উভয়ের জাতিত্বের মিলন কতদূর সংঘটিত হইতে পারে।

ইংরাজের জাতিত্বের মত ভারতের জাতিত্বও যদি Political

nationalism হয় অর্থাৎ উভয়েরই স্বদেশধর্ম্ম যদি রাজনীতি-মূলক হয়, তবে মিলন অসম্ভব। অষ্ট্রেলিয়-ক্যানডার দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে খাটে না; ইংরাজী প্রবাদে বলে—জলের চেয়ে রক্ত গাঢ়। জীবনের মূলভাবে, শিক্ষায় দীক্ষায়, আত্মগৌরবে, ইতিহাসের এক বনিয়াদের মাহাত্ম্যে, রক্তে-মাংসে, নিতান্ত আপনার না হইলে রাজনীতিক্ষেত্রে একটা বড় স্বপ্রতিষ্ঠ জাতি আর একটা অপ্রতিষ্ঠ জাতিকে আপনার সহিত এক করিয়া লইতে পারে না, কেন না একটা আলাদা ইতিহাস ও মূলভাব লইয়া যে জাতিটা বাচিয়াছে ও বা চতেছে, তাহাকে বিশ্বাস কি? আজ তাহাকে রাজনীতির মিলনসূত্রে বাধিয়া যথেষ্ট রাজনীতিক ক্ষমতা দিলে, সেই রাজনীতিক ক্ষমতারই স্বভাবধর্ম্মে কাল যে সে সেই মিলনসূত্র ছিঁড়িয়া স্বাধীন হইবে না তাহার প্রমাণ কি? তাই বলিতেছি যে রাজনীতিসূত্রে ইংরাজের সমকক্ষ একটা জাতিত্ব বা nationality লইয়া ভারত একদিন ইংরাজের সহিত মিলনে আবদ্ধ হইবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। ভারতের ধাতেও সে দুরাশা নাই।

তবে রাজনীতিক সাম্যসূত্রে মিলন অসম্ভব হইলেও আরও গভীরতর আদানপ্রদানের যোগসূত্রে মিলন নিশ্চয়ই সম্ভব। যে পরম প্রযোজনের সাধনা, যে আদর্শ লইয়া আমাদের দেশ বাচিয়া আছে ও গৌরবময় জাতিত্ব লাভ করিতে আজও বাচিয়া থাকিবে, সেই আদর্শসূত্রেই কেবল অন্যান্য দেশ ও জাতির সহিত তাহার অকৃত্রিম যোগাযোগ স্থাপিত হইতে পারে। এ দুনিয়ায় প্রাণের কথা লইয়াই মানুষে মানুষে স্থায়ী সৌহৃদ্য হয়, স্বার্থপরতার মিলনসূত্র কয়দিন টিকে? রাজনীতি বা পলিটিক্স কি আজ ইউরোপের আন্তর্জাতিক মিলন বাচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে? সেইজন্য ভারত ইংরাজের সহিত আরও গভীরতর যোগসূত্রে মিলিত হইতে চাহে। ইংরাজ আজ ভারতের রাজা, তাহার সে রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকুক। কেবল ভারতলক্ষ্মী ইংরাজকে যে রাজটীকা দিয়াছেন, ইংরাজ সেই রাজটীকার মর্য্যাদা রক্ষা করুক, তাহা হইলেই ভারতে তাহার সিংহাসন

অচল থাকিবে। ভারতে রাজার ধর্ম্ম—ভারতীয় সর্ব্ববিধ সাধনায় "তত্ত্বাবধান ও বিঘ্নাপসারণ"। যিনি সেই রাজার ধর্ম্ম ভারতে পালন করিবেন, ভারতে তাঁহার রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ভারতের রাজনীতি মানে ঐ রাজার ধর্ম্ম; ইংরাজের রাজনীতির অর্থ প্রজাশক্তির দ্বারা রাজৈশ্বর্য্য ও রাজপ্রতিপত্তির সম্ভোগ। এই ইংরাজের রাজনীতির উপর দাড়াইয়া ইংরাজ ও আমাদের শিক্ষিত সমাজের বিবাদ বাধিয়াছে। আজ উভয়কেই ইংরাজের রাজনীতি হইতে ভারতের রাজনীতিতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। তবেই সকলপক্ষে কল্যাণ ও শান্তি।

ভারতীয় রাজধর্ম্ম যদি ইংরাজ পালন করেন, তবে একদিকে রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার কর্ত্তৃত্ব বজায় থাকিবে ও অপরদিকে আমাদের জাতিত্ব নির্ব্বিঘ্নে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের nationalism রাজনীতি বা রাজনীতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্র করিয়া বর্দ্ধিত হয় নাই, হইতেও চাহে না এবং পারে না। পরমার্থের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচারই ঐ জাতিধর্ম্মের কেন্দ্র-স্থানীয় এবং সেই কেন্দ্রীভূত প্রয়োজনের অনুরোধেই আর সমস্ত জাতীয় জীবনের প্রয়োজনের সাধনা। এ অবস্থায় রাজধর্ম্মরূপ প্রয়োজনের সাধনা যদি ইংরাজের উপরই সংন্যস্ত থাকে, তবে আমাদের জাতিত্বের অভিব্যক্তিতে ক্ষতি কি? বরং আধুনিক জগতে রাজশক্তিতে রাজশক্তিতে যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবর্ত্তে ভারতকে সাক্ষাৎভাবে যদি ঝাঁপ দিতে হইত, তাহা হইলে তাহার বিশিষ্ট জাতিত্বের সাধনা যে শুধু বিকৃত হইত তাহা নহে, সে সাধনার বিলোপ হইবার খুবই সম্ভাবনা থাকিত। আমাদের রাজশক্তি ইংরাজের হাতে থাকায়, আজ দৈন্যদারিদ্র্যের মধ্যে বাঁচিয়াও আমরা জগতে ঐশ্বর্য্যমদমত্ততার পরিণাম দূর হইতে দেখিয়া প্রকৃত জাতীয় জীবনের শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছি।

অতএব ভারতে ইংরাজ রাজা ও আমরা প্রজা বলিয়া আমাদের প্রকৃত জাতিত্বের বিকাশে কোনও বিঘ্ন ঘটিতেছে না, কেবল বিঘ্ন

ঘটে যদি ইংরাজ ভারতীয় রাজধর্ম্ম পালন না করেন ও আমরা ভারতীয় প্রজাধর্ম্ম পালন না করি। ভারতীয় প্রজাধর্ম্ম কি তাহা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। ভারতের প্রজা একরূপ সম্পূর্ণভাবেই গ্রামে বাস করে, আপনার গ্রাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, ক্ষেত্রে ক্ষুধার অন্ন জন্মায, নদী পুষ্করিণী কূপে তৃষ্ণার জলের ব্যবস্থা করে, লজ্জানিবারণের বস্ত্র বুনে, ঘরের তৈজসপত্র নির্ম্মাণ করে, এবং দানধ্যানে, ধর্ম্মকর্ম্মে আর সমস্ত প্রয়োজন সাধনার সার্থকতা লাভ করে। ভারতীয় প্রজার এই সরল জীবন-কাণ্ড আরও কত মহত্তর সাধনায় পল্লবিত ও পুষ্পিত হয় বটে, কিন্তু জীবনের আসল মূলসূত্রটী ভারতীয় প্রজা কখনও হারায় না—দেশের কাজ দেশের লোকে করিবে তাহার জন্য রাজার দ্বারস্থ হইতে হইবে না; আর সেই দেশের কাজ করাইবেন ধর্ম্মাচার্য্যগণ; রাজা কেবল সকলের স্বধর্ম্ম ও কর্ম্মের তত্ত্বাবধান ও বিঘ্নাপসারণ করিবেন। এই তত্ত্বাবধান ও বিঘ্নপসারণ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার ব্যবস্থা সরঞ্জাম ইংরাজরাজ গড়িয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শাসনকার্য্যে আসল ভাবেই ভুল রহিয়া গিয়াছে এবং শিক্ষিত সমাজ ইংরাজের রাজনীতির দাবী করিয়া ও অপরদিকে ভারতীয় প্রজা-ধর্ম্মের অপলাপ করিয়া রাজা-প্রজার সম্বন্ধটীকে বিকৃত করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু এখনও সময় আছে। এখনও আমরা নিজেরা ভারতীয় প্রজাধর্ম্মে আগে ফিরিয়া, পরে ভারতীয় রাজধর্ম্ম আশ্রয় করিবার জন্য ইংরাজ রাজসরকারকে অনুরোধ করিতে পারি। কারণ এক-মাত্র এই পথেই ইংলণ্ড ও ভারতের স্থায়ী মিলন সম্ভবপর, একমাত্র এই পথেই ভারতীয় প্রজাসাধারণ এক অখণ্ড দেশ এবং সেই দেশের এক ব্যাপক জাতীয় সাধনায় অনুপ্রাণিত হইয়া আপনাদের জাতি-ত্বকে জগতে ব্যক্ত করিতে পারেন। ইংলণ্ডের রাজশক্তি ভারতীয় রাজধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সেই অপূর্ব্ব জাতিত্বের অভিব্যক্তির যদি সহায় হয়, তবে সে কি তাহার সামান্য গৌরব!

এবার কথায় কথায় আলোচনা বাড়িয়া গেল। আগামীবারে সভাপতি মহাশয় যে কার্য্যপ্রণালীর প্রস্তাব করিয়াছেন তাঁহার কথা আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এবার অভিভাষনের মূল সূত্রগুলির বিচার হইল। সেই মূল সূত্রগুলি প্রস্তাবিত কার্য্যপ্রণালীতে যথাযথ প্রয়োগ করা হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষার বিষয়। সভাপতি মহাশয় যে স্তবকে তাঁহার "বাঙ্গলার কথা" বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিলাম। আমরা দেখিলাম, সে স্তবকে দুইটী কথায় ব্যক্ত হয়, ১ম, দেশের কাজ দেশের লোকই করিবে; রাজাকে দিয়া উহা করাইবার জন্য আর্জ্জি পেশ করা দেশের কাজ নহে। ২য়, আমাদের একটা বিশিষ্ট জাতিত্ব আছে; সেই জাতিত্ব বজায় রাখিয়া ইংরাজের সহিত মিলিত হইতে হইবে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

ইংরাজী ১৯১৪ সালে তমলুকে একটী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। আশ্রম হইতে স্থানীয় দরিদ্র অধিবাসিগণকে নানাভাবে সেবা করা হয়, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে কার্য্যব্যপদেশে আগত আশ্রয়হীন গরীব জনসাধারণ পীড়িত হইয়া পড়িলে, তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া আশ্রমে আনিয়া ঔষধ-পথ্যাদির দ্বারা সেবা করা হয়; বৃদ্ধ এবং অক্ষম ব্যক্তিগণকে যথাসাধ্য সেবা করা হয়, এমন কি কাহাকে কাহাকেও আশ্রমে রাখা হয়।

স্থানীয় আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত শ্রীপতি চরণ বসু মহাশয় আশ্রমের বাটী নির্ম্মাণের জন্য একখণ্ড জমি দান করিয়া সকলেরই ধন্যবাদাই হইয়াছেন। ঐ স্থানের উপর একটী পাকা বাটী নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে। সাধারণের সহানুভূতিতে উক্ত কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু এখনও উহার অনেক কাজ বাকী আছে। আশা করি, উহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণের সহানুভূতির অভাব হইবে না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

ঠাকুরের ভক্তসংঘ ও নরেন্দ্রনাথ।

(স্বামী সারদানন্দ)

ঠাকুর যোগদৃষ্টিসহায়ে যে সকল ভক্তের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কথা বহু পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা সকলেই ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ অতীত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার নিকটে আগমন করিয়াছিল। কারণ, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পূর্ণ তাঁহার নিকটে আসিয়াছিল এবং তাহাকে কৃপা করিবার পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "এখানে আসিবে বলিয়া যাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম পূর্ণের আগমনে সেই শ্রেণীর ভক্তসকলের আসা সম্পূর্ণ হইল; অতঃপর ঐ শ্রেণীর আর কেহ এখানে আসিবে না।"

পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই আবার, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগের ভিতরে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। নরেন্দ্র তখন সাংসারিক অভাব-অনাটনের সহিত সংগ্রামে ব্যস্ত এবং রাখাল কিছুকালের জন্য শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সকল ভক্তদিগের মধ্যে কাহারও আসিবার কথা, ঠাকুর সমীপস্থ ব্যক্তিদিগের নিকটে "আজ (উত্তর দক্ষিণাদি কোন দিক দেখাইয়া) এই দিক হইতে এখানকার একজন আসিতেছে" এইরূপে পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিতেন। কেহ বা উপস্থিত হইবামাত্র "তুমি এখানকার লোক" বলিয়া পূর্ব্ব-পরিচিতের ন্যায় সাদরে গ্রহণ করিতেন। কোন ভাগ্যবানের সহিত প্রথম

সাক্ষাতের পরে তাহাকে পুনরায় দেখিবার, খাওয়াইবার ও তাহার সহিত একান্তে ধর্ম্মালাপ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিতেন। কোন ব্যক্তির স্বভাব সংস্কারাদি লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বাগত সমসংস্কারসম্পন্ন কোন ভক্তবিশেষের সহিত তাহাকে পরিচিত করাইয়া তাহার সহিত ধর্ম্মালোচনায় যাহাতে সে অবসরকাল অতিবাহিত করিতে পারে তদ্বিষয়ের সুযোগ করিয়া দিতেন। আবার, কাহারও গৃহে অযাচিতভাবে উপস্থিত হইয়া সদালাপে অভিভাবকদিগের সন্তোষ উৎপাদনপূর্ব্বক যাহাতে তাঁহারা তাহাকে মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে আসিতে নিষেধ না করেন তদ্বিষয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেন।

ঐ সকল ভক্তের আগমন মাত্র অথবা আসিবার স্বল্পকাল পরে ঠাকুর তাহাদিগের প্রত্যেককে একান্তে আহ্বানপূর্ব্বক ধ্যান করিতে বসাইয়া তাহাদিগের বক্ষ, জিহ্বা প্রভৃতি শরীরের কোন কোন স্থান *দিব্যাবেশে স্পর্শ করিতেন। ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে* তাহাদিগের মন বাহিরের বিষয়সমূহ হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সংহৃত ও অন্তর্মুখী হইয়া পড়িত এবং সঞ্চিত ধর্ম্মসংস্কারসকল অন্তরে সহসা সজীব হইয়া উঠিয়া সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শনলাভের জন্য তাহাদিগকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিত। ফলে, উহার প্রভাবে কাহারও দিব্যজ্যোতি মাত্রের অথবা দেব দেবীর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি-সমূহের দর্শন, কাহার গভীর ধ্যান ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, কাহার হৃদ্‌গ্রন্থি সকল সহসা উন্মোচিত হইয়া ঈশ্বর লাভের জন্য প্রবল ব্যাকুলতা, কাহার ভাবাবেশ ও সবিকল্প সমাধি এবং বিরল কাহারও নির্ব্বিকল্প সমাধির পূর্ব্বাভাস আসিয়া উপস্থিত হইত। তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া ঐরূপে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি প্রভৃতির দর্শন কত লোকের যে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা হয় না। তারকের মনে ঐরূপে বিষম ব্যাকুলতা ও ক্রন্দনের উদয় হইয়া অন্তরের গ্রন্থিসকল এক-দিন সহসা উন্মোচিত হইয়াছিল এবং ছোট নরেন উহার প্রভাবে স্বল্পকালে নিরাকারের ধ্যানে সমাধিস্থ হইয়াছিল, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। কিন্তু ঐরূপ স্পর্শে এককালে নির্ব্বিকল্প

অবস্থায় উপনীত হওয়া একমাত্র নরেন্দ্রনাথের জীবনেই হইতে দেখা গিয়াছিল। ভক্তদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে ঠাকুর ঐরূপে স্পর্শ করা ভিন্ন কখন কখন আনবী বা মন্ত্রদীক্ষাও প্রদান করিতেন। ঐ দীক্ষা প্রদানকালে তিনি সাধারণ গুরুগণের ন্যায় শিষ্যের কোষ্ঠি বিচারাদি নানাবিধ গণনা ও পূজাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু যোগদৃষ্টিসহায়ে তাহার জন্মজন্মাগত মানসিক সংস্কারসমূহ অবলোকন-পূর্ব্বক 'তোর এই মন্ত্র' বলিয়া মন্ত্রনির্দেশ করিয়া দিতেন। নিরঞ্জন, তেজচন্দ্র, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি কয়েক জনকে তিনি ঐরূপে কৃপা করিয়াছিলেন, একথা আমরা তাহাদিগের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। শাক্ত বা বৈষ্ণব বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়াই তিনি কাহাকেও সেই মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিতেন না। কিন্তু অন্তঃ-সংস্কার নিরীক্ষণপূর্ব্বক শক্ত্যুপাসক কোন কোন ব্যক্তিকে বিষ্ণু-মন্ত্রে এবং বৈষ্ণব কাহাকেও বা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন। অতএব বুঝা যাইতেছে, যে ব্যক্তি যেরূপ অধিকারী তাহা লক্ষ্য করিয়াই তিনি তাহার উপযোগী ব্যবস্থা সর্ব্বদা প্রদান করিতেন।

ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্রে অন্তরের আধ্যাত্মিক শক্তি অপরে সংক্রমণ-পূর্ব্বক তাহার মনের গতি উচ্চ পথে পরিচালিত করিয়া দিবার কথা শাস্ত্রগ্রন্থসকলে লিপিবদ্ধ আছে। অন্তরঙ্গ শিষ্যবর্গের ত কথাই নাই—বেশ্যা লম্পটাদি দুষ্কৃতকারীদিগের জীবনও ঐরূপে মহাপুরুষ-দিগের শক্তিপ্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি যে সকল মহাপুরুষগণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া সংসারে অদ্যাবধি পূজিত হইতেছেন তাঁহাদিগের প্রত্যেকের জীবনেই ঐ শক্তির স্বল্পবিস্তর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শাস্ত্রে ঐরূপ থাকিলে কি হইবে ঐ শ্রেণীর পুরুষদিগের অলৌকিক কার্য্যকলাপের সাক্ষাৎ পরিচয় বহুকাল পর্য্যন্ত হারাইয়া সংসার এখন ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বরাবতারে বিশ্বাস করা ত দূরের কথা, ঈশ্বর-বিশ্বাসও এখন অনেক স্থলে কুসংস্কারপ্রসূত মানসিক

দুর্ব্বলতার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। মানবসাধারণের চিত্ত হইতে ঐ অবিশ্বাস দূর করিয়া তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন করিতে ঠাকুরের ন্যায় অলৌকিক পুরুষের সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করা বর্ত্তমান যুগে একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত শক্তির প্রকাশ তাঁহাতে অবলোকন করিয়া আমরা এখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধেও ঐ বিষয়ে বিশ্বাসবান্ হইতেছি। ঈশ্বরাবতার বলিয়া ঠাকুরকে বিশ্বাস না করিলেও তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা ও চৈতন্যপ্রমুখ মহাপুরুষ সকলের সমশ্রেণীভুক্ত লোকোত্তর-পুরুষ একবিষয় উহা দেখিয়া কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পূর্ব্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণের মধ্যে বালক ও বৃদ্ধ, সংসারী ও অসংসারী, সাকার ও নিরাকারোপাসক, শাক্ত বৈষ্ণব অথবা অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থা ও অশেষ প্রকার ভাবের লোক বিদ্যমান ছিল। ঐরূপ অশেষ প্রভেদ বিদ্যমান থাকিলেও এক বিষয়ে তাহারা সকলে সমভাবসম্পন্ন ছিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত ও পথে আন্তরিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং নিষ্ঠাবান্ থাকিয়া ঈশ্বরলাভের নিমিত্ত অশেষ ত্যাগ স্বীকারে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। ঠাকুর তাহাদিগকে নিজ স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের ভাব রক্ষাপূর্ব্বক সামান্য বা গুরুতর সকল বিষয়ে তাহাদিগের সহিত এমন ব্যবহার করিতেন যে, তাহারা প্রত্যেকেই অনুমান করিত তিনি সকল ধর্ম্মমতে পারদর্শী হইলেও সে যে পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাতেই অধিকতর প্রীতিসম্পন্ন। ঐরূপ ধারণাবশতঃ তাঁহার উপর তাহাদিগের ভক্তি ও ভালবাসার অবধি থাকিত না। আবার, তাঁহার সঙ্গগুণে এবং শিক্ষাদীক্ষা প্রভাবে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীসমূহ একে একে অতিক্রমপূর্ব্বক উদারভাবসম্পন্ন হইবামাত্র তাঁহাতেও ঐ ভাবের পূর্ণতা দেখিতে পাইয়া তাহারা প্রত্যেকে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপে এখানে সামান্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি—

কলিকাতা বাগবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বসু বৈষ্ণববংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সংসারে

থাকিলেও ইনি অসংসারী ছিলেন এবং যথেষ্ট ধন সম্পত্তির অধিকারী হইলেও ইঁহার হৃদয়ে অভিমান কখনও স্থান পায় না। ঠাকুরের নিকটে আসিবার পূর্ব্বে ইনি প্রাতে পূজা পাঠে চারি পাঁচ ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিতেন শ্রবণ করিয়াছি। অহিংসাধর্ম্ম-পালনে তিনি এতদূর যত্নবান্ ছিলেন যে, কীট পতঙ্গাদিকেও কখন কোন কারণে আঘাত করিতেন না। ঠাকুর ইঁহাকে দেখিয়াই পূর্ব্বপরিচিতের ন্যায় সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "ইনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সাঙ্গোপাঙ্গের অন্যতম—এখানকার লোক, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুপাদদিগের সহিত সঙ্কীর্ত্তনে হরিপ্রেমের বন্যা আনিয়া কিরূপে মহাপ্রভু দেশের আবালবৃদ্ধ নরনারীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন তাহা দর্শন করিবার কালে ঐ অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তন দলের মধ্যে ইঁহাকে (বলরামকে) দেখিয়াছিলাম।"

ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে বলরামের মন নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়াছিল। বাহ্যপূজাদি বৈধী ভক্তির সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক স্বল্পকালেই তিনি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও সদসদ্বিচারবান্ হইয়া সংসারে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্ত্রী পুত্র ধন-জনাদি সর্ব্বস্ব তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদনপূর্ব্বক দাসের ন্যায় তাঁহার সংসারে থাকিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন এবং ঠাকুরের পূতসঙ্গে যতদূর সম্ভব কাল অতিবাহিত করাই ক্রমে বলরামের জীবনোদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুরের কৃপায় স্বয়ং শান্তির অধিকারী হইয়াই বলরাম নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। নিজ আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সকলেই যাহাতে ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া যথার্থ সুখের আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হয় তদ্বিষয়ে অবসর অন্বেষণপূর্ব্বক তিনি সর্ব্বদা সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐরূপে বলরামের আগ্রহে বহুব্যক্তি ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয়লাভে ধন্য হইয়াছিল।

বাহ্যপূজার ন্যায় অহিংসাধর্ম্মপালনসম্বন্ধ মতও বলরামের কিছুকাল পরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে অন্য সময়ের কথা দূরে থাকুক

উপাসনাকালেও মশকাদি দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তিনি তাহাদিগকে আঘাত করিতে পারিতেন না, মনে হইত, উহাতে সমূহ ধর্ম্মহানি উপস্থিত হইবে। এখন ঐরূপ সময়ে সহসা একদিন তাঁহার মনে উদয় হইল, সহস্রভাবে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শ্রীভগবানে সমাহিত করাই ধর্ম্ম, মশকাদি কীটপতঙ্গের জীবন রক্ষায় উহাকে সতত নিযুক্ত রাখা নহে, অতএব দুই চারিটা মশক নাশ করিয়া কিছুক্ষণের জন্যও যদি তাহাতে চিত্ত স্থির করিতে পারা যায় তাহাতে অধর্ম্ম হওয়া দূরে থাকুক সমধিক লাভই আছে। তিনি বলিতেন, "অহিংসাধর্ম্ম প্রতিপালনে মনের এতকালের আগ্রহ ঐরূপ ভাবনায় প্রতিহত হইলেও চিত্ত ঐবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহ নির্ম্মুক্ত হইল না। সুতরাং ঠাকুরকে ঐবিষয় জিজ্ঞাসা করিতে দক্ষিণেশ্বরে চলিলাম। যাইবার কালে ভাবিতে লাগিলাম, অন্য সকলের ন্যায় তাঁহাকে কোন দিন মশকাদি মারিতে দেখিয়াছি কি ?— মনে হইল না ; স্মৃতির আলোকে যতদূর দেখিতে পাইলাম তাহাতে আমাপেক্ষাও তাঁহাকে অহিংসাব্রতপরায়ণ বলিয়া বোধ হইল। মনে পড়িল, দুর্ব্বাদলশ্যামল ক্ষেত্রের উপর দিয়া অপরকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া নিজবক্ষে আঘাত অনুভবপূর্ব্বক তিনি যন্ত্রণায় এক সময়ে অধীর হইয়াছিলেন— তৃণরাজীমধ্যগত জীবনীশক্তি ও চৈতন্য এত সুস্পষ্ট এবং পবিত্রভাবে তাঁহার নয়নে প্রতিভাসিত হইয়াছিল। স্থির করিলাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই, আমার মনই আমাকে প্রতারণা করিতে পূর্ব্বোক্ত চিন্তার উদয় করিয়াছে। যাহা হউক তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসি, মন পবিত্র হইবে।

"দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া ঠাকুরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে দূর হইতে তাঁহাকে যাহা করিতে দেখিলাম তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি নিজ উপাধান হইতে ছারপোকা বাছিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন! নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, 'বালিসটাতে বড় ছারপোকা হইয়াছে, দিবারাত্রি দংশন করিয়া চিত্তবিক্ষেপ এবং নিদ্রার

ব্যাঘাত করে, সে জন্য মারিয়া ফেলিতেছি।' জিজ্ঞাসা করিবার আর কিছুই রহিল না, ঠাকুরের কথায় এবং কার্য্যে মন নিঃসংশয় হইল। কিন্তু স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, গত দুই তিন বৎসর কাল ইঁহার নিকটে যখন তখন আসিয়াছি, দিনে আসিয়াছি রাত্রে ফিরিয়াছি, সন্ধ্যায় আসিয়া রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছি। প্রতি সপ্তাহে তিন চারি দিন ঐরূপে আসা যাওয়া করিয়াছি, কিন্তু এক দিনও ইঁহাকে এইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখি নাই—ঐরূপ কেমন করিয়া হইল? তখন নিজ অন্তরেই ঐবিষয়ের মীমাংসা উদয় হইয়া বুঝিলাম, ইতিপূর্ব্বে ইঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিলে আমার ভাব নষ্ট হইয়া ইঁহার উপরেই হয়ত অশ্রদ্ধার উদয় হইত—পরম কারুণিক ঠাকুর সে জন্য এই প্রকারের অনুষ্ঠান আমার সমক্ষে পূর্ব্বে কখনও করেন নাই!"

পূর্ব্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণ ভিন্ন অন্য অনেক নরনারী এইকালে ঠাকুরকে দর্শনপূর্ব্বক শান্তি লাভের জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদিগকেও তিনি সস্নেহে গ্রহণপূর্ব্বক কাহাকেও উপদেশ দানে আবার কাহাকেও বা দিব্যাবেশে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ঐরূপে যত দিন যাইতে ছিল ততই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এক বৃহৎ ভক্তসংঘ স্বতঃ গঠিত হইতেছিল। তন্মধ্যে বালক ও অবিবাহিত যুবকদিগের ধর্ম্মজীবন গঠনে তিনি অধিকতর লক্ষ্য রাখিতেন। ঐ বিষয়ের কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক তিনি বহুবার বলিয়াছেন, "ষোল আনা মন না দিলে ঈশ্বরের পূর্ণদর্শন কখনও লাভ হয় না। বালকদিগের সম্পূর্ণ মন তাহাদের নিকটে আছে, স্ত্রী পুত্র, ধন সম্পত্তি, মান যশ প্রভৃতি পার্থিব বিষয় সকলে ছড়াইয়া পড়ে নাই; এখন হইতে চেষ্টা করিলে ইহারা ষোলআনা মন ঈশ্বরে অর্পণপূর্ব্বক তাঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইতে পারিবে—ঐজন্যই ইহাদিগকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিতে আমার অধিক আগ্রহ!" সুযোগ দেখিলেই ঠাকুর ইহাদিগের প্রত্যেককে একান্তে লইয়া যাইয়া যোগধ্যানাদি ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গ সকলের এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনে উপদেশ

করিতেন। অধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া ইহাদিগকেও তিনি ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন এবং শান্তদাস্যাদি যে ভাবের সম্বন্ধ ইষ্টদেবতার সহিত পাতাইলে তাহারা প্রত্যেকে উন্নতিপথে সহজে অগ্রসর হইতে পারিবে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন।

বালকদিগকে শিক্ষাপ্রদানে ঠাকুরের সমধিক আগ্রহের কথা শুনিয়া কেহ যেন না ভাবিয়া বসেন, সংসারী গৃহস্থ ভক্তদিগের প্রতি তাঁহার কৃপা ও করুণা স্বল্প ছিল। উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মতত্ত্বসকলের অভ্যাস ও অনুশীলনে তাহাদিগের অনেকের সময় ও সামর্থ্য নাই দেখিয়াই তিনি তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে বলিতেন না। কিন্তু কাম-কাঞ্চন ভোগবাসনা ধীরে ধীরে কমাইয়া ভক্তি মার্গ দিয়া যাহাতে তাহারা কালে ঈশ্বরলাভে ধন্য হইতে পারে এইরূপে তাহাদিগকে নিত্য পরিচালিত করিতেন। ধনী ব্যক্তির গৃহে দাস দাসীদিগের ন্যায় মমতা বর্জ্জনপূর্ব্বক ঈশ্বরের সংসারে অবস্থান ও নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে উপদেশ করিতেন। "দুই একটি সন্তান জন্মিবার পরে ঈশ্বরে চিত্ত অর্পণ করিয়া ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায় স্ত্রী পুরুষের সংসারে থাকা কর্ত্তব্য"—ইত্যাদি বলিয়া যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। তদ্ভিন্ন নিত্য সত্য পথে থাকিয়া সকলের সহিত সরল ব্যবহার করিতে, বিলাসিতা বর্জ্জনপূর্ব্বক 'মোটা ভাত মোটা কাপড়' মাত্র লাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া শ্রীভগবানের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে এবং প্রত্যহ দুই সন্ধ্যা ঈশ্বরের স্মরণ-মনন, পূজা, জপ, ও সংকীর্ত্তনাদি করিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন। গৃহস্থদিগের মধ্যে যাহারা ঐসকল করিতেও অসমর্থ বুঝিতেন, তাহাদিগকে সন্ধ্যাকালে একান্তে বসিয়া হাততালি দিয়া হরিনাম করিতে এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত মিলিত হইয়া নাম-সংকীর্ত্তনের উপদেশ করিতেন। সাধারণ নরনারীগণকে একত্রে উপদেশ কালে আমরা তাঁহাকে অনেক সময়ে ঐকথা এইরূপে বলিতে শুনিয়াছি—কলিতে কেবলমাত্র নারদীয়-ভক্তি—উচ্চৈঃরোলে নামকীর্ত্তন করিলেই

জীব উদ্ধার হইবে; কলির জীব অন্নগতপ্রাণ, অল্পায়ু, স্বল্পশক্তি—সে জন্যই ধর্মলাভের এত সহজ পথ তাহাদিগের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আবার, যোগধ্যানাদি কঠোর সাধনমার্গের কথাসকল শুনিয়া পাছে তাহারা ভগ্নোৎসাহ হয় এজন্য কখন কখন বলিতেন, "যে সন্ন্যাসী হইয়াছে সে ত ভগবানকে ডাকিবেই। কারণ, ঐ জন্যই ত সে সংসারের সকল কর্ত্তব্য ছাড়িয়া আসিয়াছে—তাহার ঐরূপ করায় বাহাদুরী বা অসাধারণত্ব কি আছে? কিন্তু যে সংসারে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদির প্রতি কর্ত্তব্যের বিষম ভার ঘাড়ে করিয়া চলিতে চলিতে একবারও তাঁহাকে স্মরণ-মনন করে ঈশ্বর তাহার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হন - ভাবেন, 'এত বড় বোঝা স্কন্ধে থাকা সত্ত্বে এই ব্যক্তি যে, আমাকে এতটুকুও ডাকিতে পারিয়াছে ইহা স্বল্প বাহাদুরী নহে, এই ব্যক্তি বীর ভক্ত।'

নবাগত শ্রেণীভুক্ত নরনারীদিগের ত কথাই নাই পূর্ব্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণের ভিতরেও ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথকে কত উচ্চাসন প্রদান করিতেন তাহা বলা যায় না। উহাদিগের মধ্যে কয়েক জনকে নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিতেন, ইহারা ঈশ্বরকোটি, অথবা, শ্রীভগবানের কার্য্যবিশেষ সাধন করিবার নিমিত্ত সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। ঐ কয়েক ব্যক্তির সহিত নরেন্দ্রের তুলনা করিয়া তিনি এক দিবস আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"নরেন্দ্র যেন সহস্রদল কমল; এই কয়েক জনকে ঐ জাতীয় পুষ্প বলা যাইলেও ইহাদিগের কেহ দশ, কেহ পনর, কেহ বা বড় জোর বিশদলবিশিষ্ট।" অন্য এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "এত সব লোক এখানে আসিল, নরেন্দ্রের মত একজনও কিন্তু আর আসিল না।" দেখাও যাইত, ঠাকুরের অদ্ভুত জীবনের অলৌকিক কার্য্যাবলীর এবং প্রত্যেক কথার যথাযথ মর্ম্ম-গ্রহণ ও প্রকাশ করিতে তিনি যতদূর সমর্থ ছিলেন অন্য কেহই তদ্রূপ ছিল না। এই কাল হইতেই নরেন্দ্রের নিকটে ঠাকুরের কথাসকল শুনিয়া আমরা সকলে সময়ে সময়ে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতাম, তাই ত, ঐ সকল কথা আমরাও ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি,

কিন্তু উহাদিগের ভিতরে যে এত গভীর অর্থ রহিয়াছে তাহা ত বুঝিতে পারে নাই! দৃষ্টান্তস্বরূপে ঐরূপ একটি কথার এখানে উল্লেখ করিতেছি—

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে আমাদিগের জনৈক বন্ধু দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গৃহমধ্যে ভক্তগণপরিবৃত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রও সেখানে উপস্থিত। নানা সদালাপ এবং মাঝে মাঝে নির্দোষ রঙ্গরসের কথাবার্তাও চলিয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা উঠিল এবং ঐ মতের সার মর্ম্ম সমবেত সকলকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া তিনি বলিলেন, "তিনটি বিষয় পালন করিতে নিরন্তর যত্নবান্ থাকিতে ঐ মতে উপদেশ করে—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন। যেই নাম সেই ঈশ্বর—নাম নামী অভেদ জানিয়া সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান্, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্ব্বদা সাধু ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করিবে; এবং কৃষ্ণেরই জগৎসংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্ব্ব জীবে দয়া" (প্রকাশ করিবে)। 'সর্ব্ব জীবে দয়া' পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন! কতক্ষণ পরে অর্দ্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!"

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ কথা সকলে শুনিয়া যাইল বটে কিন্তু উহার গূঢ় মর্ম্ম কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাব ভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম! শুষ্ক, কঠোর ও নির্ম্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকেই প্রদর্শন করিলেন! অদ্বৈত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন

করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে—একই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। ফলে ঐরূপে উহা লাভ করিতে যাইয়া জগৎ সংসার ও তন্মধ্যগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্ম্মপথের অন্তরায় জানিয়া তাহাদিগের উপরে ঘৃণার উদয় হইয়া সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন তাহাতে বুঝা গেল বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজ উহাকে অবলম্বনে করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে, সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল, ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ—তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? ঐরূপে শিব-জ্ঞানে জীবের সেবা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হইয়া সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।

"ঠাকুরের ঐকথায় ভক্তিপথেও বিশেষ আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায় ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ সাধকের পক্ষে সুদূরপরাহত থাকে। শিব বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা করিলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শনপূর্ব্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্ত সাধক স্বল্পকালেই কৃত-কৃতার্থ হইবে একথা বলা বাহুল্য। কর্ম্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে যে সকল সাধক অগ্রসর হইতেছে তাহারাও ঐ কথায় বিশেষ আলোক পাইবে। কারণ, কর্ম্ম না করিয়া দেহী যখন একদণ্ডও

থাকিতে পারে না তখন শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ কর্ম্মানুষ্ঠানই যে কর্ত্তব এবং উহা করিলেই তাহারা লক্ষ্যে আশু পৌঁছাইবে একথা বলিতে হইবে না। যাহা হউক, ভগবান্ যদি কখন দিন দেন ত আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারের সর্ব্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব!"

লোকোত্তর ঠাকুর ঐরূপে সমাধিরাজ্যে নিরন্তর প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞান, প্রেম, যোগ ও কর্ম্ম সম্বন্ধে অদৃষ্টপূর্ব্ব আলোক প্রতিনিয়ত আনয়নপূর্ব্বক মানবের জীবনপথ সমুজ্জ্বল করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা তাঁহার কথা তখন ধারণা করিতে পারিতাম না। মনস্বী নরেন্দ্রনাথই কেবল ঐ সকল দেববাণী যথাসাধ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেন।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

তাঁহার এক পাশ্চাত্য সেবাব্রতীকে শিক্ষাদান প্রণালী।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

স্বামিজী একবার গাজীপুরের পওহারী বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কার্য্যে সফলতার রহস্য কি?" এবং উত্তর পাইয়াছিলেন, "জোন সাধন তৌন সিদ্ধি"—যাহা সাধন তাহাই সিদ্ধি, অর্থাৎ সাধন বা উপায়গুলিকে সাধ্য বা উদ্দেশ্যের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবে।

এই উক্তিটীর প্রকৃত অর্থ লোকে কালেভদ্রে ক্ষণেকের জন্য বুঝিতে পারে। কিন্তু যদি ইহার অর্থ এই হয় যে, সাধকের সমস্ত

শক্তি উপায়গুলির উপরেই কেন্দ্রীভূত, হওয়া চাই—যেন উহারাই উদ্দেশ্য, তদ্ব্যতিরিক্ত অপর কোন উদ্দেশ্যই নাই, সেই সময়ের জন্য তাঁহাকে এইরূপ জ্ঞান করিতে হইবে—তাহা হইলে উহা গীতার সেই মহতী শিক্ষারই প্রকারান্তর মাত্র হইয়া দাঁড়ায়—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—কর্ম্মেই তোমার অধিকার ফলে নহে।

আমাদের আচার্য্যদেব তদীয় শিষ্যগণকে এই আদর্শটীর অভ্যাসে অনুপ্রাণিত করিবার রহস্য অদ্ভুত রকমে জানিতেন। তিনি অনুভব করিতেন যে, যদি কোন ইউরোপীয় লোক ভারতের জন্য কার্য্য করেন, তবে তাঁহাকে উহা ভারতীয় প্রণালীতেই করিতে হইবে। কেন তিনি ঐরূপ ভাবিতেন, তাহার কারণ তিনিই জানিতেন, এবং হয়ত প্রত্যেক ভারতবাসীই তাহা বুঝিতে পারিবেন। এ বিষয়ে একদিকে যেমন তিনি কোন্‌গুলি মুখ্য ও কোন্‌গুলি গৌণ অঙ্গ তাহার ঠিক রাখিতেন, তেমনি অপরদিকে অতি সামান্য-খুঁটি-নাটী ব্যাপারগুলিকেও বাদ দিতেন না। যে সকল খাদ্য শাস্ত্র-সম্মত, শুধু তাহাই আহার করা, এবং হাতে করিয়া গ্রাস উঠান, মেজেয় বসা ও ঘুমান, হিন্দু আচার সকল পালন করা, এবং হিন্দু-চক্ষে যে সকল আচরণ সু বা কু বলিয়া গণ্য তাহাদিগকে সেইমত সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলা,—এই গুলির প্রত্যেকটী তাঁহার মতে সেই ভারতীয় ভাব আয়ত্ত করিবার উপায়স্বরূপ, যদ্দ্বারা অতঃপর বিদেশীয় লোকগণ জীবনের বড় বড় সমস্যার ভারতীয় সমাধান আপনা হইতেই ঠিক ঠিক ভাবে ধরিতে ও বুঝিতে অভ্যস্ত হইবেন। অতি তুচ্ছ ব্যাপারও, যেমন সাবানের পরিবর্ত্তে বেসন ও লেবুর রস ব্যবহার করা—এগুলিকেও তিনি প্রণিধান যোগ্য ও করণীয় বলিয়া মনে করিতেন। এমন কি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে সকল চিরপোষিত ধারণা অমার্জ্জিত বলিয়াও বোধ হইবে তাহাদিগকেও বুঝিতে ও আপনার করিয়া লইতে চেষ্টা করিতে হইবে। স্বামিজী ভিতরে ভিতরে জানিতেন যে, হয় ত এমন দিন আসিবে,

যখন লোকে তাঁহারই মত ঐ সকল ধারণার পারে যাইবে ; কিন্তু কোন একটা অবস্থার মধ্য দিয়া তাহার পারে যাওয়া, এবং দৃষ্টিহীনতা প্রযুক্ত উহাকে উড়াইয়া দেওয়া বা ঘৃণা করা—এ দুয়ের মধ্যে কত প্রভেদ !

কোন একটী প্রথা শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর্নিহিত আদর্শটীকে দেখাইয়া দিবার স্বামিজীর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আজি পর্য্যন্ত আমরা ফুঁদিয়া আলো নিবানকে মহা অপবিত্র ও অসভ্যজনোচিত কার্য্য ভাবিয়া শিহরিয়া উঠি ; আবার শাড়ীপরা ও ঘোমটা দেওয়ার অর্থ—অভিমান ও হামবড়াইয়ের পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা নম্র-মধুরভাবে সকলকে মানিয়া চলা। এই সকল বাহ্য ব্যাপার কত পরিমাণে এক একটী আদর্শের অভিব্যক্তি বলিয়া ভারতের সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত, তাহা পাশ্চাত্যবাসী আমরা হয় ত আদৌ ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি না। এই ঘোমটা দেওয়া সম্বন্ধে স্বামী সদানন্দ একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, "কখনও উহা টানিয়া দিতে ভুলিও না ! মনে রাখিও, ঐ শ্বেত অবগুণ্ঠনের মধ্যেই আদর্শ সাধু জীবনের অর্দ্ধাংশ নিহিত রহিয়াছে !"

এই সকল বিষয়ে স্বামিজী শিষ্যগণকে যাহা তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই ঠিক পথ বলিয়া জানিতেন, সেই পথ দিয়া লইয়া যাইতেন। যদি তাঁহাদিগকে ভারতীয় শিক্ষাসংক্রান্ত কোন সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রথমে নিম্নস্তরের শিক্ষাদান প্রণালীর অভিজ্ঞতা লাভ করিতেই হইবে ; এবং এই কার্য্যের জন্য সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বপ্রধান গুণ—জগৎকে ছাত্রদিগের চক্ষে দৃষ্টি করা—তা এক মুহূর্ত্তের জন্য হয়, সেও স্বীকার। শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রত্যেক নিয়মটী এই কথাই ঘোষণা করিতেছে। যাঁহারা জগৎকে একেবারেই ছাত্রদিগের চক্ষে দেখিতে জানেন না, অথবা তাহাদিগকে কোন্ অভীপ্সিত উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে জ্ঞাত নহেন, তাঁহাদিগের মুখে 'জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাত বস্তুতে,' 'সহজ হইতে জটিল ব্যাপারে,' 'স্থূল হইতে সূক্ষ্মে' এইগুলি, এবং 'শিক্ষা' শব্দটী পর্য্যন্ত

কেবল কথার কথা মাত্র। ছাত্রের স্বাভাবিক ইচ্ছার প্রতিকূলে তাহাকে শিক্ষা দিতে গেলে হিতের পরিবর্ত্তে কেবল অহিতই সাধিত হইবে।

স্বামিজীর শিক্ষার মধ্যে তাঁহার এই স্বতঃপ্রবৃত্ত ধারণাই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত যে, ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় দৈনন্দিন জীবনের সহস্র খুঁটিনাটী ব্যাপারের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটু ভাল করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। যখনই তিনি কোন নূতন ভাব বুঝিতে ইচ্ছা করিতেন, তখনই তিনি উক্ত মতাবলম্বীদিগের আহার, পরিচ্ছদ, ভাষা এবং চালচলন নিজে গ্রহণ করিতেন। তিনি মাত্র কয়েকটী ধর্ম্মমত সম্বন্ধেই তাহাদিগের সদৃশ হইবার চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন মহান্ আচার্য্য এইরূপ ব্যাপার সকলেও শিষ্যগণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ না রাখিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি একটু একটু করিয়া উদ্দেশ্যটী উদ্‌ঘাটন করিতেন এবং সর্ব্বদাই শিষ্য যাহা আয়ত্ত করিয়াছে, তাহারই সহায়ে তাহাকে অগ্রসর করিয়া দিতেন। একথা সত্য যে, তিনি সর্ব্বদাই আপনার এবং অপর সকলের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার উদ্দেশ্যটী বিশুদ্ধ কি না তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করিতেন, এবং যাহাতে উহাতে অণুমাত্র স্বার্থ প্রবেশ করিতে না পায়, তজ্জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি কাহাকেও বিশ্বাস করি না, কারণ আমি নিজেকেই বিশ্বাস করি না। কে জানে কাল আমি কি হইয়া যাইতে পারি ?" কিন্তু, যেমন তিনি একবার বলিয়াছিলেন ইহাও সত্য যে, কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল—এমন কি ভুলের সম্ভাবনা দূর করিবার জন্যও তিনি ঐরূপ করিতে পারিতেন না। যখন ভুল হইয়া গিয়াছে, তখনই তিনি উহার কারণ প্রদর্শন করিতেন, তৎপূর্ব্বে নহে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম ছয় মাস আমি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায়

নানা শ্রেণীর দেশীয় ও ইউরোপীয় লোকদিগের বাটীতে ভোজন করিতাম। ইহাতে স্বামিজী অশান্তি বোধ করিতেন। সম্ভবতঃ তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, ইহাতে আমার মন নিষ্ঠাবান্ হিন্দুজীবনের অত্যধিক সরলতা দেখিয়া বাঁকিয়া বসিতে পারে। একথাও তিনি নিঃসন্দেহ ভাবিয়াছিলেন যে, লোকের মন স্বভাবতঃই আজন্মসঞ্চিত সংস্কারসমূহের দ্বারা পুনরায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে পারে। তিনি পাশ্চাত্য দেশে একটী বিরাট্ ধর্ম্মান্দোলনকে, জনৈক অতিরিক্তসুরুচিসম্পন্না স্ত্রীলোকের তুচ্ছ সামাজিক প্রতিপত্তিলালসা হেতু ধূলিসাৎ হইতে দেখিয়াছিলেন। তথাপি তিনি এ বিষয়ে আমাকে কিছুমাত্র বাধা দেন নাই, যদিও তাঁহার মুখের একটী আদেশবাক্যই যে কোন সময়ে উহা বন্ধ করিয়া দিতে পারিত। ইহা যে তাঁহার মনঃপূত হইতেছে না, তাহাও তিনি কখনও প্রকাশ করেন নাই। বরং কেহ নিজের কোন্ অভিজ্ঞতা তাঁহার কর্ণগোচর করিলে তিনি তাহা আদ্যোপান্ত আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিতেন। তিনি সাধারণভাবে রাজসিক আহার বিহার সম্বন্ধে তাঁহার আশঙ্কা প্রকাশ করিতেন, কখনও বা উহাতে গুরুতর অনিষ্ট হইবে, এরূপও বলিয়া দিতেন;—যে সকল আমরা তখন বুঝিতেই পারিতাম না। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতে পৃথক্ পৃথক্ স্বার্থবিশিষ্ট যে সকল বিভিন্ন জাতি রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে সমন্বয়দৃষ্টিতে ধারণা করা যে আমার পক্ষে বাস্তবিকই অতি প্রয়োজনীয়, সম্ভবতঃ ইহা দেখিয়াই তিনি সম্পূর্ণরূপে শিষ্যের ইচ্ছাই বলবতী রাখিলেন এবং আমাকে স্বাধীনভাবে এই বিষয়ে তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে দিলেন।

যখন আমরা ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছি, সেই সময়ে জাহাজে তিনি নিজ সঙ্কল্পিত আদর্শের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। স্ত্রীশিক্ষাকার্য্যের ভবিষ্যৎ আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিলেন, "তোমাকে লোকজনের সঙ্গে দেখা করা একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে এবং রীতিমত নির্জ্জন বাস করিতে হইবে। তোমার চিন্তা, তোমার অভাব, তোমার ধারণা, তোমার অভ্যাস—এগুলিকে তোমায়

হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। তোমার জীবন ভিতরে বাহিরে ঠিক ঠিক নিষ্ঠাবতী, হিন্দু ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারিণীর মত হওয়া চাই। ইহার সাধনোপায় তুমি আপনা হইতেই জানিতে পারিবে, শুধু যদি তুমি উহা মনে প্রাণে কামনা কর। কিন্তু তোমাকে তোমার অতীতের কথা একেবারে ভুলিতে হইবে এবং অপরেও যাহাতে উহা ভুলিয়া যায়, তাহা করিতে হইবে। তোমাকে উহার স্মৃতি পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের আপাত-প্রতীয়মান শত ভোগপ্রিয়তা ও নিরঙ্কুশতা সত্ত্বেও কোন সন্ন্যাসীই তাঁহার ন্যায় মনেপ্রাণে সন্ন্যাস-জীবনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তথাপি এই সেবাব্রতীর বেলায় তিনি তাহাকে এক মঠের চতুঃসীমার ভিতরে আবদ্ধ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ভারতবাসিগণের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী লক্ষ্য করিতে দিয়াছিলেন। আমার নিকট সময়ে সময়ে ইহাই তাঁহার জীবনে প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলিয়া মনে হইয়াছে। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "আমাদিগকে সকল লোকের সহিত তাহাদের নিজ নিজ ভাবটী বজায় রাখিয়া কথা কহিতে হইবে।" ইহা বলিয়া তিনি কল্পনা সহায়ে বর্ণনা করিতে লাগিলেন, হয় ত ভবিষ্যতে ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ভারতীয় সম্প্রদায় সকলের একটী শাখা গৈরিকপরিধায়ী নগ্নপদ, এবং অতি কঠোর ব্রতধারী হইয়া সকল ধর্ম্মই যে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ, সর্ব্বদা এই চরম সত্যের ঘোষণা করিতে বদ্ধপরিকর থাকিবে!

যাহাই হউক এই ভারতীয় ভাব আয়ত্ত করার ব্যাপারটীতে তিনি শুধু কায়মনোবাক্যে উহা কামনা করাকেই একমাত্র আদর্শ পন্থা বলিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই। একটীর পর একটী করিয়া তিনি হিন্দু আচার ব্যবহারের নানা খুঁটিনাটী সম্বন্ধে, ইউরোপে সচরাচর প্রথম কর্ম্মশিক্ষার্থীদিগকে যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাই দিতে থাকিলেন। এইরূপেই তিনি পাশ্চাত্য আদবকায়দার সদা অস্থির ভাব ও সকল বিষয় জোর দিয়া বলা—যাহা প্রাচ্যবাসীর

নিকট এত অমার্জ্জিত বলিয়া বোধ হয়—এই দুইটী অভ্যাসকে দূর করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কষ্ট বা প্রশংসা বা বিস্ময়—মনে কোনরূপ ভাব উদয় হইবামাত্র তাহাকে প্রকাশ করিয়া ফেলা তাঁহার অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইত। ইহাকে অধর্ম্ম বলা বাহুল্য মাত্র, কারণ ইহা কুশিক্ষার ফল। প্রাচ্যমানব সকলের নিকট আশা করেন যে, তাঁহারা ভিতরে ভিতরে অনুভব করুন, কিন্তু ভাব চাপিয়া রাখুন। দিবারাত্র কোন কিছু কৌতূহলোদ্দীপক বা সুন্দর বস্তু চক্ষে পড়িলেই তাহাকে দেখাইয়া দেওয়াকে তিনি চিন্তার নিভৃতভাব এবং স্বচ্ছন্দ গতিকে অন্যায় বাধা দেওয়া বলিয়া মনে করেন। তথাপি প্রাচ্যবাসী আদবকায়দার যে শান্ত শিষ্ট ভাবটী পছন্দ করেন, তাহা যে শুধু একটা নিষ্ক্রিয় জড় অবস্থা নহে, তাহার নিদর্শন জনৈক সাধুর প্রত্যুত্তর হইতে পাওয়া যায়। এক রাজা তাঁহাকে "ঈশ্বরের স্বরূপ কি?" "ঈশ্বরের স্বরূপ কি?" বারম্বার এই প্রশ্ন করিতেছিলেন। তদুত্তরে সাধু বলিলেন, "রাজা, এতক্ষণ যে তাহাই আমি তোমাকে বলিতেছিলাম। কারণ, মৌনই তাঁহার স্বরূপ!"

এ বিষয়টীতে স্বামিজী নাছোড়বান্দা ছিলেন। তিনি ইউরোপীয় শিষ্যগণের প্রতি মধ্যে মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সংযমের আদেশ দিতেন। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "ভাবোচ্ছ্বাসের নাম-গন্ধ মাত্র না রাখিয়া আত্মানুভূতির চেষ্টা কর।"

একবার শরৎকালের এক নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় বৃক্ষ হইতে জীর্ণপত্রসমূহ পড়িতে দেখিয়া, দৃশ্যটীনে কবিত্ব আছে তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু বলিলেন যে, বাহ্য ইন্দ্রিয়জগতের সামান্য একটী ঘটনা হইতে যে মানসিক উত্তেজনার উদ্ভব, তাহা ছেলেমানুষী মাত্র, এবং অশোভন। তিনি আরও বলিলেন যে, সকল পাশ্চাত্য মানবকে অনুভূতি ও ভাবোচ্ছ্বাস—এই দুইটী জিনিসকে পৃথক্ রাখিবার মহাশিক্ষা লাভ করিতে হইবে। "বৃক্ষপত্রগুলির পতন লক্ষ্য করিয়া যাও, কিন্তু ঐ দৃশ্যে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা পরে কোন সময়ে নিজের ভিতর হইতে সংগ্রহ কর।"

ইহা আর কিছুই নহে—ইউরোপে যাহাকে শান্ত সংযত হওয়া বলে এবং যে মতবাদ তত্রত্য মঠসমূহে প্রচলিত, অবিকল তাহাই। ইহা আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশেরও এক সূক্ষ্ম উপায় কি না, কে বলিতে পারে? ইহাতে কি এক প্রকারের কবিত্বের সূচনা করিয়া দিতেছে, যাহা জগৎকে এক বিরাট প্রতীক বলিয়া মনে করে, অথচ বিচার বুদ্ধিকে সযত্নে ইন্দ্রিয়ের রাজ্য হইতে বহু ঊর্দ্ধে স্থান প্রদান করে।

. প্রশ্নটাকে শুধু সৎশিক্ষা ও সংযমাভ্যাসের রাজ্যের বাহিরে লইয়া গিয়া কেবল ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে প্রযোগ করিযাও স্বামিজী উহাকে সমভাবে সত্য দেখিতে পাইযাছিলেন। সেই জন্য তিনি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিচারপ্রসূত সুখ'লপ্সাকেও ভয়ঙ্কর বন্ধন বলিযা জ্ঞান করিতেন এবং তৎসম্বন্ধে ঐভাবে বলিতেন। তিনি বলিতেন যে, যাঁহারা আদর্শের রাজ্যেই মাতিয়া থাকেন, তাঁহাদের সকলেরই পক্ষে এই একটী ভয় আছে যে, তাহারা নিজে যতটুকু উপলব্ধি করিয়াছেন, মাত্র তাহাকেই আদর্শ জ্ঞান করিতে পারেন। ইহা শবের উপর এক রাশ ফুল চাপা দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং কার্য্যে পরিণত করিলে, উহার অর্থ দাড়ায়—শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, ইতর সাধারণের পক্ষ পরিত্যাগ এবং তাহাদের উন্নতিকল্পে আরব্ধ কার্য্যের বিনাশ। কেবল তাহারাই নিষ্ঠাবান্ হইতে পারে, যাহারা প্রলোভনের অতীত, এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে শুদ্ধ ভাবটীকেই অনুসরণ করে।

ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে তিনি বলিলেন, "সাবধান! ভাল খাওয়া, ভাল পর—এ সবে মন দিতে পাইবে না। সংসারের বাহ্য চাকচিক্যে ভুলিলে চলিবে না। এ সকল একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে—সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। ইহা ভাবুকতা মাত্র—ইন্দ্রিয়ের অসংযমজনিত উচ্ছ্বাস। ইহা বিচিত্র বর্ণ, মনোহর দৃশ্য ও শব্দ এবং অন্যান্য সংস্কারানুযায়ী নানা আকারে মানুষের নিকট আসিয়া থাকে। ইহাকে দূর করিয়া

দাও। ইহাকে ঘৃণা করিতে শিখ। ইহা একেবারে বিষ!"

এইরূপে হিন্দু গৃহস্থালীর সাধারণ দৈনন্দিন কর্ত্তব্যগুলি স্বামিজীর মুখে রাশি রাশি গভীরতর তথ্যের উদ্বোধক হইয়া দাঁড়াইত—সেগুলি কেবল হিন্দুমনেরই সহজবোধ্য। তিনি নিজে আশৈশব সাধুদিগের মঠাদি পরিচালনা বিষয়ে জানিতে উৎসুক ছিলেন। এক সময়ে তিনি একখানি "ঈশা-অনুসরণ" (Imitation of Christ) পুস্তক পাইয়াছিলেন; তাহার মুখবন্ধে উক্ত গ্রন্থের আনুমানিক রচয়িতা জেয়াঁ-দ্য-জার্স (Jean de Gerson) যে মঠভুক্ত ছিলেন তাহার এবং তদনুসৃত নিয়মাবলীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ ছিল। এই মুখবন্ধটী স্বামিজীর কল্পনায় পুস্তকখানির রত্নস্বরূপ ছিল। উহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না; ক্রমে উহা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল এবং তাঁহার বাল্যের স্বপ্নের সহিত বিশেষভাবে জড়িত হইয়া গেল। অবশেষে প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, তিনি নিজেই ভাগীরথীতটে অপর এক সন্ন্যাসীসঙ্ঘের স্থাপনা করিতেছেন, এবং বুঝিলেন যে, তাঁহার শৈশবের ঐ বিষয়ে ঐকান্তিক অনুরাগ ভবিষ্যতেরই পূর্ব্ব ছায়াপাত মাত্র।

তথাপি তিনি যে নিয়মানুবর্ত্তিতা কোন পাশ্চাত্য শিষ্যের নিকট আদর্শরূপে উপস্থাপিত করিতেন, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের বা বিদ্যালয়ের কঠোর শাসনের আনুগত্য নহে; উহা হিন্দু বিধবাদিগের পরিবারের মধ্যে থাকিয়া স্বাধীনভাবে নিজের নিয়মগুলি পালন করিয়া যাওয়ার ন্যায়। চরিত্রবতী রমণীর আদর্শ বলিতে তিনি "নিষ্ঠাবতী হিন্দু ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারিণী" বুঝিতেন। তিনি কি আনন্দের সহিত ঐ কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিতেন, তাহা বর্ণনাতীত।

এই বিষয়টীর আলোচনা করিতে করিতে তিনি একদিন বলিলেন, "তোমার ছাত্রীবৃন্দের জন্য কতকগুলি নিয়ম কর এবং তোমার মতামতগুলিও স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ কর। আর যদি সুবিধা হয় একটু উদারভাবেরও উহাতে স্থান করিয়া লইও। কিন্তু মনে রাখিও যে,

সমগ্র জগতে পাঁচ ছয় জনের অধিক লোক কখনও একসঙ্গে এই ভাবটী লইবার জন্য উপযুক্ত নহে! ইহাতে সম্প্রদায়েরও ব্যবস্থা থাকিবে, আবার সম্প্রদায়ের গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া যাইবারও পথ থাকিবে। তোমাকে নিজের সহায়কদিগকে নিজেই তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। নিয়ম কর, কিন্তু এরূপভাবে করিও, যেন যাহারা উহাদিগের সহায়তা ব্যতীত কার্য্য করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, তাহারা উহাদিগকে অনায়াসে ভঙ্গ করিতে পারে। আমাদের মৌলিকত্ব এই হইবে যে, আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা দিব, অথচ শাসনও পূর্ণভাবে বজায় থাকিবে। সন্ন্যাসীর সঙ্ঘেও ইহা করা যাইতে পারে। আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, আমি সর্ব্বদাই খানিকটা দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাই—তাহাতেই বুঝি উহা সম্ভবপর।"

এইখানে তিনি সহসা এই বিষয়টী পরিত্যাগ করিয়া প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিলেন। উহা সকল সময়েই তাঁহার প্রীতিকর ছিল, এবং তিনি উহা সকল সময়েই বাস্তব ঘটনার সহিত মিলে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিলেন, "দুইটী বিভিন্ন জাতি ... সম্মিলিত হয়, এবং তাহাদিগের মধ্য হইতে একটী বলশালী নূতন জাতির অভ্যুদয় হইয়া থাকে। এই নূতন জাতিটী আপনাকে অপরের সহিত সংমিশ্রণ হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে, এবং এইখানেই জাতিভেদের সূত্রপাত। দেখ না, যেমন আপেল। ইহাদের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাতি, তাহারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে সঙ্কর-সঙ্ঘটনের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু একবার ঐরূপ হইবার পর আমরা ঐ বিশেষ জাতিটীকে বরাবর পৃথক্ রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকি।"

(ক্রমশঃ)

বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম।

(মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী)

বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঙ্গালা যে বহু পূর্ব্বকালে, এমন কি আর্য্যগণের পাঞ্জাবে আসিবার বহু পূর্ব্বেও সভ্য-জাতির বাস ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অতি প্রাচীনকালে মানুষে হাতি পোষ মানাইয়াছে। রামায়ণে বল, মহাভারতে বল, বৌদ্ধ ত্রিপিটকে বল, জাতকে বল, জৈন অঙ্গ গ্রন্থে বল, সব যায়গায় পোষা হাতীর কথা শুনা যায়। কিন্তু এই পোষ-মানানোটা বাঙ্গালাদেশের লোকেরই কাজ ছিল। যাহারা পোষ-মানাইত তাহারা দীর্ঘকায়, কৃশ অথচ বলিষ্ঠ, এবং স্বর্ণবর্ণ ছিল। তাহারা ঝাকড়া চুল রাখিত, চামড়া পরিত, এবং হাতীর সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের উপর হইতে সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত গমনাগমন করিত। সে জাতি এখন কোথায় গেল বলিতে পারা যায় না। তবে তাহারা হাতী পোষ মানাইয়া পৃথিবীর একটা বড় উপকার করিয়া গিয়াছে।

ঋগ্বেদে বাঙ্গালাদেশের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে তিনটা জাতির নাম পাওয়া যায়। এখানে জাতি শব্দের অর্থ ইংরাজীতে যাহাকে Caste বলে তাহা নহে— কিন্তু Ethnic race। একটীর নাম বঙ্গ, একটীর নাম বগধ এবং আর একটীর নাম চের। দ্রাবিড় জাতির সাধারণ নাম চের। একথা কেহ কেহ অস্বীকার করিলেও চেররা দ্রাবিড় জাতির যে একটা খুব বড় অংশ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ছোটনাগপুরে অনেক অর্দ্ধ সভ্যজাতি আপনাদিগকে চেরদিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা বলিয়া থাকে, রোটাসগড়ের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে তাহারা ছোটনাগপুরে আসিয়াছিল ; কিন্তু কতকাল পূর্ব্বে, সে কথা তাহারা বলিতে পারে না। কোন কোন Anthropologist বলেন, বঙ্গ বা

বং নামে এক দ্রবিড় জাতি বাঙ্গালাদেশে বাস করিত। বগধ জাতি এখনও বাঙ্গালা দেশে আছে। বাঢ়ের বাগদীরাই তাহাদের বংশধর। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, উহারা আপনাদের ভিতরে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কয়—তাহা বাঙ্গালা নয়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রমুখ ভদ্রজাতিরা সে ভাষা কিছুই জানেন না। আবার অনেকে মনে করেন যে, মগধ ও বগধ একই জাতি, অথবা, এক জাতিরই দুই শাখা মাত্র। মগধের কথা কোন কোন বেদে শুনিতে পাওয়া যায়। তথায় বাস করিলে ব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হইত।

এতদ্ভিন্ন উত্তর বঙ্গে কিরাত, পৌণ্ড্র এবং কৈবর্ত্ত এই তিনটী জাতি ছিল। বেদের আর্য্যগণ এই তিন জাতিকে দস্যু বলিয়া বর্ণনা করিতেন। অর্থাৎ তাহারা আর্য্যদিগের শত্রু ছিল। কিরাতেরা এখন দার্জ্জিলিং ও কাঠমুণ্ডের মধ্যে পর্ব্বতময় দেশে বাস করে। নেপালীরা তাহাদিগকে "কিরান্তী" বলে। মালদহের পুঁড়রা পৌণ্ড্রগণের বংশ। উহাদের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অতি প্রাচীন-কাল হইতে উত্তর বঙ্গের একটী প্রধান নগর ছিল। কৈবর্ত্তরা উত্তর বঙ্গে খুব প্রবল ছিল। বল্লাল সেন কৈবর্ত্তদিগকে ভাগ করিয়া এক দলকে উত্তর বঙ্গে রাখেন এবং আর এক দলকে উড়িষ্যার প্রান্তদেশে বাস করান। এখনও ঐ দুই স্থলে কৈবর্ত্তের সংখ্যা অধিক। সেন্‌সাস রিপোর্টে দেখা যায় বাঙ্গালায় যত জাতি (Caste) আছে তাহাদের মধ্যে কৈবর্ত্তের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় এই সকল জাতি বাস করিত। ইহারা কতক পরিমাণে সভ্য হইয়াছিল, কারণ, জৈন দিগের প্রায় সকল তীর্থঙ্করই বাঙ্গালাদেশে বিশেষতঃ রাঢ়ে বহু দিন বাস, তপস্যা ও সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক আপন আপন ধর্ম্মের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জৈন যতিদিগের অনেক আচার ব্যবহার, বিশেষতঃ তাহাদিগের পোষাক পরিচ্ছদ বাঙ্গালীদিগের মত। বৌদ্ধ যতিদিগেরও তাহাই।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম দুইটী সাংখ্যদর্শনের ফলে বাহির হইয়াছে। আবার, আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে, সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক কপিলের আশ্রম বাঙ্গালাতেই ছিল। খুলনা জেলায় এখনও 'কপিল মুনি' বলিয়া একটী স্থান আছে। গঙ্গাসাগরের নিকট কপিলের অন্য একটী আশ্রমও আছে। বুদ্ধদেব যে প্রথম প্রথম সাংখ্য পণ্ডিতদিগেরই চেলা হইয়াছিলেন একথা অশ্বঘোষ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। কপিলের মতের উপর বুদ্ধদেব কোন্ কোন্ বিষয় নূতন প্রবর্ত্তিত করিয়া নিজ মতের উন্নতি বিধান করিয়াছেন তাহাও অশ্বঘোষ দেখাইয়া গিয়াছেন। কপিল দ্বৈতবাদী ছিলেন কিন্তু বৈদিক ঋষিরা সকলেই প্রায় অদ্বৈতবাদী। শঙ্করাচার্য্য সাংখ্যকে "অশিষ্ট" বলিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি মনে করিতেন উহা একটা বেদবহির্ভূত মত। তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, সাংখ্যমত নিরাকরণে আমার প্রয়োজন নাই। তবে যে যত্ন করিয়া আমি উহার নিরাকরণ করিতেছি তাহার কারণ, মনু প্রভৃতি কয়েকজন "শিষ্ট" এই মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অনেকের ইহাকে শিষ্ট বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, এজন্য নিরাকরণ করা আবশ্যক। শঙ্করাচার্য্য কয়েক শতাব্দী পরে হেমাদ্রি, সাংখ্য ও কাপিলমতে ভেদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহারা সাংখ্যশাস্ত্রে পারদর্শী তাহাদের স্থান অতি উচ্চে এবং যাহারা কাপিলমতে পারদর্শী তাহাদের স্থান অত নীচ। এমন কি ব্রাহ্মণদের সহিত কাপিলদের এক পংক্তিতে বসাও উচিত নহে। বাঙ্গালীদের উপর আর্য্য ঋষিদিগের এবং তাহাদের বংশধরদিগের অনুগ্রহ বড়ই বেশী। তাঁহারা বলেন তীর্থযাত্রা ভিন্ন বঙ্গদেশে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হেমাদ্রি লিখিয়াছেন শ্রাদ্ধের পংক্তিতে বাঙ্গালীকে বসিতে দিবে না। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, বাঙ্গালাদেশ আর্য্যদের দেশ ছিল না। তবে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ কবে আসিল? তাম্রশাসন বা পাথরের লেখা না দেখিলে যাঁহারা কিছুই বিশ্বাস করিতে রাজী হন না তাঁহাদের উপকারার্থ

এই কথা বলিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ৪৩৬ সালে মহারাজাধিরাজ কুমার গুপ্তের অধিকার কালে রাজসাহী অঞ্চলে একজন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করা হয়। ইহার একশত বা দেড়শত বৎসর পরে ফরিদপুরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ কিছু কিছু জমিজমা লইয়া বাস করে; এটাও তাম্রশাসনের কথা। তবে কোন কোন পণ্ডিত এই তাম্রশাসনগুলিকে জাল বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। জাল হইলেও ১০।১২ শত বৎসরের পূর্ব্বে ঐ জাল প্রস্তুত হইয়াছে, স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বাঙ্গালায় ঐকালে ব্রাহ্মণের বাসের সম্বন্ধে যে উহা প্রমাণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পঞ্চ ব্রাহ্মণের বাঙ্গালায় আসা আদিশূরের সময়ে ঘটে। আদিশূরের কোনও তামশাসন পাওয়া যায় না—সুতরাং বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকদিগের মতে আদিশূরের নামে কোনও রাজা থাকাই সম্ভবপর নয়। অতটা বিজ্ঞান কিন্তু সংসারে চলে না। আদিশূর রাজা থাকুন আর নাই থাকুন, কিন্তু পাঁচজন ব্রাহ্মণ যে এককালে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরেরা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণী হইয়া উঠিয়াছেন, একথা সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। তবে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, সেটা কোন্ কালে? প্রাচীন ঘটকের পুঁথিতে বলে, বেদে বাণাঙ্গশাকে ৬৫৪ শকে অর্থাৎ ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা বাঙ্গালায় আসেন একথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই; কারণ, তখন সমগ্র ভারতব্যাপী একটা ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল। কুমারিল ভট্ট মীমাংসা সূত্রের শবর-ভাষ্যের এক টীকা লিখিয়া পুনরায় বৈদিক-ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। মহাকবি ভবভূতি তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। তিনি তখন কনোজের ব্রাহ্মণগণের নেতা। কনোজ তখন একজন প্রবল পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী মহারাজার রাজধানী। সুতরাং সেখান হইতে যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আসিয়া অব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রচার করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? কনোজ হইতে ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালায় আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এদেশে সাতশত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ আছেন। কিন্তু তাঁহারা নামেই

ব্রাহ্মণ, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ কিছু জানেন না। তাঁহাদিগের ঐ কথাও অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। কেন না ইতিপূর্ব্বে তাম্র-শাসন হইতে দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গালায় ঐকালে ব্রাহ্মণ বাস করাইবার চেষ্টা হইয়াছিল।

কিন্তু সাতশত ঘর অকর্ম্মঠ ব্রাহ্মণ এবং পাঁচ ঘর কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণ লইয়া কিছু বাঙ্গালা দেশ হয় না। সুতরাং এদেশে অন্য ধর্ম্মও ছিল এবং সে ধর্ম্মের প্রবল একটা যাজককুলও ছিল। হুয়েনসাঙ্ ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে থাকিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশে তখন একলক্ষেরও অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষুক ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘারামে বা বিহারে বাস করিতেন। এতদ্ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ভিক্ষুরাও ছিলেন—অর্থাৎ জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মের ভিক্ষুরাও ছিলেন। ভিক্ষুরা রোজগার করিয়া খান না, ভিক্ষা করিয়া খান। তিন বাড়ীতে ভিক্ষা পেলে চতুর্থ বাড়ীতে যাইবার তাঁহাদের নিয়ম ছিল না। আবার একবার যে বাড়ীতে ভিক্ষা পাইয়াছেন, একমাসের ভিতরে সে বাড়ীতে পুনরায় আসিতে পারিবেন না, ইহাও তাহাদের নিয়ম ছিল। সুতরাং একটী যতিকে প্রতিপালন করিতে হইলে অন্ততঃ একশত ঘর গৃহস্থ বৌদ্ধ থাকা চাই। অতএব লক্ষাধিক ভিক্ষু প্রতিপালনের জন্য অন্ততঃ এক কোটী বৌদ্ধ গৃহস্থ থাকা চাই। ছিলও তাহাই—দেশটা বৌদ্ধধর্ম্মে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণকে বৌদ্ধেরা তখন গ্রাহ্যই করিতেন না। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তাঁহারা তখন বেশ দাবাইয়া রাখিতে পারিতেন।

বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম কবে আরম্ভ হয় তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের যাহা মূল স্থান, বাঙ্গালা তাহার অতি সন্নিকট। ইহাতে বোধ হয় যে, বুদ্ধদেব জীবিত থাকিতেই এই দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয়। তিনি নির্ব্বাণের দিনে নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, "বাঙ্গালার রাজকুমার বিজয় আজ সিংহলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সিংহলে আমার ধর্ম্ম চিরস্থায়ী হইবে।" সুতরাং বুদ্ধদেবের জীবিত কালে শুধু যে বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল এমত

নহে কিন্তু বাঙ্গালা দেশ হইতে অন্য দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকও যাইতেছিল।

বাঙ্গালাদেশে খুব বড় বড় দুইটী নগর ছিল—একটী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এবং আর একটী তাম্রলিপ্তি, প্রাচীন নাম দামলিপ্তি অর্থাৎ দ্রামিল দিগের সহর। ভ্রাতা বীতাশোক পাছে মগধ সাম্রাজ্য লইয়া তাঁহার সহিত ঝগড়া করে এই জন্য অশোক তাহাকে বৌদ্ধ ভিক্ষু করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের এক বিহারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। সুতরাং সেখানেও পূর্ব্ব হইতেই বিহার ছিল। তাম্রলিপ্তি বৌদ্ধদিগের একটী প্রধান আড্ডা ছিল। তাহারা এখান হইতে অন্যান্য দেশে বানিজ্য ও ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইতেন। এই বন্দর দিয়াই অশোক রাজা তাঁহার ছেলে ও মেয়েকে বোধিবৃক্ষের এক ডাল দিয়া সিংহল দেশে পাঠাইয়াছিলেন। সে ডালটী এখন দুই তিন মাইল ব্যাপী অশ্বত্থ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং হুয়েনসাঙের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের কতদূর প্রচার হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া গেল। যে সকল জাতি বাঙ্গালায় বাস করিত—কিরাত, পৌণ্ড্র, কৈবর্ত্ত, বঙ্গ, বগধ সকলেই বৌদ্ধ হইয়াছিল। তবে বৌদ্ধদের একটা দোষ ছিল—পশুহত্যা যাহাদের ব্যবসায় ও জীবিকা তাহাদিগকে তাঁহারা শিক্ষা দীক্ষা দিতেন না। কিন্তু যাহারা ঐরূপ জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া সুব্যবসায় গ্রহণ করিত, তাহাদিগকে দিতেন। সেই জন্যই বাঙ্গালায় হেলে কৈবর্ত্ত ও জেলে কৈবর্ত্ত বলিয়া দুইটা জাতি হইয়াছিল। এক দলে বৌদ্ধ দীক্ষা পাইত আর এক দল পাইত না। কিন্তু দীক্ষা পাইত না বলিয়া যে তাহারা যে বৌদ্ধ ছিল না এছে যেন কেহ মনে না করেন। কারণ শিক্ষা দীক্ষা না পাইলেও কেবল মাত্র "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" "ধম্মং শরণং গচ্ছামি" সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" বলিলেই তাহারা বৌদ্ধ হইতে পারিত অর্থাৎ ভিক্ষু মহাশয়েরা তাহাদিগকে কোনরূপ শিক্ষা দীক্ষা না দিয়াও তাহাদিগের নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন।

এখন যাহারা হিন্দুধর্ম্মের ও ব্রাহ্মণদের প্রধান ভক্ত তাঁহাদের

পূর্ব্বপুরুষেরা প্রায় সকলেই তখন বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধদের যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ আছে—তাহাদের গ্রন্থকার অনেকেই কায়স্থ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আচার্য্য, উপাধ্যায়, ভদন্ত, ভিক্ষু, পিণ্ডপাতিক এবং মহোপাধ্যায় প্রভৃতি নামে ভূষিত হইতেন।

গুপ্ত উপাধিধারী বহুসংখ্যক লোকে বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে রামপাল রাজার সময় অভয়াকর গুপ্ত একজন পরম পণ্ডিত এবং প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বৌদ্ধেরা তখন কোনও ব্রাহ্মণকে আপনাদের দলে টানিতে পারিলে বড়ই আনন্দিত হইত। কেননা তাহা হইলে তাহাদের সংস্কৃত পুস্তক লিখাইবার বড়ই সুবিধা হইত। এখন নেপালে অবিবাহিত ভিক্ষু নাই। ভিক্ষুরা সকলেই বিবাহ করে, সন্তান উৎপাদন করে এবং নামে মাত্র ভিক্ষু হয়। তথাপি যদি একজন ব্রাহ্মণের ছেলে পায় তবে এখনও তাহারা অত্যন্ত আদরের সহিত তাহাকে ভিক্ষু করিয়া লয়। ঐরূপ হইবার কারণ, ব্রাহ্মণ ভিক্ষু ও অন্য জাতি ভিক্ষুর মধ্যে একটু তফাৎ ছিল—ব্রাহ্মণেরা সুশব্দবাদী হইত অর্থাৎ ব্যাকরণ দুরস্ত করিয়া সংস্কৃত লিখিত কিন্তু অব্রাহ্মণ বৌদ্ধেরা একেবারেই সুশব্দবাদী ছিলেন না, ব্যাকরণের ধারও ধারিতেন না। তাঁহারা বলিতেন আমরা দেখিব কেবল অর্থশরণতা অর্থাৎ অর্থটী যাহাতে প্রকাশ হয় অর্থাৎ এখানকার নৈয়ায়িকদের যেমন মত ছিল "অস্মাকানাং নৈয়ায়িকানাং অর্থনি তাৎপর্য্যং শব্দনি কোশ্চিন্তা।" সে যাহা হউক ণ বৌদ্ধের সংখ্যা কিন্তু অত্যন্ত কম ছিল। গুপ্ত উপাধিধারী প্রভাকর গুপ্ত একজন ভারী বিচারমল্ল ছিলেন। তিনি শুভাকর গুপ্তের মত প্রচার করিতেন, সর্ব্ববাদী প্রমথনে শুভাকর সিংহ-স্বরূপ ছিলেন। ইঁহারা দুইজনে শুভাকর গুপ্তের দ্বারা একখানা বৌদ্ধদের স্মৃতির গ্রন্থ লেখান। তাহার কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। কর উপাধিধারী অনেকেও বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কয়েক জন তৈলিকপাদ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

বণিকদের তো কথাই নাই। ইঁহারাই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন ও বিহারের অনেক খরচ চালাইতেন। তদ্ভিন্ন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন, মঠ প্রতিষ্ঠা করিতেন ও পুস্তক লিখিয়া মঠকে দান করিতেন। ঐরূপে সকল জাতির লোকেই তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। মাছ মারিয়া খায় যে কৈবর্ত্ত সেও বাদ যায় নাই। পাল রাজারা তো বৌদ্ধ ছিলেনই। তাঁহাদের অধীন যত ছোট ছোট রাজা ছিলেন তাঁহারাও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তবে মানতের বেলা তাঁহারা কোন ধর্ম্মই বাছিতেন না। রোগ শান্তি, ভূত শান্তি, যুদ্ধে জয় পরাজয় এই সকলের জন্য সব রকমের দেবতার মানত করিতেন, মহাভারতের পাঠ শুনিতেন, ব্রাহ্মণ-দের বাড়ী যজ্ঞে উপস্থিত থাকিতেন, হোমের ফোঁটা লইতেন, ব্রাহ্মণ-দিগকে ভূমিদান করিতেন, বিষ্ণু শিব প্রভৃতির মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। অথচ তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন। কারণ, ঐসঙ্গে সকালে উঠিয়া তাঁহারা "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি" "সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" বলিতেন, সঙ্ঘ-ভোজন করাইতেন, সম্যক্ সম্ভোজন* করাইতেন, স্তূপ নির্ম্মাণ করাইতেন, বিহার নির্ম্মাণ করাইতেন, বুদ্ধ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতেন এবং নানাবিধ বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম তো শুধু শীল ও বিনয় লইয়া—তাহার মধ্যে দেবদেবীর মূর্ত্তি কোথা হইতে আসিল? ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশে এখনও দেবদেবীর প্রাদুর্ভাব তত নাই। কিন্তু বাঙ্গালায় খুব ছিল। যাহারা বাঙ্গালা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম পাইয়াছে তাহাদের মধ্যেও খুব আছে। যাহারা সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদের দেবদেবীর কথা শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক মহাজন মতে অনেক দেবদেবী আসিয়া জুটিয়াছিল। মহাযান মতটা বড়ই দার্শনিক মত কিনা—একেবারে সাংখ্যবাদ

* এক বিহারের সকল ভিক্ষুকে খাওয়ানর নাম সঙ্ঘ-ভোজন আর নিকটবর্ত্তী সকল বিহারের সকল ভিক্ষুকে খাওয়ানর নাম সম্যক সম্ভোজন।

ভাঙ্গিয়া অন্বয় বাদে উপস্থিত কিনা—তাই উহাতেই দেবদেবী সকলেরা আগেই আসিয়া জুটিলেন। বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ—মহাযান মতে এই তিনটী জিনিষ স্বগ্ন হইয়া দাড়াইল প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধ হইলেন উপায, ধর্ম্ম হইলেন প্রজ্ঞা এবং সঙ্ঘ হইলেন বোধিসত্ত্ব। দেখিতে দেখিতে প্রজ্ঞা ঠাকুরাণী বুদ্ধের শক্তি হইয়া দাঁড়াইলেন; কারণ, উপায পুংলিঙ্গ এবং প্রজ্ঞা স্ত্রীলিঙ্গ। উভয়ের সংযোগে বোধিসত্ত্বের উৎপত্তি হইল। প্রজ্ঞা নিষ্কাম নিষ্ক্রিয, উপায়ও নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়, সুতরাং সৃষ্টি-স্থিতি-লয চলে না। একটা সকাম সক্রিয় শক্তির দরকার—তিনি হইলেন বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধ ও ধর্ম্মের অপেক্ষা বোধিসত্ত্বের পূজা বেশী বেশী হইতে লাগিল। কারণ, নিষ্কাম নিষ্ক্রিযের উপাসনা করিযা কি হইবে? সুতরাং সকাম সক্রিয় শক্তির উপাসনা হইতে লাগিল—অনেকগুলি বোধিসত্ত্ব ঠাকুর হইয়া দাড়াইলেন। তাঁহাদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর প্রধান। বর্ত্তমান কল্পের ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ ও তাঁহার শক্তি পাণ্ডরা ইহঁাদের দুই জনের সংযোগে উৎপন্ন অবলোকিতেশ্বর,—বর্ত্তমান কল্পের প্রধান দেবতা। তাঁহার অনেক মূর্ত্তি, অনেক মস্তক, অনেক হস্ত, অনেক পদ, অনেক নাম, অনেক মন্দির। তাঁহাব ভক্তের সংখ্যাও অনেক বেশী। কারণ এই কল্পে কাহাকেও বুদ্ধ হইতে হইলে তাঁহার কৃপা ভিন্ন হইবার যো নাই। যাহা হউক, বুদ্ধাদিব মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হইবার সময় একটা বড় মুস্কিল হইল—কারণ, এখন হইতে শক্তির সহিত জড়িত বুদ্ধমূর্ত্তির উপাসনা আরম্ভ হইল। সুতরাং আমরা অর্থাৎ অভক্তেরা যাহাকে অশ্লীল বলি, সেই অশ্লীল মূর্ত্তি সমূহেরও পূজা হইতে লাগিল। ঐ মূর্ত্তির যে কত বিচিত্র ভঙ্গী আছে তাহা এখনকার লোকে কল্পনা করিতেই পারে না। অনেকে ইহাকে Tantric Buddhism বলেন। তন্ত্রে শিবশক্তি পূজা, যুগলাস্থ মূর্ত্তির উপাসনা—এখানেও বুদ্ধ ও তাঁহার শক্তি পূজা, যুগলাস্থ মূর্ত্তিব উপাসনা। সুতরাং এই উপাসনারও নাম হইল তান্ত্রিক বৌদ্ধোপাসনা। বৌদ্ধধর্ম্মে গোড়ায যে কঠোরতা, কাঠিন্য ছিল এখন তাহা

বেশ সরস হইয়া উঠিল। উহাতে লোকেরও মন ভিজিল। লোকে সহজে নির্ব্বাণের পথ পাইল—ইহারই নাম সহজিয়া ধর্ম্ম। সহজিয়া ধর্ম্মের অর্থ ভগবান্ বুদ্ধ যখন সহজ ভাবে থাকেন। যখন তিনি শক্তির সহিত মিলিত, অথচ শক্তির সন্তানসম্ভাবনা উপস্থিত হয় নাই। এই সময় ভগবানের কাছে যাহা বর চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়। এই সময়েই তাঁহার করুণার পরমা স্ফূর্ত্তি। সুতরাং ভক্তের পক্ষেও উপাসনার এই প্রশস্ত সময়। এই যে সরস মধুর ভাব, ইহা ক্রমে অন্য অন্য ধর্ম্মেও ছড়াইয়া পড়িল। বৈষ্ণবের যুগল মিলনও এই সহজরূপেরই রূপান্তর মাত্র; তবে বৈষ্ণবের সহজিয়া ও বৌদ্ধের সহজিয়া মতে একটু তফাৎ আছে। বৌদ্ধের সহজিয়া সম্পূর্ণভাবেই রূপক, এবং ঐ রূপক আপনাকে দিয়াও ফলাইতে পারা যায়। কিন্তু বৈষ্ণবের সহজিয়া ঠাকুর ঠাকুরাণীর সহজিয়া—তাহাতে একটু ভক্তিরস থাকে। নিজের দেহের উপর উহার experiment চলে না।

এই যে দেশব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্ম, ইহা এখন কোথায় গেল? যখন সহজিয়া ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাবে বাঙ্গালী একেবারে অকর্ম্মণ্য ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই সময় আফগানীস্থানের খিলিজীরা আসিয়া উহাদের সমস্ত বিহার ভাঙ্গিয়া দিল—দেবমূর্ত্তি, বিশেষতঃ যুগলাদ্য মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া দিল—সহস্র সহস্র নেড়া ভিক্ষুর প্রাণনাশ করিল। বড় বড় বিহারে যে সকল যথার্থ পণ্ডিত ও সাধু ছিলেন তাঁহারাও ঐ সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন—তাঁহারাই ঐ ধর্ম্মের অস্থি ও মজ্জা স্বরূপ ছিলেন। অস্থি ও মজ্জার নাশ হইলে দেহেরও নাশ হয়, সেইরূপ তাঁহাদের মৃত্যুতে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম্মেরও নাশ হইল।

মুসলমান বিজয়ের এক বা দুই পুরুষ পূর্ব্বে বল্লালসেন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সেন্‌সাস্ লইয়াছিলেন। সাড়ে তিন শত ঘর রাঢ়ী ও সাড়ে চারি শত ঘর বারেন্দ্র হইয়াছিল। ইহার উপর কিছু সাতশতী, কিছু পাশ্চাত্য ও কিছু দাক্ষিণাত্য ছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ-সংখ্যা তখন সব শুদ্ধ দুই হাজার ঘরের অধিক ছিল বলিয়া বোধ

হয় না। এত দিন ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সহিত ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। কখন তাঁহারা হঠিতেন কখন বা ইঁহারা হঠিতেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ প্রণীত বহুসংখ্যক দার্শনিক পুস্তকে এই ঘোরতর বিচারের নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলমান বিজয়ে বৌদ্ধমন্দিরের ও বৌদ্ধদর্শনের একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। উহাতে ব্রাহ্মণদের প্রভাব বৃদ্ধি হইল বটে কিন্তু বৌদ্ধের বদলে এখন মুসলমান মৌলবী ও ফকীর তাহাদের প্রবল বিরোধী হইয়া উঠিল। সুতরাং দেশের যেখানে যাহার জোর বেশী সেখানে তাহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ঐরূপে বাঙ্গালার অর্দ্ধেক বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া গেল এবং অপর অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণের শরণাগত হইল আর বৌদ্ধদিগের মধ্যে যাহারা তখন নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল—মুসলমান ও ব্রাহ্মণ উভয় পক্ষ হইতেই তখন তাহাদের উপর নির্য্যাতন উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া দিলেন অর্থাৎ অসভ্য বাগ্দী, কৈবর্ত্ত, কিরাতের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন—আর মুসলমানেরা তাহাদের উপর নানারূপ দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। কিন্তু এই ধর্ম্মপ্রচার ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের একটু বাহাদুরী দিতে হয়। তাহারা বাঙ্গালার রাজশক্তির সাহায্য প্রায়ই পায় নাই, তথাপি পাঁচটী মাত্র প্রাণী আসিয়া অর্দ্ধেক দেশটাকে যে অল্পকালের মধ্যে হিন্দু করিয়া ফেলিয়াছিল ইহা অল্প বাহাদুরীর কাজ নয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে যাহারা অনাচরণীয় ছিল এবং মুসলমানাধিকারের পরে নূতন সমাজে যাহারা অনাচরণীয় হইল—বৌদ্ধধর্ম্ম শেষে তাহাদের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া পড়িল এবং তাহারা ক্রমে প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব ভুলিয়া গেল। শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, করুণাবাদ ভুলিয়া গেল; দর্শন ভুলিয়া গেল। শীল বিনয় ভুলিয়া গেল। তখন রহিল জনকতক মূর্খ ভিক্ষু অথবা ভিক্ষু নামধারী বিবাহিত পুরোহিত। তাহারা আপনার মত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গড়িয়া লইল। তাহারা কূর্ম্মরূপী এক ধর্ম্মঠাকুর বাহির করিল। এই যে কূর্ম্মরূপ ইহা আর কিছু নহে, স্তূপের আকার। কূর্ম্মের যেমন চারিটী পা ও গলা—

এই পাঁচটা অঙ্গ থাকে, স্তূপেরও তেমনি পাঁচটা অঙ্গ থাকিত। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারিদিকে চারিটী ধ্যানী বুদ্ধ থাকিতেন এবং দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে আর একটী ধ্যানী বুদ্ধ থাকিতেন—এইরূপে স্তূপটী পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের আবাসস্থান হইয়া ধর্ম্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিরূপে পরিগণিত হইত। সুতরাং কূর্ম্মরূপী ধর্ম্ম ও স্তূপরূপী ধর্ম্ম একই। পঞ্চ বুদ্ধের প্রত্যেকের যেমন একটী করিয়া শক্তি ছিল, ধর্ম্মঠাকুরেরও তেমন একটী শক্তি হইলেন, তাঁহার নাম কামিণ্যা। তিনি সব দেবতার বড়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ভগবতী, বিশালাক্ষী, বাশুলী, কালী, গণেশ, রাজা, কোটাল, মন্ত্রী, এই সকল ধর্ম্ম-ঠাকুরের আবরণ দেবতা। ধর্ম্মঠাকুর আজও যে বাঁচিয়া আছেন, সে কেবল মানতের জোরে। নদীয়ার উত্তর জামালপুরের ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে বারশত পাঁঠা পড়ে। ধর্ম্মঠাকুর প্রত্যেক স্থানেই কোন না কোন রোগের ঔষধ দেন। বড়ালের ধর্ম্মঠাকুর 'ক্ষুদিরাম' রক্তামাশয়ের ঔষধ দেন। সোঁযাগাছির ধর্ম্মঠাকুর পেটের অসুখের ঔষধ দেন। বৈচীর নিকটে অচলরায় পিত্ত-ফোটের ঔষধ দেন। তিনি অনাচরণীয় জাতির হাতে পূজা খাইতে ভালবাসেন। তাঁহার সেবকেরা প্রায় ডোম, হাড়ি ইত্যাদি অনা-চরণীয় জাতি। ধর্ম্মমঙ্গলের কালুরায়কে লাউসেন যখন স্বর্গে নিতে চাহিলেন, কালুরায় (ডোম) তখন জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে মদ ও শূয়রের মাংস পাওয়া যায় কি না। লাউসেন বলিলেন "না।" কালুরায় উহা শুনিয়া বলিল, "আমি যাইব না।" লাউসেন তখন কালু ডোমের উপর ধর্ম্মঠাকুরের পূজার ভার দিয়া গেল। সেই অবধি ডোমেরা তাঁহার প্রধান পূজক। বাঙ্গালাদেশে ইহাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ পরিণাম।

---

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্ত্তৃক বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত বুদ্ধোৎসব-সভায় পঠিত।

নওচন্দী।

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস)

ময়রাষ্ট্র বা মীরাটের অন্তর্গত সহরসংলগ্ন ও সূর্য্যকুণ্ড নামক সরোবরের অনতিদূরস্থ বিস্তীর্ণক্ষেত্রে প্রতিবৎসর একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। ইহা নওচন্দীর মেলা নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে প্রধানতঃ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দেশীয় অশ্ব বিক্রয়ার্থ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, এবং স্থানীয় ও চতুর্দ্দিকের দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের সমাবেশ হয়। এই সূত্রে বহু দূর দূরান্তর হইতে বহুলোকের জনতা ও বিবিধ ক্রীড়া-কৌতুক, নাচ তামাসায় কয়েক দিনের জন্য স্থানটি আনন্দকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। হোলাকা বা হোলী জ্বালিবার ঠিক নয়রাত্রি পরে এই মেলার আরম্ভ হয় বলিয়া সাধারণতঃ ইহা নওচন্দী নামে অভিহিত। এই মেলাস্থল হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই একটি তীর্থক্ষেত্র। কারণ, এখানে প্রসিদ্ধ পীর বালেমিঞার দর্‌গা অবস্থিত এবং তাহারই সন্নিকটে চণ্ডীদেবীর মন্দির। আজ কয়েক বৎসরের কথা, আমরা প্রদর্শনীয় নানা স্থান ও নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে হিন্দু-মুসলমানের এই মিলনক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলাম এবং পীরস্থান দর্শন করিয়া চণ্ডীদেবীর মন্দির-মণ্ডপে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলাম। ক্ষণকাল পরে মন্দিরের পূজারী ঠাকুরের সহিত আলাপ হইল। দর্‌গার সন্নিকটে চণ্ডীদেবীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, তিনি নওচন্দীর পূর্ব্ব কাহিনী যেরূপ বর্ণন করিলেন তাহাতে বুঝিলাম, জনৈক প্রতাপান্বিত হিন্দুর কুমারী-কন্যার নাম ছিল নওচন্দী। বহ্‌রাইচ, বারাবাঙ্কী, এলাহাবাদ, মীরাট প্রভৃতি স্থানে বালেমিঞার দর্‌গা বলিয়া যে পীরস্থান দেখা যায়, তাহা গাজীমিঞা সৈয়দ্ সলারের পিতা বালেমিঞার কবর। এক ব্যক্তির বহুস্থানে সমাধি বিদ্যমান থাকা ভারতে নূতন নহে। কথিত আছে, বালেমিঞা

যে যে স্থানে প্রকট ভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার কোন না কোন স্মারক বস্তুর সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহার নিবাসভূমি বহাইচেই সমাধিস্থ হন। তাঁহার সময়ে সূর্য্যকুণ্ডের কিছু দূরে এক 'জিন' বা 'দেও' বাস করিতেন। পূর্ব্বে হিন্দুর ধর্ম্মবীর অশিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক 'দেও' বা 'জিন' নামে অভিহিত হইতেন। নওচন্দা উক্ত জিনেরই কন্যা ছিলেন। এই জিনের সহিত ফকীর বালেমিঞার যুদ্ধ হয়।* প্রবলতর ঐশীশক্তিসম্পন্ন অদ্ভুতকর্ম্মা বালেমিঞা হিন্দু জিনের সৈন্যকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করেন† এবং জিনের প্রাণ বধ ও রাজ্য নাশ করিয়া জেহাদের জয়নাদ করিতে থাকেন।

পিতৃরাজ্য উৎসন্ন, পিতৃরক্তে কলঙ্কিত এবং নরশোণিতে প্লাবিত হইতে দেখিয়া বালিকা নওচন্দা বালেমিঞার নিকট আত্মবলি দিতে উপস্থিত হন। ফকীর বলিলেন, "আমি স্ত্রীলোকের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করি না।" কিন্তু অনাথা বালিকার নয়নজল তাঁহার হৃদয় দ্রব করিল। তিনি বলিলেন, "ভয় নাই। আমি এমন কোন উপায় করিয়া দিব যাহাতে তোমার অন্নচিন্তা ত থাকিবেই না অধিকন্তু তোমার নাম জগতে চিরস্মরণীয় হইবে।" বালেমিঞা তখন নিজের একটি অঙ্গুলি কর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান প্রদর্শনীক্ষেত্রের মধ্যস্থলে তাহার কবর দেন। এই কবর একটি বিখ্যাত দরগায় পরিণত হয়। বালেমিঞা বলেন, এই স্থানে যে যাহা মানত করিয়া

* মীরাটে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বে সূর্য্যকুণ্ডের তীরে এক সন্ন্যাসী ও এক ফকীর একত্র একটি মন্দিরমধ্যে সম্প্রীতির সহিত বাস করিতেন। উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ ছিল না। এমন কি একটি ব্যাঘ্র উভয়েরই বাহনস্বরূপ সর্ব্বদা নিকটে থাকিত। তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উভয়ে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতেন।

† খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মীরাট জাটদিগের দ্বারা অধিকৃত এবং হিন্দু দেবমন্দিরাদিতে পূর্ণ ছিল। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে ইহা মুসলমানদিগের দ্বারা প্রথম আক্রান্ত হয়। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী ইহা জয় করিয়া প্রায় সমস্ত হিন্দুমন্দির মস্জিদে পরিণত করেন।

পূজা দিবে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। সিদ্ধ পুরুষের এই বাণী শুনিয়া দরিদ্র ও নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ তদবধি রেউড়ী, ভেলীগুড়, নূতন বস্ত্র প্রভৃতি উপচারে এখানে পূজা দিতে আরম্ভ করে। নওচন্দীর তাহাতেই দিনপাত হইতে থাকে। কথিত আছে, এই পুণ্যবতী বালিকা ভগবদ্ভক্তি ও নির্ম্মল চরিত্র প্রভাবে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কুমারী অবস্থাতেই তাঁহার জীবনের অবসান হয়। বালেমিঞার দর্‌গার সন্নিকটে উদ্যানমধ্যস্থ এই মন্দির—যাহা চণ্ডীদেবীর মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ—অনেকের মতে নওচন্দীর মৃত্যুর পর স্থাপিত। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী সিন্দুর-বিলেপিতা দেবীমূর্ত্তি কাহার মতে নব চণ্ডী এবং কাহার মতে সেই জিনকন্যা ব্রহ্মচারিণী নওচন্দীর স্মারক-মূর্ত্তি। পূজারীঠাকুর বলেন, এই দেবীমূর্ত্তি মন্দিরতল ভেদ করিয়া উত্থিতা হইয়াছেন।

পীরের দর্‌গা পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। তথায় পীরজী বলিয়া এক মুসলমান সাধু আছেন। তিনি একটি 'নাগরা' অর্থাৎ বৃহৎ ঢক্কা বাজাইতে থাকেন এবং স্ত্রীলোকেরা স্ব স্ব মানসিক মত পূজা দিলে পর, পীরজী তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দেন। পার্শ্বেই মন্দিরমধ্যে শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢোল, কাঁসি বাজে - পূজা হয়—গান হয়—তাস পাশাও চলে; আবার তাহারই মধ্যে পূজারী যাত্রিগণকে পূজার মন্ত্র পড়াইয়া দেবীর প্রসাদসহ বিদায় দেন। এইরূপে দর্‌গা ও মন্দিরে বারমাসই হিন্দু-মুসলমানের সমাগম হইয়া থাকে এবং অনাথা বালিকার নাম সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। হিন্দু 'দেও' ও মুসলমান পীরের এই কাহিনী আজি গল্পে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু পূতশীলা। নওচন্দীর স্মৃতি লোকসমাজে চিরজাগ্রৎ হইয়া আছে। চরিত্র এমনই অমৃত।

শঙ্করদেব।

(শ্রীরমণীকান্ত বসু)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অতঃপর শঙ্করদেব আর একবার তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পাটবাউসিতে প্রত্যাবৃত্ত হন। শঙ্করদেব প্রত্যাগমন করিলে পর, কতিপয় ব্রাহ্মণ শঙ্করদেবের তীর্থ-ভ্রমণেতিহাস শ্রবণ করিয়া স্ব স্ব কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আগমন করেন। শঙ্করদেব স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত সবিশেষ উপদেশচ্ছলে কহিলেনঃ—

সর্ব্ব তীর্থ শিরোমণি নামধর্ম্ম সার।
নামের কিঙ্কর তীর্থ যত ব্রতাচার॥
জানিয়া ব্রাহ্মণ নাম-ধর্ম্ম করিয়ো।
নামের প্রসাদে লোবা বৈকুণ্ঠে চলিযো॥

এতচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্র হইতে নানা শ্লোকোদ্ধৃত করিয়া শঙ্কর-বাক্যের অবৈধতা প্রতিপন্ন করিতে বহু প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু শঙ্করদেব অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়ায় তাঁহারা লজ্জিত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণগণ তর্কে পরাস্ত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে মহারাজ নরনারায়ণকে উত্তেজিত করিতে কোনরূপ চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। তাঁহাদিগের বিদ্বেষভাবাপন্ন মিথ্যাভিযোগে অবশেষে নারায়ণ শঙ্করদেবকে বন্দী করিয়া আনিতে চর প্রেরণ করিলেন। কিন্তু যুবরাজ শুক্লধ্বজের কৌশলে চরগণ বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিল। শঙ্করদেব শুক্লধ্বজের নিকট আশ্রয় লাভ করিয়াছেন শুনিয়া রাজা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত প্রকাশ্য বিচারার্থ রাজসভায় আহ্বান করিলেন। তদনুসারে কয়েক দিবস

শঙ্করদেব ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তর্ক চলিল। অবশেষে শঙ্করদেবেই বিজয়ী হইলেন। মহারাজ নরনারায়ণ শঙ্করদেবের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রীতি-উপহার স্বরূপে বহু ধনরত্ন প্রদানপূর্ব্বক 'অশেষ মানের হারে ভূষিত' করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন। ভক্ত এবং বন্ধুবর্গ শঙ্করের জয়বার্ত্তা শ্রবণে মহোল্লাসে নিমজ্জিত হইলেন।

শঙ্করদেব পাটবাউসীতে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া মহোৎসাহে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি মহারাজ নরনারায়ণের রাজধানী বেহার নগরে গমন করেন। যুবরাজ শুক্লধ্বজ ও তৎপত্নী ভুবনেশ্বরীদেবী সাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। শঙ্কর-শুভাগমন-সংবাদে নরনারায়ণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তাঁহার আদেশে শঙ্করদেবের জন্য রাজবাসে একটী নামঘর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইল। নরনারায়ণ তাঁহাকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া মহাসম্মান প্রদর্শন করিলেন। রাজানুগ্রহ এক্ষণে শঙ্করদেবের প্রতি অনুকল হওয়ায়, বিরুদ্ধচারিগণ আর বড় মস্তকোত্তলন করিতে পারিল না। তিনি নিশ্চিন্ত মনে হরিনাম-সুধা পান ও দান করিতে লাগিলেন; প্রায় প্রতি দিবসই রাজসভায় সুমধুর কৃষ্ণকথা কহিয়া রাজা, প্রজা ও সভাসদ্‌বৃন্দকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন।

যতই দিবস অতিবাহিত হইতে লাগিল, মহারাজ নরনারায়ণ ততই শঙ্করদেবের প্রতি আসক্ত হইতে লাগিলেন। নরনারায়ণ অবশেষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। শঙ্করদেব রাজা, স্ত্রীলোক ও যাজক ব্রাহ্মণের গুরুপদে বৃত হইতেন না। সেই জন্য প্রথমে মহারাজের অনুরোধ পালনে স্বীয় অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু অবশেষে নরনারায়ণের সনির্ব্বন্ধানুরোধে তাঁহাকে অগত্যা দীক্ষিত করিতে সম্মত হন; কিন্তু উক্ত কার্য্য সম্পাদনের পূর্ব্বেই তিনি পদ্মাসীনাবস্থায় দেহত্যাগ করেন। এইরূপে ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ শঙ্করদেব,—হরিনাম-ধ্বনিতে আসাম গগন প্রকম্পিত করিয়া, অতুল প্রতাপশালী সুরম্য হর্ম্ম্য-নিবাসী নৃপতির সৌধমালা হইতে সামান্য জীর্ণ পর্ণকুটীরবাসী

দরিদ্রের গৃহ পর্য্যন্ত হরিনামের প্রবল প্রেমপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়া ১৪৯০ শকের ভাদ্রমাসে মহানগর বেহারে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে, দিবা দেড় প্রহরকালে, এই নশ্বর ধরা হইতে মহাপ্রস্থান করিলেন।

ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের ন্যায় অসমীয় সাহিত্যও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগের নিকট হইতে স্বীয় বিকাশ-লাভে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিযাছে। বঙ্গীয় সাহিত্য যেরূপ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসাদি বৈষ্ণব কবিগণের ও রামপ্রসাদাদি কালী-ভক্তদিগের প্রেম-ভক্তিপূর্ণ গীতি ও কবিতা দ্বারা সমলঙ্কৃত, মহা-রাষ্ট্রীয় সাহিত্য যেরূপে তুকারামাদি সাধু, ভক্ত ও জীবন্মুক্ত মহা-পুরুষদিগের 'অভঙ্গাদি' দ্বারা সংবর্দ্ধিত, হিন্দী সাহিত্য যেরূপ তুলসীদাসাদি দ্বারা পরিপুষ্ট ও তামিল যেরূপ ভক্তশ্রেষ্ঠ তিরু-বল্লিয়ারের সুমধুর সঙ্গীত ও মনোহর পদাবলী দ্বারা ঝঙ্কৃত, অসমীয় সাহিত্যও তদ্রূপ ধর্ম্মবীর শঙ্কর ও তৎশিষ্যপ্রশিষ্যাদি দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত, উন্নীত ও পরিপুষ্ট হইযাছে। শঙ্করদেব অসাধারণ কবি-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থায ব্যঞ্জন বর্ণ শিক্ষা সমাপ্তির অনতিপরেই তিনি যেরূপ সুন্দর কবিতা রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা দর্শন করিলে বস্তুতঃই আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইতে হয়। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য ঐ কবিতাটী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।—

করতল কমল কমলদল নয়ন।
ভবদব দহন গহন বন শয়ন॥
নপর নপর পর সতরত গময়।
সভয় সভয় ভয়মপহর সততয়॥
খরতর বরশর হত দশ বদন।
খগচর নগধর ফণধর শয়ন॥
জগদঘ মপহর ভবভয় তরণ।
পরপদলয় কমলজ নয়ন॥

একদা কতিপয় ব্রাহ্মণ শঙ্করদেবের নিকট শরণ প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি কদাচ ব্রাহ্মণদিগের দীক্ষাগুরু হইতেন না। তাই ব্রাহ্মণদিগকে 'শরণ' প্রদান করিবার একটী নবোপায় উদ্ভাবিত করিলেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধাবলম্বনে তিনি 'গোপী-উদ্ধব-সংবাদ' নামক একটী শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। ঐ শাস্ত্রগ্রন্থটী ব্রাহ্মণদিগের পুরোভাগে স্থাপিত করিয়া তাঁহাদিগকে 'শরণ' প্রদান করিলেন। এই 'গোপী-উদ্ধব-সংবাদ' শঙ্করদেবের রচিত প্রথম গ্রন্থ। দেশ মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত দুরূহ শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের মর্ম্মের বহুল প্রচার কামনায় শঙ্করদেব বহু শাস্ত্রগ্রন্থ ব্রজভাষার সহিত সংমিশ্রিত আসামী ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। তিনি বহু কীর্ত্তন, গীত ও ভটিমা রচিত ও প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, অসমীয় সাহিত্যের নবজীবন প্রভাতে শঙ্করদেব তরুণ তপনের ন্যায় সমুদিত হইয়া, বীণাপাণির মন্দিরে স্বীয় সুমনোহর গ্রন্থরাজি অর্ঘ্য প্রদান করিয়া, অসমীয় সাহিত্যের প্রকৃত জনকের বরণীয় ও মহনীয় পদে সমাসীন হইয়াছেন।

বঙ্গদেশ যখন প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেমতরঙ্গে প্লাবিত, প্রায় ঠিক সেই সময়েই আসাম গগন প্রকম্পিত করিয়া শঙ্করদেব নামমহিমা উচ্চে বিঘোষিত করিতেছিলেন। এই মহাপুরুষদ্বয়ের জীবনে যেরূপ কতকটা সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ কতকটা বৈসাদৃশ্যও বর্ত্তমান। চৈতন্যদেব ও শঙ্করদেব উভয়েই স্ব স্ব মতানুবর্ত্তিগণ কর্ত্তৃক শ্রীভগবানের অবতার বলিয়া পরিগৃহীত ও সম্পূজিত হইয়া আসিতেছেন; উভয়েরই জীবনের ব্রত—বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার, আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ। কিন্তু চৈতন্যদেব জাত্যংশে ব্রাহ্মণ, শঙ্করদেব কায়স্থ, চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র, শঙ্করদেব ধনজন-শ্রীসম্পন্ন শিরোমণি ভূঞার গৃহে জাত।

অসমীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে চৈতন্যদেবের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে শঙ্করদেবের নাম অতি বিরল। যে দুই এক স্থলে দৃষ্ট হয়, তথায়ও উহা আসামের শঙ্করদেবকেই নির্দ্দেশ

করিতেছে কি না নিশ্চিত করিয়া বলা যায়না। শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় শিশির-কুমার ঘোষ মহোদয় তদীয় 'অমিয় নিমাই চরিত' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে অসমীয় ধর্ম্ম-প্রচারক শঙ্করদেব শান্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে কিয়ৎকাল শাস্ত্র গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত চৈতন্যদেবের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীঅদ্বৈতের সহিত তাঁহার ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তির মতবিরোধ হওয়ায়, তিনি শান্তিপুর হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রচার না করিয়া শুধু তাঁহার ধর্ম্মের ছায়া প্রচার করেন। অসমীয় লেখকগণ কিন্তু শঙ্করদেব কর্ত্তৃক 'শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের ছায়া প্রচার' সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেন।

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয় তদীয় অক্ষয়কীর্ত্তি 'ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে, 'মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "শুনিতে পাই, শঙ্করদেব সাকার দেবতার উপাসক ছিলেন না; প্রতিমা পূজার, এমন কি প্রতিমা দর্শনেরও বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, 'অন্য দেবীদেব, না করিও সেব, না খাইবা প্রসাদ তার। গৃহে না পশিবা, মুক্তিকো না চাহিবা, ভক্তি হবে ব্যভিচার॥" শঙ্করদেব প্রতিমা পূজার বিরোধী হইলেও, তিনি যে সাকার মতের বিরোধী ছিলেন এরূপ বলা যায় না; বরং শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া প্রণীত 'শ্রীশঙ্করদেব আরু মাধবদেব' গ্রন্থোদ্ধৃত কথোপকথন হইতে প্রতীত হইবে যে তিনি সাকারমতেরই পোষক ছিলেন। একদা কতিপয় ব্রাহ্মণ শঙ্করদেবের সহিত কথাপ্রসঙ্গে শাস্ত্রমত উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন যে, "পরব্রহ্ম নিরাকার, তাঁহার কোন রূপ হইতে পারে না।" শঙ্করদেব তদুত্তরে বলিলেন, "পরব্রহ্ম নিরাকার বটে, কিন্তু জীবের পরিত্রাণ হেতু ব্রহ্মই আকার ধারণ করিয়া প্রকাশিত হন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য ব্রহ্ম সাকার হইয়া অবতাররূপে প্রকাশিত হন। * * * আকার বিহীনকে চিন্তা করিবার উপায় নাই দেখিয়াই পরব্রহ্মই

আকার ধারণ করেন।"* শঙ্করদেব একস্থলে বলিয়াছেন, "মুখে বোলা রাম, হৃদয়ে ধরা রূপ"। ইহা হইতেই প্রতীত হয় যে বিগ্রহসেবা নিষিদ্ধ হইলেও, হৃদয়ে ঈশ্বরের কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ ধারণ করা শঙ্করদেবের অনমুমোদিত নহে। আমাদিগের মধ্যেও মূর্ত্ত্যাদির অভাবে ঘটস্থাপন করিয়া হৃদয়ে দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান করার প্রথা প্রচলিত আছে।

তিনি কৃষ্ণ ও রাম প্রভৃতি অবতারের অর্চ্চনা ব্যতীত অন্যান্য দেবদেবীর পূজা দৃঢ়রূপে নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য তিনি কদাপি পূর্ব্বোক্ত দেবদেবীদিগের ও তৎপূজকদিগের নিন্দাবাদ করেন নাই। মহারাজ নরনারায়ণের সভায় এ বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "প্রবৃত্তিমার্গে গমনকারিগণকে এবং তাঁহাদিগের পূজিত ও অর্চ্চিত দেবতা সকলকে নিবৃত্তিমার্গগামিগণ কখনও নিন্দা বা প্রশংসা করিবে না, কেবল কৃষ্ণকেই অর্চ্চনা ও ভক্তি করিবে।"*

শ্রীচৈতন্যদেবের 'রুক্মিণী হরণ' অভিনয় হইতেই বঙ্গে যাত্রার উদ্ভব হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণে ধর্ম্মপ্রচারই যাত্রার মহান্ উদ্দেশ্য। শঙ্করদেবও আসামে 'ভাওনা' নামে একরূপ নাটক প্রস্তুত করেন। ইহার উদ্দেশ্য আমোদপ্রিয় সাধারণলোকদিগকে আমোদের ভিতর দিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া।

শঙ্করদেব পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর ব্যক্তি ব্যতীত জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল ব্যক্তিকেই স্বীয় শিষ্যপর্য্যায়ভুক্ত করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব যেরূপে যবন হরিদাসকে শিষ্য করিয়াছিলেন, আসামের শঙ্করদেবও তেমনি চান্দসাই নামক জনৈক মুসলমানকে নিজ শিষ্যগণের অন্যতমরূপে পরিগণিত করিয়াছিলেন। এই মুসলমান শিষ্য শঙ্করদেবের একান্ত অনুগত ভক্ত ও অনুরক্ত সেবক ছিলেন। গারো, ভোটাদি পার্ব্বত্য জাতীয় বহু ব্যক্তিও শঙ্করদেবের

* লক্ষ্মী বাবুর পুস্তক হইতে অনূদিত।

নিকট হরিনাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। মাধবদেব তাই গাহিয়াছেন,—

"পারো ভোট যতনে হরির নাম লয়।
হেনয় হরির নাম সজ্জনে নিন্দয় ॥"

হাজারিবাগের দেবস্থান-ও কোল জাতি।

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন)

দেহ ক্ষণস্থায়ী, তথাপি মানব অমরত্ব চায়। চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবার এই ইচ্ছাই মানবকে তাহার স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া যাইবার প্রবৃত্তি দেয়—স্মৃতিরূপে সে নিত্য বিদ্যমান থাকিতে চায়। এই স্মৃতি-রক্ষা করিবার অদ্ভুত চেষ্টাই মানবজাতির ইতিহাস।

এই স্মৃতিরক্ষাকার্য্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারত এই জগৎকে পরিবর্ত্তন ও পরিণামশীল দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে, চঞ্চলতায় কখনও অমরত্বে থাকিতে পারে না। কারণ, যাহা অমর তাহাই নিত্য, আর যাহা নিত্য তাহা বহু হইতে পারে না। এই বহুত্বের ইতিহাস রাখিবার চেষ্টা ভারত কখনও বিশেষভাবে করে নাই। পরন্তু যে সকল ভাব্ নিত্যত্বের দ্যোতক-স্বরূপ বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাই রক্ষা করিতে ভারতের সমস্ত যত্ন, ভারতের সমস্ত শ্রম ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাই আজ আমরা ভারতে যত তীর্থ, যত দেবমন্দির, যত চিন্ময়ভাব-প্রকাশক দেবদেবীর বিগ্রহ দেখিতে পাই, জগতের আর কুত্রাপি তত দেখিতে পাই না। কতবার এই সব তীর্থ বিধ্বস্ত হইয়াছে, কতবার ঐ সব দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণীকৃত হইয়াছে, কিন্তু আবার ততবারই তীর্থ সব জাগিয়া উঠিয়াছে, আবার ততবারই গগনস্পর্শী বৃহৎ বৃহৎ মন্দিরে পাষাণমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। কেন এমন

হইয়াছে? ভাঙ্গা জিনিষকে গড়িয়া তুলে, পাথরে ভাব দেখে—এই জাতি কি সত্যই বাতুল? না,সে বুঝিয়াছে যে, তীর্থ, মন্দির ও পাষাণমূর্ত্তি সমস্তই শাশ্বত ভাবরাশির বহির্বিকাশের চেষ্টার উৎকৃষ্টতম ফলস্বরূপ।

এই তীর্থদর্শন হিন্দুর এক প্রবল নেশা। বোধ হয়, যখন রেল বা জাহাজ হয় নাই তখন এই নেশা আরও অধিক ছিল। দুর্লভ জিনিষকে পাইবার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক ও একবার পাইলে তাহাকে কৃপণের ধনের মত আকড়াইয়া রাখিতে চায়। এখন তীর্থ দর্শন সুগম হইয়াছে। তাই সেই ইচ্ছার প্রবল টান আজ আমাদের কমিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখন আমরা বহু তীর্থের নামও জানি না—সন্ধানও রাখি না।

হাজারিবাগ ছোট নাগপুরের দ্বিতীয় সহর। ছোট নাগপুরে যে বহুতীর্থ বর্ত্তমান তাহা আমরা অনেকে জানি না। বিশেষতঃ, এই স্থানের তীর্থগুলি যে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি ইহা ত আমার অশ্রুত-পূর্ব্বই ছিল।

বিগত ৺শারদীয়া পূজার সময় আমাকে হাজারিবাগে যাইতে হইয়াছিল। ই, আই, রেলওয়ের গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনে হাজারিবাগ-রোড ষ্টেশন। কলিকাতা হইতে হাজারিবাগ বেশী দূর নহে। মেলে হাজারিবাগ রোড ষ্টেশনে ৬ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছান যায়। ষ্টেশনে নামিয়া হাজারিবাগে যাইবার জন্য মোটর পাওয়া যায়। ষ্টেশন হইতে হাজারিবাগ প্রায় ৪২ মাইল হইবে। পথের দৃশ্য অতি মনোহর। হাজারিবাগ একটী মালভূমির উপর অবস্থিত এবং অতি স্বাস্থ্যকর স্থান; কিন্তু ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ। এ অঞ্চলে কয়লা ও অভ্রের খনি আছে।

হাজারিবাগে অনেকগুলি শিবমন্দির। অনেক মন্দিরেই দেবাদিদেবের নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। সহরে একটী শ্রীশ্রীকালিকা দেবীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি আছে। দর্শনে যাইলাম। সেবক একজন বাঙ্গালী গৃহস্থ। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এই মূর্ত্তি বাঙ্গালীরই স্থাপিত। মূর্ত্তিটী আকারে মানুষ প্রমাণ "শবারূঢ়াং

মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাং” মূর্ত্তি। শনি মঙ্গলবারে মায়ের নিকট অল্পবিস্তর ভক্ত সমাগম হইয়া থাকে। দেবী তাঁহার সেবকের বাটীর বহির্ভাগে একটী প্রশস্ত ঘরে উত্তরাস্য হইয়া দণ্ডায়মানা। সেবকের নিকট শুনিলাম, দেবী তাঁহাদেরই বংশের ঠাকুর। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের একজন পূর্ব্বপুরুষ সাধনোদ্দেশ্যে ঐ দেশে আসিয়া বাস করেন এবং সিদ্ধ হন। দেবীমূর্ত্তি তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। ঐ স্থান ভাল লাগায় তিনি সপরিবারে ঐখানে বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের যে বংশ তালিকা ও বিবরণ আছে তাহা হইতেই এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। হাজারিবাগের জনসাধারণেরও ঐরূপ বিশ্বাস। বর্ত্তমান সেবকটী সুপণ্ডিত। এখন সাধারণে ঐখানে দেবীর উদ্দেশ্যে বলি ও পূজা প্রদান করেন এবং উহা এখন সিদ্ধপীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

প্রতি বৎসর ৺শারদীয়া পূজার সময় হাজারিবাগের সমস্ত বাঙ্গালী মিলিয়া চাঁদা করিয়া ৺দুর্গোৎসব করেন। বারোয়ারী তলায় ৺দশভুজার মূর্ত্তি আনিয়া সমারোহে দেবীর পূজা করা হয়। শুনিলাম, পূর্ব্বে ঐ বারোয়ারীতে যাত্রাদি হইত। ৫।৭ বৎসর হইল যাত্রাদি বন্ধ হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে এখন ঐ স্থানে ‘দরিদ্রনারায়ণের’ সেবা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে জনসাধারণ সকলেই ঐ উৎসবে যোগদান করিত। শুনিলাম, কোন কোন বিশিষ্ট বেহারী ও পদস্থ কর্ম্মচারীর প্ররোচনায় এখন দলাদলি হইয়াছে। ফলে বেহারীরা এখন স্বতন্ত্রভাবে ৺দশভুজার আর এক মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু সেখানে উৎসবের কোন আয়োজন দেখিলাম না।

সহরের উত্তর দিকে প্রায় ৪।৫ মাইল দূরে নৃসিংহস্থান নামে এক অতি মনোরম উদ্যান বা কুঞ্জবাটী আছে। পদব্রজে ঐ স্থান যাইতে হয়। পথে দুইটী নদী পড়ে। সেই নদী দুইটীর জন্যই গো যান বা অন্য কোন যানে তথায় যাওয়া যায় না। পথে নদী আছে শুনিয়া গামছা সঙ্গে লইয়া গেঞ্জি মাত্র পরিয়া নগ্নপদে চলিলাম। প্রথম নদীতে সাঁকো আছে। তখন সাঁকোর উপরে

১ ফুট মাত্র জল উঠিয়াছে, কিন্তু বেগ এত অধিক যে বিশেষ সাবধানতার সহিত পার হইতে হয়। দ্বিতীয় নদীতে সাঁকো নাই, নদীর জলও বেশী, এবং অপেক্ষাকৃত গভীর কিন্তু বেগ কম। নদীদ্বয়ের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল ৩।৪ মাস পরে শুষ্ক হইয়া যাইবে। যাহা হউক, প্রথম নদী পার হইয়া উত্তরমুখে খানিক দূর যাইয়া, এক স্থানে সামান্য পশ্চিম-মুখে বাকিয়া চলিতে চলিতে দ্বিতীয় নদীর নিকট আসিয়া পড়িলাম। স্থানে স্থানে প্রায় গলাজল ভাঙ্গিয়া পার হইয়া মাঠে পড়িলাম। দূর হইতে বৃক্ষাদিপূর্ণ সমতল ক্ষেত্রের শোভা দেখিয়া হৃদয় পুলকিত হইল। নদীর পরপারে একটা ছোট পাহাড়—তাহাতে আরও শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নৃসিংহস্থানে যখন পৌঁছিলাম, তখন মন্দিরের দ্বার বন্ধ হয় হয়। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সময়েই আসিয়া পড়িয়াছি মনে করিয়া স্বস্তি বোধ করিলাম। পাষাণ-বিগ্রহটী নাতিবৃহৎ। সেবক একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ—অতি অল্পেই তুষ্ট। তাঁহার মুখে শুনিলাম, উহা সিদ্ধ স্থান—দেবতা কল্পতরু—ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আরও শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, ঐ বিগ্রহটীও একজন বঙ্গদেশবাসী কর্তৃক স্থাপিত। সেবাভার পশ্চিমাঞ্চলের কোন ব্রাহ্মণবংশের উপর পড়ে। বর্ত্তমান সেবকটী আর অধিক কোন সংবাদ দিতে পারিলেন না, মাত্র বলিলেন যে বিগ্রহটী সহরের শ্রীশ্রীকালিকা দেবীর মূর্ত্তির সমসময়ে বা আরও পূর্ব্বে স্থাপিত।

বিগ্রহটী দক্ষিণাস্য। ইহার আশে পাশে অনেক পাথরের মূর্ত্তি। সবই একটী ছোট ঘরে স্থাপিত। মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। অনেকটা স্থান জুড়িয়া মন্দিরের সীমানা। এই সুন্দর স্থানটী তপস্যার বেশ উপযোগী বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সেখানে থাকিবার যে কোন বন্দোবস্ত আছে, তাহা বলিয়া বোধ হইল না। পাণ্ডার মুখে শুনিলাম, ঐ স্থানে রাত্রিবাসের কোন উপায় নাই। তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। ঐ স্থানে আমি আন্দাজ বেলা ১২টার সময় পৌঁছিয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় পাণ্ডাঠাকুর আমাকে প্রায় ১ মাইল পথ ঘুরিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। তাঁহার উপদেশমত পথে আসিয়া ছোট ছোট খানা টপ্‌কাইয়া যখন নদীর নিকট পড়িলাম, দেখিলাম সেখানে নদীর জল খুব কম, হাঁটু পর্য্যন্ত—তাহাও স্থানে স্থানে।

হাজারিবাগে দুইটী পুরাতন জাতির বাস—উঁরাও (Oraons) বা কোল এবং মুণ্ডা। উভয় জাতিই অতি সরল প্রকৃতি, সদাতুষ্ট, কঠোর পরিশ্রমী ও দৃঢ়কায়। ইহারা দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে কাতর নহে, অতি দীর্ঘ পথ হাঁটিতেও কুণ্ঠিত নহে। তবে ইহারা অতি দরিদ্র। পেট ভরিয়া অন্ন কাহারও জুটে কি না সন্দেহ। ইহারা চাঁদিনী রাত্রিতে আমোদপ্রমোদ করে ও নশা করিয়া নৃত্য গীত করিয়া মাদল বাজাইয়া আনন্দ প্রকাশ করে; তাহারা এই সব আনন্দে অপরের সহিত কখন মিলিত হয় না কিন্তু কাহারও কোন অনিষ্টও করে না। মুণ্ডারা শুনিয়াছি অপেক্ষাকৃত দুর্দ্ধর্ষ। ইহারা বীরত্বের আদর বিশেষভাবে করে। কোলেরা ধর্ম্মদেবতার পূজা করে—পার্ব্বতী বা সীতাদেবীর, মহাদেবের, দেবীগাইয়ার, চণ্ডী-দেবীর ও হনুমানের পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস তাহারা শ্রীরামচন্দ্রের কোন ভক্ত সৈন্যদলের বংশধর। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে অনার্য্য-জাতি বলেন।

"হরিবংশে লিখিত আছে, মহারাজা সগর অন্যান্য ক্ষত্রিয় জাতির সহিত 'কোলীসর্প' নামক এক জাতিকে আর্য্যসভ্যতার গণ্ডীর বাহিরে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেই অবধি তাহারা আর্য্যেতর জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহাদের কদাকারই ঐ দূরীকরণের হেতু। এই 'কোলীসর্প' জাতি 'কোল' বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা অনুমান হয়। উঁরাওগণ নিজেদের 'কুরুখ' বলে, যদিও এখন ইহাদের উঁরাও নামটাই বেশী প্রচলিত হইয়াছে। করুষ দেশ মগধের এক অংশ ছিল তাহা একপ্রকার নিশ্চিত। মহাভারতে করুষ দেশের ও করুষ-গণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই করুষদেশের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী ছিল, এবং তৎকর্তৃক নিহত হইয়াছিল। মনুতে

কারুষ বলিয়া এক জাতির উল্লেখ আছে, তাহারা ব্রাত্যবৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহাদিগকে 'কুরুখ' জাতির পূর্ব্বপুরুষ মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। উঁরাওগণ কৃষিকার্য্যকেই জীবনের অবলম্বন বলিয়া জানে।

'কুরুখ' বা উঁরাওগণের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, তাহারা প্রথমে বিহারে বাস করিত; তাহার পর তাহারা হিন্দুগণ কর্ত্তৃক বিহার হইতে বিতাড়িত হইয়া রোটাসগড়ে (রাহিতাশ্ব গড়) আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানেও তাহারা স্থায়ী হইতে পারে নাই; প্রবল মহ্যাসক্তিবশতঃ ইহারা এখান হইতেও বিতাড়িত হয়। রোটাস গড় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া তাহারা দলে দলে ছোটনাগপুরের জঙ্গলে প্রবেশ করে। সেখানে আসিয়া দেখে যে, সেই বন্য-প্রদেশ মুণ্ডা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। উঁরাওগণ মুণ্ডাদের অপেক্ষা অধিকতর সভ্য ছিল, ফলতঃ উঁরাওগণ অনায়াসে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া মুণ্ডাদিগকে আরও গভীর অরণ্যপ্রদেশে দূর করিয়া দিয়া নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করিল। এ স্বাধীনতাও তাহারা রাখিতে পারে নাই, কারণ, অচিরেই ইহারা ও অবশিষ্ট মুণ্ডারা ছোট-নাগপুরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।" *

বলা বাহুল্য, কোলেরা যখন ধর্ম্মদেবতার পূজা করে, তখন ইহা-দের মধ্যে যে বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ইহাদের মধ্যে তন্ত্রের প্রভাবও লক্ষিত হয়।

তিনটী প্রধান ধর্ম্মতরঙ্গ বঙ্গদেশকে প্লাবিত করে। বঙ্গদেশে যখন বৌদ্ধতরঙ্গ দেখা দেয়, তখন বাঙ্গালী দীপঙ্কর প্রমুখ মহাযান সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণ সমগ্র এসিয়ার গুরুস্থানীয় বলিয়া স্বীকৃত হন। তন্ত্রের উৎপত্তি ও বিস্তারের ইতিহাস এই বঙ্গদেশে ও তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী স্থানেই পাওয়া যায়। এমন কি শ্রীশ্রীকালিকার ককারাদি স্তোত্র প্রভৃতিতে বঙ্গ বর্ণমালারই পরিচয় প্রদান করে। এই তন্ত্রের প্রভাব জগতের সর্ব্ব ধর্ম্মসম্প্রদায়ে অনুপ্রবিষ্ট। মহাপ্রভু প্রচলিত

* মানসী ও মর্ম্মবাণী—অগ্রহায়ণ, ১৩২৩।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা এখানে বলা অত্যুক্তিমাত্র। উক্ত তিন প্রকার প্রভাবই হাজারিবাগে লক্ষিত হয়। কোলদের 'চাণ্ডী' বা চণ্ডীদেবীর পূজাই তন্ত্রপ্রভাবের পরিচায়ক।

একদিন শুনিলাম যে, প্রায় ৪৮ মাইল দূরে হাজারিবাগ অঞ্চলের একপ্রান্তে রাজরপ্পা নামে এক দুর্গম স্থান আছে। সেখানে দেবী ছিন্নমস্তার পূজা হয় সে স্থানটী সেখানকার তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। অপর প্রান্তে হুডরু নামক স্থানে ঐ দেবীর ভৈরব—শ্রীশিব অবস্থিত। হুডরুতে যে বিখ্যাত জলপ্রপাত আছে, সেই প্রপাতের উপরেই দেবদেবের স্থান। হুডরু হাজারিবাগের শেষ সীমা তাহার পর হইতে রাঁচি জেলা আরম্ভ হইয়াছে।

ছিন্নমস্তা দেবীর কথা শুনিয়া সেখানে যাইবার ইচ্ছা হইল এবং ঘটনাক্রমে সুবিধাও হইয়া গেল। জনৈক আত্মীয়ের বিশেষ প্রয়োজনে চিতোরপুর যাওয়া স্থির হইল। চিতোরপুর রাজ-রপ্পা হইতে ৭।৮ মাইল দূরে অবস্থিত। আমি এ সুযোগ ছাড়িলাম না। আত্মীয়ের মোটরে চিতোরপুর পৌঁছিলাম। তিনি সেই দিনই আবার সহরে ফিরিলেন। ফিরিবার সময় একজন স্থানীয় লোকের বাড়ীতে আমার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন। সে লোকটীর সহরে যাতায়াত আছে। লোকটী বিনয়ী।

চিতোরপুর ছোট গ্রাম। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মিশনরীদের দাতব্য ঔষধালয় ও হাঁসপাতাল আছে। গ্রামে একটী স্কুলও আছে। গ্রামের অধিবাসী অধিকাংশ কোল। অন্যান্য জাতিও আছে। মুসলমানের সংখ্যাও কম নহে। খৃশ্চান কোলও আছে। হাজারিবাগ হইতে এ স্থানের উচ্চতা কম বলিয়া বোধ হইল। চিতোরপুর আসিতে পথে রাঁচি রোড্ ফেলিয়া ভেড়া নদী পার হইয়া রামগড় নামক গ্রাম হইয়া আসিতে হয়। এখানকার দৃশ্য বড়ই মনোহর।

যাঁহার অতিথি হইলাম সেই লোকটীকে কোল বলিয়াই মনে হইল। তাঁহার কুটীরের বহির্ভাগে বেড়া দেওয়া স্থানে বাত্রিবাসের মত স্থান করিয়া লওয়া হইল। আমাকে দেখিবার জন্য বহু কোলের

সমাগম হইল। হিন্দিকথা তাহারা বেশ বুঝিতে পারে ও বুঝাইবার মত বলিতেও পারে। সরল শিশুর মত ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের অকপট হৃদয়ের পরিচয় পাইলাম। আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করায় তাহারা খুব উৎসাহ দিল, তবে বলিল সে স্থানে যাইতে হইলে প্রাতে যাওয়াই ভাল। বৈকালে যাইলে ফিরিবার সময় রাত্রি হইতে পারে। রাত্রিতে সে পথ নিরাপদ নহে। কোলেরা সকলেই অতিথিবৎসল।

সেই কোল ভদ্রলোকটীর অনুগ্রহে আমি তাঁহাদেরই প্রস্তুত অন্ন, ডাল ও রুটীর দুই দিন ধরিয়া সদ্ব্যবহার করিলাম। দরিদ্র কোলেরা অন্ন কেবল মাত্র লবণ দিয়া আহার করে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন কোলেরা ডাল ও সামান্য তরকারী ব্যবহার করে। অন্নই উহাদের প্রধান খাদ্য। যে সব কোল সহরের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া সামান্য সামান্য ব্যবসায় করে, তাহারাই কখন কখন রুটীও খায়।

কোল ব্যবসায়ীরা কখন ঠকায় না। কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত মূল্য দিলে তখনই ফেরৎ দেয়, এক কথায় দর ঠিক হইয়া যায়।

পাহাড়ের রাস্তায় পদব্রজে যাওয়া কষ্টকর। সুতরাং যানের চেষ্টা করিতে হইল। কোলদের সাহায্যে এক অশ্ব মিলিল। যাহার অশ্ব সেও সঙ্গে যাইবে স্থির হইল। এখানে বলিয়া রাখি যে চিতোরপুর হইতে দেবী দর্শনে যাইতে হইলে যান যোগাড় করা দরকার। নতুবা পথে অত্যন্ত কষ্টের সম্ভাবনা। ২০ বা ২॥০ টাকা দিলেই ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়।

যে ঘোড়া আমি পাইলাম সে অনেকবার বাজরপ্পার পথে যাতায়াত করিয়াছে। ঘোড়াটীও সেখানকার মধ্যে বেশ দ্রুতগামী।

তৃতীয় দিনের প্রাতে, অরুণোদয়ের পরেই, জিনশূন্য অশ্বপৃষ্ঠে কম্বলাসন পাতিয়া দড়ি দিয়া বাঁধা রেকাবিযুক্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া রাস্তা দিয়া বরাবর উত্তরমুখে চলিলাম। পাকা স্কুলবাটী পার হইয়া মাঠে পড়িলাম। ঘোড়া ছুটাইলাম, ঘোড়ার মালিক পিছাইয়া পড়িল। অল্পদূর যাইতে উচ্চ ভূমিতে ক্রমশঃ উঠিতে লাগিলাম—মাঠের আগে

পাশে দূরে দুটী একটী গ্রাম দেখা যাইতে লাগিল। ছোট ছোট জঙ্গলও নয়নগোচর হইল। তাহার পর পাহাড়ে চড়াই আরম্ভ হইল। এখানে অশ্বটীর প্রভুর সাহায্য আবশ্যক মনে করিলাম। ঘোড়া থামাইয়া স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিয়া বড়ই আরাম বোধ করিলাম। অশ্বের প্রভুটী আসিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিল যে ঘোড়া ঠিক যাইবে, উদ্বিগ্ন হইবার কোন দরকার নাই—তবে ধীরে ধীরে যাইলে ভাল হয়।

পাহাড়টী অনেকটা কুর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায়, আস্তে আস্তে চড়াই আরম্ভ হইয়াছে। অতি সন্তর্পণে পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। সুখের বিষয়, খড্ হইতে অনেক দূরে পাহাড়ের পথ—নতুবা অশ্বগুলির খড়ের ধার দিয়া চলিবার বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। পথ ক্রমশঃ বন্ধুর হইতে লাগিল। অরণ্যও ঘোরতর হইতে আরম্ভ করিল। মাঝে মাঝে আবার দু একস্থানে বৃক্ষলতাদিবিহীন পাথরের উপর দিয়া যাইতে হইল। এখানে পাশে জঙ্গল কম। অল্পদূর যাইয়া পথ ভাল বোধ হইল। ঘোড়া ছুটাইলাম। ঘোড়া সাবধানে দৌড়িল। পর্ব্বতের খুব উচ্চ স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া মনে হইল। দূরে নিম্নভূমি দৃষ্ট হইল। সেখানকার পর্ব্বতমালাও ছোট ছোট বোধ হইতে লাগিল। বড় বড় বৃক্ষও যেন পর্ব্বতগাত্রে ঘাসবনের মত মনে হইল। শালবনে পরিপূর্ণ নিম্নভূমি কি সুন্দর! যাঁহারা গিরিডি গিয়াছেন তাঁহারা এ দৃশ্য বুঝিবেন। গিরিডির পথে রেল হইতে যে সকল শালবন দেখা যায়, ইহা তাহা অপেক্ষাও বড়, দিগন্ত বিস্তৃত ও মুগ্ধকর। কি সুন্দর দৃশ্য! মানব মাত্রেরই হৃদয় বহির্জ্জগতের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া থাকে, কিন্তু যে সুন্দরের কণামাত্রের প্রকাশে বাহিরের এই সৌন্দর্য্য তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শনে না জানি উহা কতদূর মুগ্ধ হয়!

অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অল্প সময়েই ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই দুর্গম স্থানেও মধ্যে মধ্যে দু একজন দরিদ্র, ছিন্ন বস্ত্র কাঠুরিয়া দেখিতে পাইলাম। বন নিবিড়-তর হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে পথ দেখা যায় না। গাছে গাছে পথরোধ হইয়াছে। ডাল ভাঙ্গিয়া বা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া

যাইতে হয়। অন্ধকার বন, দূরে স্থানে স্থানে স্থির সৌদামিনীর ন্যায় সূর্য্যরশ্মি বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া চোরের মত ভূমিতে অবতরণ করিয়াছে। কিরণে বৃক্ষপত্রসমূহের উপরিভাগ যেন জ্যোতির্ম্ময় বোধ হইতে লাগিল—সেই জ্যোতি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া উর্দ্ধে চলিয়াছে। এই সামান্য আলোকই এ পথে পথিকের একমাত্র সহায়। পথের একমাত্র সঙ্গী অশ্বের প্রভুর আর সন্ধান পাইলাম না। পরে জানিলাম, সে পথিমধ্যে কোন কাঠুরিয়ার নিকট বসিয়া তামাকু সেবন করিয়া স্বানন্দচিত্তে বিশ্রামলাভ করিতেছিল। সঙ্গীহারা হইলেও উপায় নাই। সুতরাং অশ্বপৃষ্ঠে চলিতে লাগিলাম। ঘোর অন্ধকারে ঘোড়া মাঝে মাঝে থমকাইয়া আবার ধীর মন্থর গতিতে সাবধানে পা ফেলিযা চলিতে আরম্ভ করিল। ঘনান্ধকার অরণ্যের নীরব নির্জ্জনতায় ঝিল্লিরবের মত শব্দ শ্রবণে হৃদয় স্তব্ধ হইয়া যায়। বাহিরের এই স্বল্প স্তব্ধতাতেই মানব হৃদয গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হয়—না জানি সমাধিপথে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইলে যে অচঞ্চল ধীর স্থির সত্বার বোধ হইয়া থাকে তাহার অনুভবে ঐ ভাব কত অধিক পরিমাণে আনয়ন করে! কিছু দূর যাইতেই জঙ্গল পাতলা হইল সূর্য্যালোক দেখা যাইতে লাগিল। এতক্ষণে একস্থানে উৎরাই করিতে হইল। পাথর কাটিয়া ধাপের মত করা আছে দেখিলাম। ঘোড়া হইতে নামিয়া বিশ্রাম করিতে বসিলাম। এইবার পিছন হইতে সঙ্গিটীর ডাক্ শুনিলাম, আমি সাড়া দিলাম। সঙ্গিটী আসিলে পথে ঘোড়ার পিঠে থাকিয়া গল্প করিতে করিতে চলিলাম সঙ্গিটীর পিঠে কাপড়ে বাঁধা জবা, বিল্ব, চিনি ঠিক্ আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে দেবীর জিনিষ তাহারা অতি সাবধানে ও ভয়ে রক্ষা করে। তাহার কাছে শুনিলাম, যে এবার বর্ষা অধিক দিন স্থায়ী হওয়ায় জঙ্গল এত ঘন হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ ঐ সময় কাঠুরিয়ারা পর্য্যন্ত কাজ করিতে পারে নাই। সে আরও বলিল যে, এই বিগত ৺শারদীয়া পূজার সময় বা পূর্ব্বেই জঙ্গল যথাসাধ্য কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছিল।

তবে এ পথ দিয়া লোক বড় যাতায়াত করে না। সকল বৎসর এ পথ সাফও হয় না! দেবী স্থানে যাইবার আরও দুইটী পথ আছে। একটী এই অরণ্যের পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। অপরটী গোযানের পথ—বহু মাইল ঘুরিয়া দেবীস্থানে পড়িয়াছে। প্রতি বৎসর ৺শারদীয়া পূজার নবমীর দিনে দেবীস্থানে মেলা হয়। তখন শত সহস্র লোক ঐ দুই পথ দিয়াই যাতায়াত করে। অতি অল্প লোকেই বনের পথে যায়। এবার নবমীর দিন দেবীর নিকট শত শত বলি পড়িয়াছে। এই প্রকার নানা গল্প করিতে করিতে চলিলাম। আবার দু একস্থানে ঐরূপ উৎরাই করিতে হইল। এইবার একটী জলা পার হইলাম। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে দূর হইতে সমুদ্রগর্জ্জনবৎ একটানা শব্দ শুনিতে পাইলাম। অতি উৎফুল্ল হইয়া সঙ্গীটী বলিল যে উহা দেবীস্থানের নদীসঙ্গমের শব্দ। অশ্বটীকে একটু দ্রুত চালনা করিলাম। জলা জঙ্গল ভেদ করিয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিলাম। কি চমৎকার, কি চিত্তরঞ্জন ছবি! দুই নদীর প্রায় সঙ্গমস্থলে দেবীর মন্দির। একটী নদী—নাম ভেড়া নদী—পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ছুটিতেছে। ভেড়া নদীর অপর পারেই উচ্চ পাহাড়—ঘন বনরাজি পর্ব্বতের অঙ্গশোভা বর্দ্ধিত করিয়াছে। খরস্রোতা নদী ছুটিয়া আসিতেছে। জলের নীচে ও উপরের উপলখণ্ডে ধাক্কা লাগিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, আবর্ত্ত কাটিয়া, ফেনা তুলিয়া, আছাড় পিছাড় খাইয়া নদী ছুটিতেছে। একস্থান অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। সেই স্থানের উপরেই মন্দির। মন্দিরের পশ্চিমদিকে আর একটী নদী প্রবাহিতা—নাম দামোদর। দামোদর অনেক নীচে দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়া দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে অতি ভীষণবেগে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া ঘূর্ণীপাক খাইয়া সফেন—যেন শত শত ফণা বিস্তার করিতে করিতে হলাহল উদ্গীরণ করিয়া ধাবমানা! দামোদর, ভেড়া নদী অপেক্ষা প্রায় ৩০।৪০ ফুট নিম্নে প্রবাহিতা। ভেড়া নদী যে স্থানে আসিয়া দামোদরের সহিত সংযুক্তা হইয়াছে, সে স্থানের পাথর একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং

ছোটখাট জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। সমগ্র নদী সূর্য্যালোকে দীপ্ত। হর্ হর্ শব্দে জল আসিয়া দামোদরে পড়িতেছে সে শব্দের বিরাম নাই—তাহারই রবে দিগন্ত মুখরিত। সাগরগর্জ্জনবৎ ঐ রবই দূর হইতে সকলের হৃদয়ে এই স্থানের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব অনুভব করাইয়া দেয়। আর এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী—মহাশক্তিরূপে বিশ্বের ভিতরে ও বাহিরে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমানা জীবকল্যাণকারিনী ভীমা ছিন্নমস্তা !!

সেই অরণ্যের দিকে একবার চাহিলাম। সেই আঁধারভাব—ঘন-বৃক্ষছায়ায় যেন কি এক কুহক রচনা করিয়াছে ! দূরে—আরও দূরে ঘোর অন্ধকার—দৃষ্টিপথ রুদ্ধ—যেন এক মহা তমসা আর এক কেন্দ্রী-ভূত তমসার রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে !! আঁধারে জন্ম, আঁধারে লয়, তবু তাহাতে হৃদয় আলোড়িত। কৈ বনবিহারী শ্বাপদকুলের নিকট ত মানবদৃষ্টির গোচরীভূত অন্ধকার নাই ? কি ইন্দ্রিয়ের ছলনা ? কি মোহ ! বাসনার অতৃপ্ত ফলে ইন্দ্রিয়ের বিকাশ—জগতের প্রকাশ। বিলাস লালসার অদম্য তাড়নায় দেহে আত্মবোধ, বিশ্বে ভালবাসা, মহামায়ার এ কি মায়া !! এরূপ নির্জ্জন, রুদ্র গম্ভীর-ভাবময় স্থানে কি মানুষ নিজের মোহ বুঝিতে পারে, সর্ব্বলোকপ্রভু বিশ্বসত্তার দিকে কি দৃষ্টি ফিরাইতে পারে? মোহমুগ্ধ মানব কি এইরূপ বিবিক্ত দেশে স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিয়া গর্ব্বিত শির নত করিতে শিখে, এবং স্বরুধিরপায়িনী সর্ব্বশক্তিময়ী জগজ্জননী কি এইরূপ স্থানেই আবির্ভূতা হইয়া অহেতুক করুণায় নিজ সন্তানের অনন্ত বাসনা সংস্কাররূপ মস্তকসমূহ ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে নূতন জীবন, নূতন দৃষ্টি প্রদান করেন ? বিক্ষিপ্তচিত্ত ভ্রান্ত সন্তান কি আপন মাকে এইরূপে চিনিতে পারে ?

বৃক্ষতলে বহুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। পরে উঠিয়া ভেড়া নদীতে স্নান করিলাম। দামোদরের কথা ত দূরে, প্রপাতের নিকটও যাইবার কোন উপায় নাই। দেবীর মন্দির পাকা ও ছোট, উচ্চ-তাও বেশী নহে। মন্দিরের চারিদিক বাধান—চারিদিকেই বসিবার ও প্রদক্ষিণ করিবার বেশ প্রশস্ত চত্বর। মন্দির দেখিয়া বড় পুরাতন বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু এই পাকা চত্বরটী খুব বেশী দিনের বলিয়া

মনে হয় না। দেবীর ও তাঁহার পার্শ্বের দুইটী মূর্ত্তি সমস্তই প্রস্তরময়ী। বেলে পাথর বা কতকটা চূণার পাথরের মত বলিয়া অনুমান হয়। পাষাণে কালের প্রভাব পরিস্ফুট মূর্ত্তিগুলির স্থানে স্থানে পোকায় কাটা ছিদ্রের মত ও এক আধ স্থানে সামান্য চটা উঠার মত দেখিলাম।

দেবী ও তাঁহার সহচরীদ্বয় দক্ষিণাস্যা। তিনজন সেবক দেখিলাম। তিনজনেই বাঙ্গালী। দীর্ঘ প্রবাসে তাঁহাদের চেহারার যে পরিবর্ত্তন হয় নাই তাহা নহে। তাঁহাদের একজনের নিকট শুনিলাম, দেবী বহু পুরাতন কতদিনের বা কত শত বৎসরের তাহা কেহ জানে না। ঐ মূর্ত্তি ঐ স্থানেই পূর্ব্বে ছিল। ঐ স্থান কোন সময়ে বহু বাঙ্গালী তান্ত্রিক সাধকের সাধনার স্থান ছিল। প্রবাদ, অনেকে এই গুপ্ত স্থানে আসিয়া সিদ্ধ হন। এইরূপে এই ভাবে কত বৎসর বা কত পুরুষ চলিয়া আসিতেছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। পরে, তাঁহাদেরই একজন পূর্ব্বপুরুষ—ঐ স্থানে সিদ্ধ হইয়া ঐ দেশের জমিদার বা রাজার নিকট যাইয়া দেবীর জন্য পাকা মন্দির প্রস্তুত করাইবার জন্য প্রার্থনা করেন। রাজা স্বীয় ব্যয়ে মন্দির করিয়া দেন ও ঐ স্থানের নাম সেই অবধি রাজরপ্পা বা রাজরপ্প হয়। তিনি মন্দিরের জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হন, কিন্তু নিজের জন্য কিছুই চাহেন নাই। ঐখানে থাকিয়া তিনি স্বয়ংই দেবী পূজার ভার গ্রহণ করেন। মাঝে মাঝে যখন তিনি পরিবারাদি দেখিবার জন্য বঙ্গদেশে আসিতে লাগিলেন, তখন দেবীর নিত্যপূজার অসুবিধা হইতে লাগিল। সুতরাং রাজা তাঁহাকে ও তাঁহার আদানপ্রদানোপযোগী কয়েক ঘর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আনাইয়া সকলকে ঐ ভেড়া নদীর পর পারের পর্ব্বত হইতে ক্রোশাধিক দূরে তাঁহাদের সকলের জন্য যথেষ্ট বাসের ও চাষের উপযোগী জমি প্রদান করেন। ইহা ১৬৩০ সম্বতের কথা। এখন তাঁহারা রাজা পদম্ (পদ্ম) সিংহের অধীনে। সেই কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বের বাঙ্গালী ভক্তবীরদিগের অধ্যবসায় ও নির্ভীকতার পরিচয় পাইয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম।

দেবীর সেবকগণ অতি নম্রপ্রকৃতিবিশিষ্ট, সরল ও নির্লোভী।

তাঁহারা প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পর বেলা হইলে আপন আপন গ্রাম হইতে বাহির হইয়া পাহাড় ভাঙ্গিয়া নদী হাঁটিয়া বা সন্তরণে পার হইয়া দেবীর মন্দিরের দ্বার খোলেন। দিনে দিনে পূজাদি সারিয়া গৃহে ফিরিয়া যান। সন্ধ্যা পর্য্যন্তও ঐ স্থানে থাকা অসম্ভব—কেহ কখন থাকে নাই। রাজরপ্পার জঙ্গল ব্যাঘ্রভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ, তাই মন্দিরের কোন স্থানে থাকিবার কোন আয়োজন নাই। তবে ভেড়া নদী পার হইয়া সেবকগণের বাড়ীতে থাকা চলে।

দেবী ও তাঁহার সহচরীদ্বয়ের মূর্ত্তিগুলি সবই ছোট ছোট অর্থাৎ উচ্চতায় আন্দাজ ২ হাত হইবে। সংস্কারবশতঃ আমরা দেবীর রুধিরের ধারা দেখিবার আশা করি। কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন দেখিলাম না। গলা হইতে পাথরের তিনটী ধারা গড়িয়া তাহাতে সিন্দুর লেপিয়া রাখিলেই যেন মূর্ত্তিটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত।

পূজাদি দর্শন, মন্দির প্রদক্ষিণ, প্রসাদ ধারণ করিয়া আবার সেই গাছতলায় ঘোড়ার পিঠের কম্বল পাতিয়া বসিলাম। সেই দিন কোন বেহারী ভক্ত দেবীর জন্য বলি আনিয়াছিলেন। পূজা-সমাপনান্তে তিনি দেবীর মন্দিরে বসিয়া স্তোত্র গান করিলেন। কি মধুর কণ্ঠ! গান যেন এখনও কাণে লাগিয়া আছে। বেলা একটার সময় সেই পূর্ব্ব পথে, ধীরে ধীরে কুটীরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

প্রাদেশিক সম্মিলনে "বাঙ্গালার কথা"।

(ভারতের-সাধনার লেখক)

(পূর্ব্বালোচনার পর)

পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি, সভাপতির অভিভাষণের মূল কথা প্রকৃত দেশের কাজের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করা। আমরা এতকাল পলিটিক্স পড়িয়াছি ও পলিটিক্স করিতে গিয়াছি, দেশের কাজ ভাল করিয়া বুঝিও নাই করিতেও যাই নাই। এই বিষয়

সভাপতি মহাশয়ের কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া এবারকার বক্তব্য আরম্ভ করিব :—

'আমাদের অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। কিন্তু আমাদের সব চেয়ে বেশী বিপদ যে আমরা ক্রমশঃই আমাদের শিক্ষাদীক্ষা-আচার-ব্যবহারে অনেকটা ইংরাজীভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। রাজনীতি বা politics শব্দটী শুনিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একেবারে অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া পঁহুছায়। ইংরাজের ইতিহাসে এই রাজনীতি যে আকার ধারণ করিয়াছে আমরা সেই মূর্ত্তিরই অর্চ্চনা করিয়া থাকি। বিলাতের জিনিষটা আমরা যেন একেবারে তুলিয়া আনিয়া এই দেশে লাগাইয়া দিতে পারিলে বাঁচি। এ দেশের মাটিতে তাহা বাড়িবে কি না, তাহা ত একবারও ভাবি না। Burke এর বুলি যাহা স্কুল কলেজে মুখস্থ করিয়াছিলাম, তাহাই আওড়াই। Gladstone এর কথামৃত পান করি, আর মনে করি ইহাই রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম। Seely র Expansion of England নামে যে পুস্তক আছে, তাহা হইতে বাছা বাছা বচন উদ্ধার করি। Sidgwick এর কেতাব হইতে কথার ঝুঁড়ি টানিয়া বাহির করি, ফরাসী স্কুল, জার্ম্মাণ স্কুল এবং ইউরোপে রাজনীতির যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাবে কোথায় যত ধারাল বাক্য আছে, একেবারে এক নিশ্বাসে মুখস্থ করিয়া ফেলি, আর মনে করি এইবার আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অজেয় হইলাম, দেখি আমাদের শাসনকর্ত্তারা কেমন করিয়া আমাদের তর্ক খণ্ডন করেন। মনে করি রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্কবিতর্কের বিষয় বক্তৃতার ব্যাপার মাত্র। আমরা বক্তৃতা করিয়া, তর্ক করিয়া জিতিয়া যাইব। আমাদের সকল উদ্যম ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধারকরা কথার ভার চাপাইয়া দিই। যাহা স্বভাবতঃ সহজ সরল তাহাকে মিছামিছি বিনা কারণে জটিল করিয়া তুলি। শুধু যাহা আবশ্যক তাহা করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাই না, বাঙ্গালার কথা, বাঙ্গালীর কথা ভাবি না, আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে

সর্ব্বতোভাবে তুচ্ছ করি। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে একেবারেই দৃক্‌পাত করি না। কাজেই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই, এই কথা হয় ত অনেকে স্বীকার করিবেন না।"

আমাদের দেশে বিলাতী পলিটিক্সের আমদানী করিয়া যে বিভ্রাট আমরা ঘটাইয়া তুলিয়াছি, সে সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে। প্রথমেই আমাদের বিবেচনা করা উচিৎ ছিল, আমাদের দেশে সনাতন একটা কিছু পলিটিক্স আছে কি না। কিন্তু সে বিবেচনার অবসর হয় নাই। আমরা ইংরাজী পড়িয়া জীবনের যত বিভাগে "স্বদেশী" ছাড়িয়া "বিদেশী"-র আমদানী করিয়াছি, তন্মধ্যে এই রাজনৈতিক বিভাগের কথা এত কাল চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। আজ বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে বাঙ্গালার প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতিমহাশয় নিজেই স্বদেশী পলিটিক্সের কথা তুলিয়াছেন।

একটা স্বদেশী পলিটিক্স কি আমাদের দেশে একেবারেই ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। সম্পূর্ণ পলিটিক্স বিহীন হইয়া একটা দেশ কি এতকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে? আর সে ত যে সে বাঁচা নয়? জগতে আর কোনও দেশ এমন বিষম ঘটনা বিপর্য্যয়ের মধ্যে এতকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে? নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, যে পলিটিক্সের ভিত্তির উপর আমাদের দেশ এতকাল বাঁচিয়া ছিল, সে ভিত্তির দৃঢ়তা অতি অসাধারণ, নিতান্তই আশ্চর্য্য। এ হেন স্বদেশী পলিটিক্স যে কি ছিল, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না, আমরাই আবার দেশ উদ্ধার করিতে যাই, দুর্দ্দৈব!!

দেশের স্বচ্ছল গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা সমস্ত পলিটিক্সের কেন্দ্র-স্থানীয় ব্যাপার। এই মূলের ব্যবস্থা আগে নিষ্কণ্টক হইলে, তবেই একটা দেশের পলিটিক্স আর্থিক বা মানসিক উন্নতিরূপ নব নব উদ্যমে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। সুতরাং আমাদের স্বদেশী পলিটিক্স কি ছিল, ইহার সন্ধান লইতে হইলে দেখিতে হইবে যে আমাদের দেশে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা কি ছিল।

সব দেশেই পলিটিক্স এই গ্রাসাচ্ছাদনের এক একটা পাকা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলে, কিন্তু সব দেশেই যে সে ব্যবস্থা একই রকমের হইবে এমন কোনও কথা নাই। পাশ্চাত্য পলিটিক্সে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার ব্যবস্থাপক হইলেন ষ্টেট্ বা রাজশক্তি। সেখানে রাজ-সরকার চাষাকে চাষ করায়, তাঁতিকে তাঁত বুনায়, কারিগর ও ব্যবসায়ীকে নিজ নিজ ব্যবসায়ে নিয়োজিত রাখে। সেখানে চাষার ক্ষেতের কথা, তাঁতির তাঁতের কথা কারিগরের যন্ত্রাদির কথা, ব্যবসায়ীর ব্যবসার কথা রাজসরকারের মাথায় রাত দিন ঘুরিতেছে, এবং পদে পদে তাহাদের যে সব খুঁটিনাটির দরকার, সে সমস্ত রাজসরকার আইন কানুন করিয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছে। দৈবাৎ যদি পাশ্চাত্যের রাজসরকার চক্ষু উল্‌টাইলেন, তবে সমস্ত দেশের কাজে, গ্রাসাচ্ছাদনমূলক সমস্ত ব্যাপারে এক বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হইল। রাজশক্তি অনাময় না থাকিলেই পাশ্চাত্যের প্রজাজীবন বিঘ্ন ও অনিশ্চয়তার লীলাভূমি হইয়া উঠে। এইভাবে দেখা যাইতেছে যে পাশ্চাত্য পলিটিক্সের মর্ম্মস্থান রাজসরকারের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। আমাদের স্বদেশী পলিটিক্সের যদি এইরূপ প্রকৃতি হইত, তবে এ দেশে হাজার হাজার রাজরাজড়ার উত্থানপতন ও ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও দেশের প্রজা এতকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। এতকাল যে তাহারা নিঃশব্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছে ও দেশ এবং দেশের বড় বড় আদর্শকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তাহার প্রধান কারণ এই যে আমাদের স্বদেশী পলিটিক্সের মর্ম্মস্থান রাজ-সরকারে বা রাজধর্ম্মে কখনও নিহিত ছিল না, নিহিত ছিল প্রজা-ধর্ম্মে। রাজার নিয়োগে, রাজার প্রেরণায়, দেশের প্রজা আমাদের দেশের গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত এতকাল চালায় নাই। সে বন্দোবস্ত এতকাল নির্ভর করিয়াছে প্রজার ধর্ম্মবুদ্ধির উপর, প্রজাধর্ম্মের উপর। বহু পুরাকাল হইতে আমাদের দেশে কিরূপে এই অদ্ভুত প্রজাধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছিল, কিরূপে আপনার মহিমায় এতকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার একটা ইতিহাসের আলোচনা করা এ স্থানে সম্ভব

পর নহে। অবসর ঘটে ত পরে সে কথার আলোচনা করিব। কিন্তু এই প্রজাধর্ম্মের মহিমার উপর যে আমাদের স্বদেশী পলিটিক্স প্রতিষ্ঠিত এবং রাজধর্ম্মের মহিমার উপর পাশ্চাত্য পলিটিক্স প্রতিষ্ঠিত, এই মূল তত্ত্বটী হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের শিক্ষিত সমাজের পক্ষে আজ নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের স্বদেশী পলিটিক্সে রাজধর্ম্মের যে একটা স্থান নাই, সে কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু সে স্থান আমাদের পলিটিক্সের মধ্যস্থান নহে, আমাদের দেশের মরণকাটি বাচনকাটি সে স্থানে রক্ষিত হয় নাই। আমাদের দেশে রাজা যদি তাহার রাজধর্ম্ম পালন না করেন, তবে কালে প্রজাধর্ম্মে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়, —এই পর্য্যন্ত। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে মারাত্মক বিঘ্নগুলির নিরাসন করিবার জন্য প্রজাধর্ম্ম আপনাকে সম্প্রসারিত করিয়াছে, গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ নানারকম ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে। আসল কথা এই যে, আমাদের দেশের পলিটিক্সের জীবনকেন্দ্র প্রজারা চিরকালই নিজের হাতে রাখিয়া আসিয়াছে। প্রজাধর্ম্মের এই আত্মনির্ভরের ভিত্তি আর কোনও দেশের পলিটিক্সে দেখা যায় না। এমন কি আধুনিক পাশ্চাত্য দেশে প্রজারা যে আত্মনির্ভর প্রকাশ করে, সে আত্মনির্ভরের উদ্দেশ্য রাজার রাজধর্ম্মকে আত্মসাৎ করা, রাজধর্ম্মটা আগেই আশ্রয় না করিলে সে সব দেশের প্রজা প্রজাধর্ম্মের স্থিতি ও উৎকর্ষ সংসাধিত করিতে পারে না। কিন্তু ভারতের প্রজা রাজধর্ম্মকে আশ্রয় বা আত্মসাৎ না করিয়াও আপনাদের সনাতন প্রজাধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। এইখানেই তাহার বিশেষত্ব। পাশ্চাত্যে রাজশক্তির কল্যাণে প্রজাধর্ম্ম বাঁচে, ভারতে আপনার কল্যাণেই প্রজাধর্ম্ম আপনি বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

ভারতীয় পলিটিক্স ও পাশ্চাত্য পলিটিক্সের প্রকৃতিতে ত এই প্রভেদ আছেই, তা'ছাড়া আদর্শেও আকাশপাতাল প্রভেদ আছে। পাশ্চাত্য পলিটিক্সের আদর্শ ঐহিক প্রতিপত্তিকে ক্রমশঃ গগণস্পর্শী করিয়া তোলা, ভারতীয় পলিটিক্সের আদর্শ ঐহিক প্রতিপত্তিকে আধ্যাত্মিক

প্রতিষ্ঠার উপর মাথাতুলিতে না দেওয়া। প্রজাশক্তির প্রযোগে ঐহিক প্রতিপত্তিকে যে দেশ যতই বাড়াইতে চাহিবে, সে ততই বাড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা একটা অবিসম্বাদী সত্য যে ঐহিক ঐশ্বর্য্যকে যদি স্বেচ্ছামত বাড়তে দেওয়া হয় তবে দেশের আধ্যাত্মিক সম্পদ অনিবার্য্যরূপে খর্ব্ব হইতে থাকে। কাঞ্চন দেবতার স্বভাবই যে এইরূপ তাহা আধুনিক দেশসমূহ যতদূর হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে ক্রমশঃ দেখিবার বিষয় বটে, কিন্তু ভারতীয় সমাজস্রষ্টারা ঐ সত্য বহুকাল পূর্ব্বেই অভিজ্ঞতার দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য যে আদর্শের পথে অগ্রসর হইতে দিলে ভারতীয় প্রজাশক্তির হৃদয়ে ঐহিক সমৃদ্ধির অনুসরণে মাদকতা সঞ্চারিত হইবে, সেইরূপ পলিটিক্সের পথে তাঁহারা দেশের প্রজাধর্ম্মকে দাঁড় করাইয়া যান নাই। কাজে কাজেই ভারতীয় পলিটিক্সের মধ্যে ঐহিক সম্পদ ও শক্তির কোনও উচ্চাশাবীজ নিহিত নাই। এ আশা ভারতীয় প্রজা এখনও পোষণ করিতে শিখে নাই যে একদিন তাহারা রাজশক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া এমন রাজৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে যে অপরাপর দেশের রাজৈশ্বর্য্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একটা গৌরবময় স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু এ রকম একটা রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিবার আশা এ দেশের প্রজাসাধারণের মনে না থাকিলেও আর একরকম একটা বৈশিষ্ট্য এ জগতে লাভ করিবার জন্য ও প্রকাশ করিবার জন্য বহু প্রাচীন কাল হইতেই তাহারা যেন যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া বাঁচিয়া আছে। পরমার্থ সাধনার ক্ষেত্রেই সেই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ও পর্য্যবসান। কোনওরূপ রাজনৈতিক বিশেষত্ব যে এ বিশেষত্বের চেয়ে শ্লাঘনীয় নহে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতের এই জাতীয় লক্ষ্যের ধারণা যতই আমাদের হৃদয়ে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, ততই আমরা বুঝিতে পারিব, ভারতীয় পলিটিক্সের আদর্শ কিরূপ এবং কেনই বা উহা ঐরূপ। জগতে ধর্ম্মের মহান্ আদর্শ সংরক্ষণ ও প্রচার করা যাহার জীবনব্রত,

ঘোর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে নামিয়া সাধারণ রেষারেষিতে যোগদান করা তাহার শোভা পায় না, তাহার স্বধর্ম্মানুকূলও নহে। সমগ্র মানবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ও আনুকূল্যে জাতীয় জীবন গঠন করা কিরূপে হইতে পারে,—যাহাকে এ শিক্ষা জগতে প্রচার করিতে হইবে, তাহার পক্ষে আধুনিক ভ্রান্ত-জাতীয়তা-মূলক রাজনীতির আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিবেশে অবতীর্ণ হওয়া শুধু বিসদৃশ নহে, অসম্ভব। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়"। শুধু ফাঁকা মুখের কথায় যদি জগতে উচ্চ নৈতিক বা আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রচার করা চলিত, তবে আধুনিক পাশ্চাত্য নেশনদের সে সম্বন্ধে কোনও ত্রুটি ছিল না!

যদি আপত্তি উঠে যে আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার আসরে না নামিলে বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা, জাতিত্ব বা নেশনত্ব ত দূরের কথা, তবে আবার বলিব যে আমরা যদি আমাদের ভারতীয় পলিটিক্সকে স্বগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, যদি আমাদের প্রাচীন প্রজাধর্ম্ম আবার ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া উঠে ও ইংরাজের ভারতীয় রাজনীতিকে আমাদের রাজধর্ম্মে পরিণত করে, তাহা হইলে আমরা বাঁচিব ত নিশ্চয়ই, উপরন্তু জগতের আধুনিক রাজনীতির নেপথ্যে যে ভারতীয় জাতিত্ব বা নেশনত্ব সমগ্র ভারতেতিহাসের একমাত্র তাৎপর্য্য ও লক্ষ্য, তাহার প্রতিষ্ঠা সম্ভাবিত হইবে। এই নেপথ্য আজ নেপথ্যরূপে প্রতিভাত বটে, কিন্তু রাজনীতির আসরে আজ যে আগুণ লাগিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে আজ যাহা নেপথ্য কাল তাহা আর নেপথ্য থাকিবে না। যে আসরে বিধাতা আজ স্বহস্তে অগ্নিসংযোগ করিয়াছেন, যে আসরের অন্তরালে আমাদের সনাতন জাতিধর্ম্মকে নূতন মহিমায় সঞ্জীবিত করিবার জন্য বিধাতা ইংরাজ রাজনীতিকে প্রাচীররূপে ব্যবহার করিতেছেন, সে আসরের প্রধান্য জগতের জীবনরঙ্গমঞ্চে আর বেশী দিন টিকিবে না, একথা চক্ষুষ্মানের আর বুঝিতে বাকি নাই। অতএব আজ পাশ্চাত্য পলিটিক্সের

আদর্শে মুগ্ধ না হইয়া ভারতীয় পলিটিক্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য আমাদের শিক্ষিত সমাজের নিকট বিধাতার আহ্বান ঘোষিত হইতেছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

রাকা—শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী প্রণীত গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বসিরহাট হইতে প্রকাশিত। গ্রন্থকার বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে একজন প্রথিতনামা কবি। ঘনায়মানা সন্ধ্যার নীলকৃষ্ণাম্বরে ক্রমপরিস্ফুট তারকা খচিত দৈবতকুলের লীলাপ্রাঙ্গণ 'ছায়াপথের' সন্ধান ইনিই একদিন আমাদিগকে দিয়াছিলেন, আবার আজ সিতোজ্জ্বল গগনপটে অবিরাম মধু-নিস্যন্দী, অনন্ত শোভার আধার, পৌর্ণমাসীর পূর্ণচন্দ্রের মনোহারিত্ব আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইতে উপস্থিত হইয়াছেন। কাব্যামোদী পাঠক কি এ সুযোগ অবহেলা করিবেন? ত্রিযামার প্রথম যাম অতীত হইতেই ইনি যে 'লোকাতীত ভূমির" দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "মলিনার আত্মাবকাশ" ও "রসবিলাস" ভাগে বৈষ্ণব মহাজন ও কবিকুলের পন্থানুবর্ত্তনে মধুর রসের সাধনায় কবি সেই লোকাতীতের দিকেই মুহুর্মুহু অগ্রসর হইয়াছেন। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের কবিতা বাঙ্গালীর সাধারণ ধন। চণ্ডী, দুর্গা, কালী, মনসা সাধককুলের জীবন গড়িয়া তুলিয়াই নিরস্ত হয় নাই অপিচ বাঙ্গালীর সাহিত্যে, বাঙ্গালীর সংসারে নিত্য আনন্দের রজতপ্রবাহ ছুটাইয়া দিয়া চলিয়াছে। চৈতন্যদেবের আলোকসামান্য প্রেম ও ভক্তিও তদ্রূপ যুগপৎ সাধক ও সাহিত্য দুয়েরই সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে সাহিত্য মানব জীবনের সমগ্রতা ও অখণ্ডতার উপরই স্থাপিত হওয়া উচিত; সাহিত্যে শুধু ধর্ম্মোপদেশ করা চলে না। সাহিত্যে কল্পনার কল্পলোক বিস্তারেরও স্থান আছে;

আধুনিক ইউরোপীয় ও তদনুযায়ী বাঙ্গালা সাহিত্য শুধু কলা-কৌশলের দোহাই দিয়া অনেক আবর্জ্জনার সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে প্রত্যক্ষদর্শিত্বের উপর ধর্ম্ম ও সাহিত্য উভয়েরই প্রতিষ্ঠান তাহা কিন্তু চিরকালই নানা ভাবে নানারূপে এমন কি কল্পনার আলোকেও মানবের হৃদ্গত উপাস্য সেই পরম সত্যেরই নীরাজন করিয়া আসিবে, কৌশলের তন্দ্রাবেশ অথবা কষ্টকল্পনা'র সম্মোহনবিদ্যার সকল প্রভাবই তাহার নিকট ব্যর্থ। কবিতা ও কাব্যের সৃষ্টি লেখক এবং চিন্তাশীল পাঠককে কল্পনার মানসলোক হইতে ধ্যানলোকের পথে অগ্রসর করাইয়া দেয় মাত্র তখনই. যখন কল্পনা ধীরা ও সংযতা প্রবৃত্তি—স্থিরতটা নিবৃত্তিলগ্না। সংস্কৃত আলঙ্কারিক এই জন্যই কাব্যের 'সদ্যঃপর নির্বৃতায়' লক্ষণ সিদ্ধ করিয়াছেন। 'বাকা'র কবিতাগুলি এইরূপ প্রসাদ-গুণ সমন্বিত। গীতগোবিন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত পদাবলীর ছন্দে বিরচিত 'রসবিলাস' অংশ কবির অনুকরণ ক্ষমতার বিশেষ পরিচায়ক অন্যত্র কবির চিত্রাঙ্কণ ক্ষমতা ও ভাবের প্রগাঢ়তাও বিশেষ পরিস্ফুট।

প্রতিধ্বনি।

(শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ)

[গ্রীকপুরাণে বলে প্রতিধ্বনি (Echo) একসময় পরমাসুন্দরী দেবী ছিল। তাহার বাক্যের মধুরতায় আকৃষ্ট হইয়া দেবেশ্বরী জুনো অবকাশে তাহার সহিত আলাপ করিতে আসিতেন। কিছুদিন আসিয়া তিনি বুঝিতে পারেন, প্রতিধ্বনির বাগবিন্যাস তাঁহার স্বামী জুপিটরকে আকর্ষণ করিবার দুরভিসন্ধি মাত্র। জুনো কৌশলে তাহার বাক্‌শক্তি অপহরণ করিলেন। কেবল কাহারও কথার শেষাংশটীর পুনরুচ্চারণে তাহার ক্ষমতা রহিল। মনোদুঃখে Echo গিরিরন্ধ্রে আত্মগোপন করিল। এই সময় যুবক নারসিসুসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে Echo যুবকের রূপে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না! প্রতিপ্রশ্নের উত্তরে তাহারই বাক্যশেষের পুনরুচ্চারণে বিরক্ত হইয়া যুবক Echoর সঙ্গ পরিত্যাগ করে। মনোভঙ্গে Echo গলিয়া গলিয়া [illegible]থামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া আজিও পর্য্যন্ত রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিচরণ [illegible]ছে।]

নিদাঘের সারাদিন ধ'রে
বন হ'তে বনান্তরে ঘুরে—
সঙ্গী সঙ্গে ছিল যারা
কোথায় গিয়াছে তারা—
বনপ্রান্তে পরিশ্রান্ত যুবা,